রাজস্থান-কাহিনী

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

দাদা ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

'পা বহির উপর যাঁহারা ভাল-মন্দ কিছু বলিতে পারেন তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার ভরসায় নূতন গ্রন্থকার ''ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রথী মহারথীর অমোঘ আশীর্বচন বা মুখ-বন্ধ গ্রন্থারম্ভে যোগ করিয়া স্বস্তি অনুভব ,রয়া থাকেন। মাদৃশ নীরস ঐতিহাসিক সাহিত্যে অনধিকারচর্চা করিয়া এতদিন সমালোচনা হইতে ·াই পাইয়াছে। বাংলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চা করিবার ব্যাপারে যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা স্বর্গবাসী। সুতরাং মুখ-বন্ধ তথা ভূমিকার একটা খিচুড়ি অগত্যা লেখক স্বয়ং বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করিয়া দায়মুক্ত হইল।

ইতিহাস ব্যতীত অন্য কিছু আমি লিখিতে পারি না; তবে সেকালের "অগত্যা-ব্রাহ্ম"-র মত "অগত্যা-সাহিত্যিক" হইয়া পড়িয়াছি। ১৯২৭ ইংরেজীতে ঢাকায় প্রতিমাসে নগদ আট আনা খরচ রিয়া গৃহিণীর জন্য প্রবাসী পত্রিকা কিনিতাম। তিনি রমনার বান্ধবীগণের কাছে সুখবর পাইলেন হারা ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন তাঁহারা প্রতি মাসে বিনা পয়সায় প্রবাসী পাইয়া থাকেন। ইহাতে ামার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আমি ঢাকায় সুসাহিত্যিক কাজী মুহতার হোসেন, শহীদউল্লাহ্, কাজী আবদুল ওদুদ এবং ঐতিহাসিক ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালীর দলে ভিড়িয়া অধুনালুপ্ত ঢাকার প্রগতিশীল "শিখা" পত্রিকায় "দারার ধর্মমত" নামক প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া অগ্রজপ্রতিম ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখিলেন প্রবাসী পত্রিকায় আমাকে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে; কলমে যাহা আসে নির্ভয়ে লিখিয়া পাঠাইলেই চলিবে, "গত্ব-ষত্ব" ও কাট-ছাঁট তিনিই করিবেন। ঘরে বাহিরে এইভাবে কোণ-ঠাসা হইয়া তদবধি আমি আটআনী সাহিত্যিক হইয়া দিন গণিতেছি।

দুঃখের বিষয়, আমি "প্রবাসী"-র লেখক হওয়ার পর হইতে গৃহিণী পত্রিকার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছেন। তাঁহার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন" আসল ইতিহাস। আমি যাহা লিখি উহা নাকি সবটাই মিথ্যা মন গড়া কথা। মন মরা হইয়া আত্মপ্রবোধের জন্য কবি ভবভূতিকে স্মরণ করিলাম :

উৎপস্যতে অস্তি বা কোঽপি মে সমানধর্মা। কালোহ্যয়ম্ নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥

আশা করি সহৃদয় পাঠক ঘরের ভাঙচি শুনিয়া ঘাবড়াইবেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের "জমিদার নগেন্দ্রনাথ" যদি আসন্ন দুর্যোগে মাঝি রহমতের ভরসায়—যেহেতু তাহার নানা (মাতামহ) নামজাদা মাঝি ছিল—বজরায় চড়িয়া রক্ষা পাইয়া থাকেন, তবে চাটগেঁয়ে বাহাদুরে মাঝির (এখন তিয়াত্তর চলিতেছে) এই ।ভনব "সাম্পানে" চড়িয়া ভদ্রলোক নির্ভয়ে বর্মা পাড়ি জমাইতে পারিবেন—যদিও নোনা জল যে দুই এক ঢোক পেটে যাইতেও পারে। লেখকের নানা (দাদামহাশয়) ছিলেন খানদানী মুন্শী। তাঁহার "মুন্শীয়ানা"র পাল খাটাইলে শঙ্খনদীর মুখে বাঙ্গাল দরিয়ার ডুব-চরের আশমান-ছোঁয়া ঢেউয়েও ইতিহাস-সাম্পান ডুবিবে না। আরও ভরসা দিতে পারি যে জগন্নাথ-হলে (ঢাকা) আমার tutorial class-এর ভূতপূর্ব সুবোধ ছাত্র শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু বাঙ্গালা সাহিত্য তরণীর অন্যতম দুর্ধর্ষ কর্ণধার। আমি হালে পানি না পাইলে তিনি মুশকিল আশান করিবেন।

॥ ২ ॥

পুস্তকের কথা-বস্তু নির্দেশ প্রসঙ্গে পাঠকের কাছে সবিনয় নিবেদন :

লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও বিদেশে মুসলমান-যুগের ইতিহাসে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণায় যাহা গ্রহণীয় বিবেচিত হইয়াছে মাতৃভাষার মাধ্যমে উহার

আলোচনা। সুদীর্ঘ গত চল্লিশ বৎসরে হিন্দী সাহিত্যে ও ঐতিহাসিক গবেষণা মন্থন করিয়া রাজপুতানার মধ্যযুগীয় সামাজিক ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ যাহা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি উহাও এই সুযোগে পাঠকের সুবিচারের আশায় নিবেদিত হইল। প্রবন্ধগুলির সময়ানুক্রম আমার মনে নাই। প্রবাসী পত্রিকায় আমার প্রথম লেখা "পদ্মাবত কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা" প্রকাশিত হওয়ার পর নমস্ত ঐতিহাসিক ৺নিখিলনাথ রায় মহাশয় উহার এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিবাদ লিখিয়াছিলেন। আমার পাল্টা জবাব আরও তথ্যপূর্ণ এবং জোরালো হইয়াছিল। আমার বাংলা সাহিত্য-চর্চার প্রকৃত গুরু ছিলেন ঢাকা-প্রবাসী ৺কবি মোহিতলাল, ৺আচার্য যদুনাথ নহেন। প্রতিপক্ষকে শালীনতা বজায় রাখিয়া নাকাল করার বিদ্যাটা ৺মোহিতলাল আমাকে হাতে-কলমে সর্বপ্রথম শিখাইয়াছিলেন। পরে ৺সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের ইশারায় "শনিবারের চিঠি"-তে আড়ালে থাকিয়া আরও দু-এক জনকে ঘায়েল করিয়াছি। কিন্তু ব্যাধ-বৃত্তি আমার স্বভাব নহে, ঐতিহাসিকের স্বধর্মও নহে।

ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক গবেষণা দেশ ধর্ম ও জাতিনিরপেক্ষ। ৺নিখিলনাথ রায়ের "প্রতাপাদিত্য", পূজনীয় ৺অক্ষয় মৈত্রের সিরাজউদ্দৌলা ও অন্ধকূপহত্যা স্বদেশপ্রেমের অমর অবদান হইতে পারে, বিশ্ব-আদালতে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস নহে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ এবং রাজা মানসিংহকে লইয়া ৺আচার্য যদুনাথ একবার মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। *History of Jaipur* (অপ্রকাশিত অবস্থায় Jaipur Darbar Archives-এ রক্ষিত) লিখিবার সময়ে এই উভয়ের মধ্যে কাহার উদ্যম অধিকতর প্রশংসনীয়—বিবদমান শিশোদিয়া তথা কচ্ছবাহ-কুলের কুলাভিমানে আঘাত না করিয়া এই প্রশ্নের কোন ঐতিহাসিক সমাধান সম্ভব কিনা তিনি আমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন। বলা বাহুল্য, এই ভাবে গুরুশিষ্যের বিতর্কচ্ছলে তিনি শিষ্যের স্বাধীন চিন্তা এবং বিচারশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। আমার "মহারাণা প্রতাপসিংহ" ও "রাজা মানসিংহ" এই বিতর্কের পরোক্ষ সমাধান। "হলদীঘাটির যুদ্ধ" প্রবাসীতে প্রকাশিত হওয়ার বহু বৎসর পরে উক্ত ঘটনার সর্বাপেক্ষা বিশদ এবং প্রামাণ্য বিবরণ ৺আচার্য যদুনাথের *Military History of India* পুস্তকে পাওয়া যাইবে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কৃতী ছাত্র বুন্দেলখণ্ড নিবাসী ডঃ ভগবানদাস গুপ্ত মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আমার পূর্বপ্রকাশিত "ছত্রসাল বুন্দেলা" নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক হয় নাই। "মহারাণা রাজসিংহ" প্রবন্ধে ঐতিহাসিক টড্ সাহেব এবং ৺আচার্য যদুনাথের History of Aurangzib গ্রন্থে সংগৃহীত উপাদান ছাড়াও রাজসিংহের সমসাময়িক কবি "মান"-রচিত রাজসিংহের ছন্দোবদ্ধ জীবনী (অসম্পূর্ণ) এবং Jaipur Darbar Archives হইতে প্রাপ্ত শাহাজাদা দারার পত্রাবলী "মহারাণা রাজসিংহ" প্রবন্ধে যোগ করা হইয়াছে। "মরুবধূ" প্রসিদ্ধ ডিঙ্গল হিন্দী-গ্রন্থ "ঢোলা-মারু"-র কাব্য-সমীক্ষা। মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা-র গবেষণা এই কাব্য-সমীক্ষায় উল্লেখ করা হইয়াছে। "চিত্রাবলী" প্রবন্ধ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালীন গাজীপুর নিবাসী কবি ওসমান রচিত "চিত্রাবলী" নামক প্রেম-গাথার ছায়া অবলম্বনে লেখা হইয়াছে। কবি বাঙ্গালা, আসাম, মগ-রোহাঙ্গ (আকিয়াব সীমান্ত) প্রভৃতি স্থানের সরস বর্ণনা দিয়াছেন এবং বাঙ্গালীকে খুব ঠুকিয়াছেন। টডের পরবর্তীকালে লিখিত বুন্দী-দরবারের চারণ-কবি সূরজমলের মহা-মহাকাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত "বংশভাস্কর" গ্রন্থ (ছাপার প্রায় চারি হাজার পৃষ্ঠা), টডের সময়ে অজ্ঞাত রাজপুতানার আবুলফজল মুন্‌হোত্ নৈনসী-রচিত (মহারাজা যশোবন্ত সিংহ রাঠোরের দেওয়ান) খ্যাত এবং অতি আধুনিক চারণ-সাহিত্য—যাহা Rajasthan Oriental Research

Institute এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইতেছে—আমি বহু বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন করিতেছি। "চারণ ও ক্ষত্রিয়", "রাজপুতানার চারণ জাতি" এবং "রাজপুত-বৈর" উক্ত কাব্য, খ্যাত ও অন্যান্য চারণ-সাহিত্য অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

॥ ৩ ॥

আমি প্রায় ২১ বৎসর (১৯২৭—১৯৪৮ ইং) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রকে ইসলাম ধর্ম ও খেলাফতের ইতিহাস পড়াইয়াছি, মিলাদ-শরীফে হজরত রসুলল্লাহ-কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া "মার্‌হাবা" (সাধুবাদ) পাইয়াছি। মন-প্রাণ দিয়া ইস্‌লামের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করার ফলে আমার ধারণা হইয়াছে মুসলমানেরই সত্যিকার ও ঐতিহাসিক সাহিত্য আছে—যাহার তুলনায় হিন্দুর কিছুই নাই বলিলে হয়। এই ইসলামীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য কল্পনাতীত বিরাট এবং বৈচিত্র্যময়। আরবী না পড়িয়া কেবল ফার্সি, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে উহার আংশিক পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। নিতান্ত গুরুদ্রোহের ভয়ে আমি মোগল-পাঠানের ইতিহাসকে তৌবা দিয়া অচিন দরিয়ায় ঝাঁপ দিই নাই। এই সময়ে "মুসলমান সভ্যতার ধারা ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চা" এবং "খলিফা আবদুল্লা অল্‌ মামুন্" প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। মৌলানা শিবলী-র অতিপ্রামাণ্য উর্দু **অল্‌-মামুন** এবং *al-Suyuti* রচিত আরবী *"Tarikh-al-khulafa*-র উর্দু অনুবাদের সাহায্যে আমি খলিফা অল্‌-মামুনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখিয়াছি। ইতিহাসের মর্যাদা কোথায়ও লঙ্ঘিত হয় নাই।

॥ ৪ ॥

এই পুস্তকের ভাষায় পদ্মাপারের ডাক আছে, ভাটীর টান আছে, খোট্টাই ঝাল আছে; কিঞ্চিৎ কাবুলী জাফ্‌রানের রং আছে, মোগলাই পিঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বিলক্ষণ আছে। মধ্যযুগীয় সামন্ত সভ্যতার পরিবেশ আমার মানস-সত্তাকে ওতপ্রোতভাবে বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেও ঘিরিয়া রহিয়াছে। হিসাবে নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত অনেক কসরত করিয়া দেশ ধর্ম ও জাতির সংকীর্ণতার উপরে উঠিয়া নির্বাত নিষ্কম্প মহাকাল-নির্দিষ্ট বিচারকের আসনে বসিয়া অতীত এবং মৃতের প্রতি ন্যায়বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমার ঐতিহাসিক-আসন সিদ্ধি হইয়াছে কিনা উহার বিচারকর্তা বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যৎ তথা সুধী বাঙ্গালী পাঠকসমাজ।

অতঃপর আমার সাহিত্যিক সত্তার গুরুপংক্তি প্রণাম না করিয়া ভূমিকা শেষ করিলে প্রত্যবায় ঘটিবে। ইতিহাস ও সাহিত্য আমার রক্তে পিতা-মাতাই রাখিয়া গিয়াছেন, যদিও পাঁচ বৎসর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমার মার অক্ষরপরিচয় হইয়াছিল তাহার প্রথম পৌত্রের বিদ্যারম্ভের সময় ৫৫ বৎসর বয়সে; অথচ উহার বিশ বৎসর পূর্বে বাংলা রামায়ণ মহাভারত আমাকে মুখে মুখে শুনাইতেন। সুতরাং প্রথমেই পিতা-মাতাকে বন্দনা করিতেছি। আমাদের উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পাস হেডপণ্ডিত ৺রসিকচন্দ্র দে মহাশয় নিঃসন্দেহে আমার আদি শিক্ষা ও সাহিত্যগুরু। তিনি অঙ্কের জন্য আমাকে বেদম প্রহার করিতেন, মুখস্থবিদ্যায় অবাক হইয়া পিঠ চাপড়াইতেন, নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" ও "রঙ্গমতী" (যাহা কবি আমার বাবাজীকে স্নেহ-উপহার দিয়াছিলেন এবং বর্তমানে আমার কাছেই আছে) না বুঝিয়াই কণ্ঠস্থ এবং আবৃত্তি করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছি, পাকের জল কলসী ভরিয়া দূর হইতে কাঁধে করিয়া আনিয়াছি; বর্ষারাত্রির দুর্যোগে মুষলধার ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আঁধারে হাতড়াইয়া এক চিলিমমাত্র তামাক স্কুল-সংলগ্ন পাক-ঘর হইতে বগলদাবা করিয়া

উদ্ধার করিয়াছি ; বর্ষায় স্কুলের রাস্তায় কোমর-জল হইলে ছুটির আশায় ডুব-জল গর্ত করিয়া রাখিয়াছি, মাষ্টারমহাশয় ঐ গর্তে ডুবিয়া গেলে দলবলসহ ত্রস্ত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছি। তখনকার পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ রাত্রেও স্কুলে ঘুমাইত। বঙ্কিমীভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির গল্প তিনি আমাদিগকে শুনাইতেন। একদিন বাড়ীতে ছোটদাদার প্রহারের ভয়ে তাঁহার অজ্ঞাতসারে রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টার মধ্যে কেরোসিন ল্যাম্পের সলিতাসুদ্ধ পোড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণী শেষ করিয়াছিলাম। মাষ্টারমহাশয় কবি নবীনচন্দ্রের ভক্ত এবং কঠোর সমালোচক ছিলেন। যথা—"**তপ্ত লোষ্ট্রসম** ধমনীতে উষ্ণরক্ত হয় প্রবাহিত" [পলাশীর যুদ্ধ]।

শুনিয়াছি তিনি দুর্দান্ত খেয়ালী মানুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনধারা ছিল গতানুগতিকের বাহিরে। পাঠ্যাবস্থায় তিনি এক গায়েন্ দলের সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ দিন ঘুরিয়া দিনে মুসলমান বাড়ীতে চিড়াগুড় খাইয়াছেন, রাত্রে গাজীর পালা শুনিয়াছেন। শিষ্য একবার মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাশের গ্রামে পিসীর বিবাহ উপলক্ষে এক আসরে খালি পেটে একটা থিয়েটার (কৃষ্ণকান্তের উইল) এবং উহার পরে দুইপালা যাত্রাগান শুনিয়া পরের দিন হামাগুড়ি দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র দে আমার জীবনের উপর একটা রঙীন স্বপ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও ভাঙে নাই ; তাঁহার স্নেহস্মৃতির উদ্দেশে সহস্র প্রণাম।

সাহিত্য-চর্চায় প্রবাসী পত্রিকা আমার মায়ের দুধ। ৺আচার্য যদুনাথের কৃপায় আমি ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পায়ের ধূলি পাইয়াছি। বর্তমান সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে এই প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমানের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। দাদা ব্রজেনবাবুর পরে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রবাসীর সহ-সম্পাদক আমার লেখার অভিভাবকত্ব করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। এই মুদ্রণকার্যে "কথাসাহিত্য" পত্রিকার প্রথিতযশা সাহিত্যিক শ্রীযুত গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে আমার লেখার উপর অবধি কলম চালাইবার অধিকার দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তাঁহাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

এই ভূমিকায় যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদাব্-তসলীম, নমস্কার-প্রণাম জানাইতেছি। সৌভাগ্যক্রমে জীবনসায়াহ্নে আমি এক বয়ঃকনিষ্ঠ "অকারণ-বন্ধু" তথা সাহিত্যসাধনায় উপগুরু লাভ করিয়াছি। তিনিই সিলেটী ময়না, রসরাজ সৈয়দ মজুতবা আলী। নার্সিং হোম-এ সম্প্রতি আশ্রয় লইবার পূর্বে সৈয়দ সাহেব নমাজের "মুসাল্লা" (carpet) বন্ধক রাখিয়া এই পুস্তক ছাপাইবার কাযে মুশকিল আসান করিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই ; তাঁহার "মৌলা আলী"-র [সুফীগুরু চতুর্থ খলিফা] কাছে দোয়ার আর্জি করিতেছি। আমার মধ্যম পুত্র নরেন্দ্রনাথ এবং আলী সাহেবের যোগসাজসে আমাকে সাহিত্য-সংসারে এই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। নরেন্দ্রনাথ আমার লেখাগুলি বহু বৎসর যাবৎ সযত্নে সংগ্রহ না করিলে হয়ত এই পুস্তক যন্ত্রস্থই হইত না।। কর্মজীবন ও ঐতিহাসিক গবেষণায় পুত্র অখণ্ড-সাফল্য লাভ করুক।

দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, সুযোগ আবার নাও আসিতে পারে। এইজন্য অতীত ও বর্তমান এই ভূমিকাকে দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করিয়াছে। আশা করি পাঠক ধৈর্যচ্যুত হইবেন না। ওঁ শান্তি

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

সূচীপত্র

মহারাণা প্রতাপসিংহ

পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে আবহমানকাল হইতে বীরপূজা চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা অতিমানব, শৌর্য ত্যাগ ভক্তি প্রেম কিংবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রাকৃত মানবের বহু উর্ধ্বে যাঁহাদের স্থান, মানস-মন্দিরে স্মৃতির অর্ঘ্যে মানুষ চিরকাল তাঁহাদের পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং করিবেও; কেননা ইহাতে মানুষের আত্মতৃপ্তি হয়, কর্মে প্রেরণা আসে, ভাবোন্মাদনা দ্বারা ইহা তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির উৎস খুলিয়া দেয়। যতদিন ভারতবর্ষে বীরপূজা শাস্ত্রের বিধানে ধর্মের অঙ্গীভূত ছিল, ততদিন ভারতমাতা সত্যই বীরপ্রসবিনী ছিলেন। পৌত্তলিক হিন্দু শুধু ইট-পাথরের পূজা করিয়া প্রাচীনকালে অর্থ ও পরমার্থ লাভ করে নাই, সেকালে বীরপূজাই ছিল হিন্দুধর্মের প্রাণ। অন্য কোন জাতির তুলনায় বীরের মাহাত্ম্য হিন্দু কম বুঝে নাই। যিনি বীর তিনি নিত্যমুক্ত, দেশ, ধর্ম ও জাতির কল্যাণের জন্য শস্ত্রপূত হইয়া যিনি দেহত্যাগ করেন তাঁহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি নিষ্প্রয়োজন; তিনি অপুত্রক হইলেও তাঁহার পুন্নাম নরকের ভয় নাই, তর্পণাদি লোপের আশঙ্কা নাই। তবে শাণিত তরবারিতে যাহারা পৃথিবীর বক্ষে রক্ত-গঙ্গা বহাইয়া শুধু নিজেদের বিজিগীষা ও সাম্রাজ্যতৃষ্ণা মিটাইয়াছে, হিন্দুর চক্ষে তাহারা বীর নহে,—দানব কিংবা রাক্ষস, হিন্দুধর্মে তাহাদের পূজার বিধান নাই; থাকিলে আমরা রাবণ কিংবা জরাসন্ধের পূজা করিতাম। শান্তনু পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যোদ্ধৃগণের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহার পূজা করি না, অঙ্কগত রাজলক্ষ্মীকে প্রত্যাখান ও আজন্ম ব্রহ্মচর্য ধারণ করিয়া ত্যাগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আদর্শ রাজভক্তির দ্বারা তিনি সমগ্র জাতির হৃদয় জয় করিয়াছিলেন; এজন্যই হিন্দুর তর্পণ-বারিতে তাঁহার প্রথম অধিকার। কার্লাইলের সংজ্ঞানুসারে বীর-রাজ হিসাবে (hero as king) হিন্দুরা দশরথ-নন্দন রামের পূজা করে। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য ইত্যাদি ত্রিকালদর্শী, মন্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ আমাদের 'প্রফেট' বা পয়গম্বর-স্থানীয় বীর —এজন্য শাস্ত্রানুসারে তাঁহারাও পূজ্য। নরমুণ্ডস্তূপ, অখণ্ড দিগ্বিজয় কিংবা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার ভারতবর্ষে বীরত্বের পরিমাপক নহে—মহান্ ত্যাগই বীরত্বের মাপকাঠি। যোদ্ধা, রাজা, ঋষি, কিংবা নীতিবিৎ—যিনিই হউন না কেন, যাঁহার ত্যাগ যত বড়, বীর-পর্যায়ে তাঁহার স্থান তত উচ্চে।

নব্য ভারত বীরপূজায় ব্রতী ; সেকাল ও একালের পূজার বিধান এক নহে। এজন্য বীরগণের সাংবাৎসরিক জয়ন্তী ভারতবর্ষের নানাস্থানে কয়েক বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে ; প্রতাপ-জয়ন্তী ইহারই অন্যতম। কিন্তু যাঁহারা ভাবের প্রেরণায় প্রতাপ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাটক, উপন্যাস অথবা উপন্যাসমূলক ইতিহাসের ভিতর দিয়া মহারাণা প্রতাপকে দেখিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় মহামতি টডের 'রাজস্থান'—যাহা এতদিন আমরা প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া মনে করিয়াছি–উহার অধিকাংশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে যে-সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি—যথা, প্রতাপ ও শক্তসিংহের বিরোধ, শক্তসিংহের নির্বাসন, কুমার মানসিংহের অপমান, 'খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল', বীর শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, ভীলদের আশ্রয়ে সপরিবারে প্রতাপের গিরি-গুহায় বাস, দারিদ্র্য-পীড়িত ভগ্নহৃদয় প্রতাপের মেবার ত্যাগের সঙ্কল্প, চিতোর-উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসব্রত ও শপথ ইত্যাদি—সেকালের ভাট চারণের কল্পনামূলক কাব্য-নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ অশুদ্ধ হইলেও রাম মিথ্যা হইতে পারেন না, মহাভারত কাব্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হয়ত কাল্পনিক নহেন। মহামতি টডের 'রাজস্থান' ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, স্বদেশাভিমান ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীন কল্পনাপ্রান্তরের সুদূর আলেয়া-ভ্রান্তি নহে। সমস্ত ভারতবর্ষ এতদিন মিথ্যার উপাসনা করে নাই ; স্তাবকের ছন্দে কালের বাতাসে মহারাণা প্রতাপের মিথ্যা খ্যাতি কথায় কথায় পল্লবিত হইয়া উঠে নাই—ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই প্রবন্ধের অনেক স্থলে মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; কারণ এ-যুগে রাজপুত-ইতিহাসে তিনিই গুরুস্থানীয়। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ 'রাজপুতানেকা ইতিহাস' বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ। তবে কোন কোন স্থলে গৌরীশঙ্করজীর সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। মুসলমান-পক্ষের যে-সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ মহারাণা প্রতাপের অকীর্তিজনক বলিয়া পণ্ডিতজীর ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি সেগুলি সঙ্গত কারণ ছাড়া অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্রাট্ আকবর ও তাঁহার সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাস হিসাবে ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত 'আকবরনামা' অমূল্য গ্রন্থ। মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে ইহাতে যেটুকু লিখিত আছে তাহাই ইতিহাস। একমাত্র রাজপুত-কাহিনীর

উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া টড সাহেব পদে পদে ভুল করিয়াছেন। আবুল ফজলের 'আকবরনামা'য় সকল ঘটনার সঠিক বর্ণনা নাই বলিয়া আমরা আবুল ফজলকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে দোষ আবুল ফজলের নহে; তিনি মিথ্যা কথা গড়িয়া তুলেন নাই। 'আইন-ই-আকবরী' পাঠে জানা যায়, মোগল-দরবারের ঘটনা, বিভিন্ন কর্মচারী ও মন্‌সবদারগণের মৌখিক বিবৃতি ইত্যাদি কেরানীরা যাহা দেখিত কিংবা শুনিত তাহার একবর্ণ ব্যতিক্রম না করিয়া লিখিয়া রাখিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অন্য কর্মচারীরা এই লেখাগুলির সারাংশের কয়েকটি প্রতিলিপি তৈয়ার করিয়া উজীরের দপ্তরে দাখিল করিত। মোগলদরবারের ইতিহাস—'আকবরনামা', 'বাদশানামা' ইত্যাদি—এই সমস্ত সংবাদলিপি (news sheets) অবলম্বনে লিখিত। এখন যদি কুমার মানসিংহ প্রতাপসিংহের কাছে অপমানিত হইয়া সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে বলেন, 'জঁাহাপনা! প্রতাপসিংহ আমাকে খুব খাতির করিয়াছেন এবং হুজুরের খেলাৎ পরিধান করিয়া শাহান্‌শার তাজিম করিয়াছেন,' তাহা হইলে এই ঘটনার দশ-পনের বৎসর পরে ঐ তারিখের দরবারী সংবাদলিপি পড়িয়া ইহা অবিশ্বাস করা কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব কি?—বিশেষতঃ ইহার সত্যতা যাচাই করিবার যখন অন্য কোন উপায় থাকে না। কিন্তু পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া আবুল ফজলকে কিংবা দরবারী সংবাদলিপিগুলিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়।

দ্বিতীয় কথা, মহারাণা প্রতাপের সমসাময়িক মোগলদরবারের একাধিক ইতিহাস আছে; কিন্তু মেবারের কোন ইতিহাস নাই,—আছে শুধু ভাটের কাহিনী ও কবিতা। কাব্যকে যদি ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে মহারাণা প্রতাপের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ইতিহাস প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের সময়ে লিখিত 'অমর-কাব্য'। দুঃখের বিষয়, উহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এক্ষেত্রে মুসলমান লেখকেরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার মত উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলে উহাই গ্রহণ করা বিচারসম্মত; যেমন, আমরা বহুদিন হইতে টডের 'রাজস্থানে' পড়িয়া আসিতেছি যে, হলদীঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের ঘোড়া "চৈতক [চেটক] মানসিংহের হাতির মাথায় পা তুলিয়া দিয়াছিল"; অথচ ইহা টড সাহেব চাক্ষুষ দেখেন নাই, কিংবা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত কোন বিবরণও সম্ভবতঃ তিনি দেখেন নাই। আকবরের দরবারী ইমাম-মোল্লা আব্দুল কাদের বদায়ুনী হলদীঘাটে প্রতাপের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকপাঠে মনে হয়

হলদীঘাটে রাণা প্রতাপ এবং মানসিংহ—উভয়েরই মধ্যে আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; প্রতাপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন মানসিংহের বড ভাই মাধোসিংহের সঙ্গে। এস্থলে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

সম্রাট আকবর কর্তৃক চিতোর-দুর্গ অধিকারের পর মহারাণা উদয়সিংহ চার বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ ফেব্রুয়ারী গোগুন্দা গ্রামে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার বিশজন রাণী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত পঁচিশটি পুত্র ও বিশটি কন্যা ছিল; তাঁহার সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন কুমার প্রতাপসিংহ। পলাতক উদয়সিংহ কুম্ভলমীর বা কমলমীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে, মাডবার রাজ্যের অন্তর্গত পালির সামন্ত চৌহান্ অখৈরাজ সোন্‌গরার কন্যার সহিত তাহার প্রথম বিবাহ হয়। বিবাহের তিন বৎসর পরে চৌহান কুমারীর গর্ভে—সম্ভবতঃ কুম্ভলমীর দুর্গে প্রতাপসিংহের জন্ম হয়। প্রতাপের জন্মতারিখ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। মেবারের অপ্রকাশিত ইতিহাস 'বীর-বিনোদ' প্রণেতা শ্যামলদাসজী প্রতাপের জন্ম ১৫৯৬ বিক্রম সম্বৎ, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-ত্রয়োদশী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল অক্লান্তকর্মা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা আজমেরের চণ্ডু নামক এক জ্যোতিষীর কাছে রাণা প্রতাপের জন্ম-কোষ্ঠী আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌরীশঙ্করজী ছাড়া অন্য কেহ একথা বলিলে আমরা ইহাকে 'ভৃগু-সংহিতা'র গণনার মত সন্দেহ করিতাম। ঐই কোষ্ঠী অনুসারে ১৫৯৭ বিঃ সঃ জ্যৈষ্ঠ শুক্লা-তৃতীয়া রবিবার (৯ই মে, ১৫৪০ খৃঃ) সূর্যোদয়ের ৪৭ দণ্ড ১৩ পল গতে কুমার প্রতাপসিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, মহারাণা উদয়সিংহের রাজত্বকাল ঘটনাবহুল হইলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে কুমার প্রতাপসিংহ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ার কোন সুযোগ লাভ করেন নাই। বস্তুত প্রতাপের পূর্বজীবনে এই বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইডরের রাও নারায়ণদাস রাঠোরের কন্যার সহিত বিবাহ এবং এই স্ত্রীর গর্ভে প্রথম পুত্র অমরসিংহের জন্ম (১৬ই মার্চ, ১৫৫৯ খৃঃ) ব্যতীত যেন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। মহারাণা উদয়সিংহ কনিষ্ঠা ভট্টিরাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এই জন্য তিনি এই রাণীর গর্ভজাত জগমালকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়াছিলেন। শিবাজী ও শের শার মত রাণা প্রতাপও বোধ হয় পূর্বজীবনে পিতার অবিচার ও তাচ্ছিল্য এবং বিমাতার ঈর্ষার অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাণা উদয়সিংহের প্রতি অন্যান্য পুত্রগণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। পিতার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া অমর্ষপরায়ণ শক্তসিংহ মেবার ত্যাগ করিয়া সম্রাট

আকবরের নিকট চলিয়া গেলেন (১৫৬০ খৃঃ), ইহাই আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রমণের অন্যতম কারণ।

মহারাণা উদয়সিংহের চিতাগ্নি নির্বাপিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী জগমাল কয়েক ঘণ্টা গদীতে বসিয়াছিলেন। মহারাণার অন্তোষ্টি-ক্রিয়ায় জগমালকে অনুপস্থিত দেখিয়া গোয়ালিয়র-রাজ রাম শাহ তঁবর কুমার সগরজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগমাল কোথায়?"

সগরজী বলিলেন, "কেন? আপনি কি জানেন না স্বর্গীয় মহারাণা তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত * করিয়া গিয়াছেন।"

ইহাতে প্রতাপের মাতামহ অখৈরাজ সোনগরা সলুঁবর (সালুম্ব্রা) পতি রাবত কিষণদাস ও রাবত সাঁগাকে বলিলেন, "আপনারা চুণ্ডার বংশধর, অতএব এ কাজ আপনাদের সম্মতিক্রমে হওয়া উচিত ছিল। শিয়রে আকবরের মত প্রবল শত্রু, চিতোর হস্তচ্যুত, মেবার রাজ্য ছারখার, এ অবস্থায় যদি ঘরোয়া বিবাদ বাড়িয়া যায় তবে রাজ্য নাশ সুনিশ্চিত।"

রাবত কিষণদাস এবং সাঁগা বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রতাপসিংহ,—যিনি সর্বপ্রকারে যোগ্য, তিনিই মহারাণা হইবেন।" উদয়সিংহের দাহক্রিয়া হইতে ফিরিয়া গিয়া জগমালকে বলিলেন, "কুমার! আপনার আসন গদীর সম্মুখে, ঐখানেই বসা আপনার উচিত।" একথা শুনিয়া জগমাল সপরিবারে মেবার ত্যাগ করিলেন। সর্দারেরা ঐদিনই প্রতাপকে গদীতে বসাইয়া নজরানা দিলেন। (২৮-এ ফেব্রুয়ারী, ১৫৭২ খৃঃ)।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যারোহণের এই বর্ণনা অনেকটা নাটকীয় ব্যাপারের মত মনে হয়। শুধু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এভাবে এতটা ওলট-পালট হওয়া সম্ভব নয়, যদি ইহার পশ্চাতে কোন পূর্ব ষড়যন্ত্র না থাকে। প্রথম হইতেই বোধ হয়, প্রতাপের মাতামহ মেবারের গদীতে নিজের দৌহিত্রের জন্মগত অধিকার রক্ষা করিবার জন্য মেবার-সামন্তগণের মধ্যে একটা দলসৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ইহারা যে বেশ প্রস্তুত হইয়া মহারাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক প্রতাপ স্বয়ং কখনও তাঁহার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। জগমালের স্বপক্ষে বোধ হয় বিশেষ কেহ ছিল না। তিনি স্বেচ্ছায় মেবার ত্যাগ করিয়া আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট

* রাজার উত্তরাধিকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না যাওয়া মেবারের চির-প্রচলিত প্রথা (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ, ৭৩৫, পাদটীকা ৩)

দেশদ্রোহী জগমালকে মোগলবিজিত মেবারের জাহাজপুর পরগণা জায়গীর প্রদান করিয়া কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। গোগুন্দায় গদীতে বসিবার কয়েক মাস পরে কুম্ভলমীর-দুর্গে প্রতাপের অভিষেকোৎসব যথাবিধি সম্পন্ন হইল। প্রবল মোগলশক্তির সহিত যুদ্ধ অনিবার্য, কিন্তু বলসঞ্চয় করিবার জন্য মেবারের পক্ষে কিঞ্চিৎ অবসর নিতান্ত প্রয়োজন। আকবর যাহাতে সহসা মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান না করেন, সেজন্য প্রতাপ তাঁহার সমস্ত শক্তি ও নীতি প্রয়োগ করিলেন।

মহারাণা প্রতাপের রাজ্যাভিষেকের পর এক বৎসর পর্যন্ত সম্রাট আকবর গুজরাট ও সুরাট বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট রাজধানী ফতেপুর সিক্রী প্রত্যাবর্তন করিবার সময় সিদ্ধপুর হইতে (আমেদাবাদের চৌষট্টি মাইল উত্তরে অবস্থিত) কুমার মানসিংহকে * কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান মনসব্‌দারের সহিত ইডরের পথে ডুঙ্গরপুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষগণের প্রতি আদেশ ছিল যেন রাণা (প্রতাপসিংহ) এবং নিকটস্থ ভূস্বামীগণকে রাজোচিত ব্যবহার ও অনুগ্রহে বশীভূত করিয়া বাদশাহী দরবারে কুর্নিশ করিবার জন্য সঙ্গে আনেন এবং যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে না তাহাদিগকে যেন দণ্ড দেওয়া হয়। (*Akbarnama*, Eng. trans. Beveridge, iii. 48)

ইডরের রাও নারায়ণ রাঠোর মহারাণা প্রতাপের শ্বশুর; পরমবৈষ্ণব এবং তেজস্বী বীরপুরুষ। কথিত আছে, তিনি স্বহস্তে গো-সেবা করিয়া গোবরের সহিত যে ধান্যাদি বাহির হইত তাহার তণ্ডুল দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। তিনিও বহুদিন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ডুঙ্গরপুর-রাজ্যের (মেবারের দক্ষিণ-পূর্ব আরাবল্লীর উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত) গহলোৎ প্রধান শাখার বংশধর মহারাবল অস্‌করণও এযাবৎ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পূর্বে মালব ও হাড়াবতী, উত্তরে আজমের মেরওয়াড়া, দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র, পশ্চিমে মারবাড়

* রাজা মানসিংহ ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও 'আকবরনামা'র ইংরেজী অনুবাদক বেভারিজ সাহেবের অনবধানতায় তাহার বাপের নাম কোথাও ভগবান দাস, আবার কোথাও বা ভগবন্ত দাস লেখা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব দুজনকে একই ব্যক্তির নামের রূপান্তর মনে করিয়া বাপের পিণ্ড খুড়োকে দেওয়ার মত কাজ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান দাস ও ভগবন্ত দাস রাজা ভারমল বা বিহারীমলের দুই ছেলের নাম, রাজা ভারমলের উত্তরাধিকারী ভগবান দাস অপুত্রক হওয়ায় ভগবন্ত দাসের দ্বিতীয় পুত্র মানসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। ভগবন্ত দাসও মোগলদরবারে চাকরি করিতেন এবং লোকের কাছে 'বাঁকা রাজা' (obstinate prince) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (মুন্সী দেবীপ্রসাদ রচিত প্রাচীন চিত্রাবলী; রাজা ভারমল চরিত দ্রষ্টব্য)

ও গুজরাট প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আরাবল্লীর দুর্গম অরণ্য ও পর্বতশিখর হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ আশ্রয় হইয়া উঠিল।

আকবর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জানতেন হাড়া, কচ্ছবাহ, রাঠোর শুধু বেতন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোগলশক্তির কাছে অবনত হইয়া আছে, সুযোগ পাইলেই আবার মাথা তুলিবে, সুতরাং জাতির মানসপট হইতে স্বাধীনতার আদর্শ মুছিয়া না ফেলিলে, রাজপুত-গৌরব ও স্বাধীনতার শেষ অগ্নিকণা না নিবিলে তাঁহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য নিরাপদ নহে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যতদিন মেবারের মুকুটমণি মোগল সিংহাসনের পাদপীঠ স্পর্শ না করিবে ততদিন অন্যান্য রাজপুতের মস্তক নত হইলেও মন নুইয়া পড়িবে না, রাজপুত জাতির মেরুদণ্ড অনমনীয়ই থাকিবে। এজন্যই ক্ষুদ্র মেবার জয়ের জন্য মোগল সম্রাটের এত বলবতী ইচ্ছা—এত আয়োজনের ঘটা।

কুমার মানসিংহ সিদ্ধপুর হইতে ইডরে আসিয়া রাও নারায়ণ দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মোগল সম্রাটের সঙ্গে সহসা যুদ্ধ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া তিনি মানসিংহকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন এবং ভবিষ্যতে সুবিধামত বাদশার দরবারে হাজির হওয়ার মৌখিক ইচ্ছাও জানাইলেন। মোগল সৈন্য সেখান হইতে ডুঙ্গরপুর পৌছিল। ডুঙ্গরপুরের মহারাবল অস্‌করণ মানসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া আরাবল্লী পর্বতে পলাইয়া গেলেন। কুমার মানসিংহ ডুঙ্গরপুর (টড-কথিত দাক্ষিণাত্যের শোলাপুর নয়) বিজয় করিয়া ঐ বৎসর (১৫৭৩ খৃঃ) আষাঢ় মাসে উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলমীর হইতে উদয়পুর আসিয়া বিশিষ্ট অতিথিভাবে তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। ইহার পর কি ঘটিয়াছিল এই সম্বন্ধে রাজপুত ও মোগল পক্ষের বিবরণে ঘোরতর অসামঞ্জস্য দেখা যায়।

টড কথিত বর্ণনা অর্থাৎ উদয়-সাগর তীরে কুমারের সম্মানার্থ ভোজের আয়োজন, মানসিংহের সহিত পংক্তি-ভোজনে রাণার অস্বীকৃতি, বিনাভোজনে মানসিংহের প্রস্থান; গমনকালে কুমারকে গালাগালি, এবং আবার মেবারে আসিবার সময় তাঁহার পিসা আকবরকে সঙ্গে আনিবার বিদ্রূপ ইত্যাদি রাজপুতানার সর্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্যামলদাসজী এবং গৌরীশঙ্করজী মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে গৌরীশঙ্করজী বলেন, ভোজনের সময় রাণার অজুহাত ছিল মাথাধরা নয়—অগ্নিমান্দ্য, যেহেতু রামকবি প্রণীত জয়সিংহ-চরিত্রে আছে :—

কহী গবাণী কী কুঁবর ভই গবাণী জোহি।
অটক নহী কব দেউংগো তুরণ চূরণ তোহি॥

দিয়ো ঠেল কাংসো কুঁবর উঠে সহিত নিজ সাথ।
চুলু আঁন ভরি হৌ কহ্যৌ পোঁছ রুমালন হাথ॥

অর্থাৎ, কুমার বলিলেন 'গরাণ' যাহাই হউক না কেন আমি শীঘ্রই আপনাকে হজমী চূর্ণ দিতেছি। পশ্চৎ কুমার কাঁসার থাল ঠেলিয়া ফেলিয়া সহযাত্রীগণের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রুমালে হাত মুছিয়া বলিলেন—আচমনের গণ্ডূষ আর একবার আসিয়া করিব।

ইহা ছাড়া 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যেও এই আখ্যানের ইঙ্গিত আছে :—

প্রতাপ সিংহোঽথ নৃপ কচ্ছাবাহেন মানিনা।
মানসিংহেন তস্যাসীদ্বৈমনস্যং ভুজেবিধৌ॥
অকবরপ্রভোঃ পার্শ্বে মানসিংহস্ততো গতঃ

(রাজপ্রশস্তি কাব্য, সর্গ ৪)।

অর্থাৎ, মানী কচ্ছবাহ মানসিংহের সহিত ভোজনবিধি ব্যাপারে প্রতাপসিংহের সহিত বৈমনস্য ছিল। সে স্থান হইতে তিনি প্রভু আকবরের কাছে গমন করিলেন।

কিন্তু কুমার মানসিংহ উদয়পুর হইতে ফিরিয়া গিয়া সম্রাট আকবরের কাছে মহারাণা প্রতাপের আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যরূপই বলিয়াছিলেন ; যথা :—

"From there the army went·· to Udaipur which is the native country of the Rana. The Rana came to welcome them, and received him with respect and put on the royal khilat. He brought Man Singh to his house as guest, but owing to his evil nature he proceeded to make excuses * (about going to court), alleging that 'his well-wishers would not suffer him to go.' He made promises about going to the sublime court, but raised objections, and gave Man Singh leave to depart, while he himself stayed and procrastinated." (*Akbarnama*. iii. 57).

গৌরীশঙ্করজী বলেন, প্রতাপসিংহ বাদশাহী খেলাৎ পরিধান করার কথা দূরে থাক আকবরকে বাদশাহ বলিতেন না, বলিতেন তুর্ক ; উক্ত বর্ণনা চাটুকার আবুল ফজল বাদশাহর মহত্ত্ব বাড়াইবার জন্য মিথ্যা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পণ্ডিতজীর নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা উম্মাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

---

* এস্থলে uzr শব্দকে ghadr পড়াতে এই ঘটনাটি ইলিয়টের (vol. VI. 42) অনুবাদে ভিন্নরূপ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যেন প্রতাপ মানসিংহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা দাগাবাজী করিতে চাহিয়াছিলেন। এস্থলে গৌরীশঙ্করজী বেভারিজের 'আকবরনামা'র অনুবাদ ও পাদটীকা বোধ হয় বিশেষভাবে বিচার করেন নাই।

এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বিচারের প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন, রাজপুত ও মোগল বর্ণনার মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য? প্রথম কথা, আবুল ফজল একান্ত সমসাময়িক ঐতিহাসিক; রামকবির রচনা এবং রাজপ্রশস্তি কাব্য নিতান্ত কমপক্ষে এই ঘটনার আশি-নব্বুই বৎসর পরে লিখিত; অধিকন্তু এই রচনাগুলি ইতিহাস নহে—কাব্য মাত্র। ঐতিহাসিক বিচারে হিন্দুরচিত কাব্যকে মুসলমান-লিখিত প্রামাণ্য ইতিহাসের উপরে স্থান দেওয়া নিঃসন্দেহ অবিচার। দ্বিতীয়তঃ, "শক্তসিংহ কর্তৃক খোরাসানী মুলতানীকে বধ করিয়া প্রতাপের জীবনরক্ষার কথা" রাজপ্রশস্তি কাব্যে থাকিলেও গৌরীশঙ্করজী বলেন উহা বিশ্বাস্য নয়,—মিথ্যা জনশ্রুতিই ছন্দোবদ্ধ হইয়া রাজপ্রশস্তি কাব্যে স্থান পাইয়াছে। মানসিংহের অপমান এবং হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন বৎসর, সুতরাং "খোরাসানী মুলতানীকা অগ্‌গল" মিথ্যা হওয়া সম্ভব হইলে, প্রতাপের পেটব্যথা বা মাথাধরাও মিথ্যা হওয়া বিচিত্র নয়। যদি বলা হয়, মেবারের লোকেরা না হয় কচ্ছবাহদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য এ গল্প সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু কচ্ছবাহ-কবির মানসিংহের অপমানের কথা চিরস্মরণীয় করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? রামকবির বর্ণনায় মানসিংহের অপমান অপেক্ষা তেজ ও আত্মসম্মানই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে; নিন্দা মানসিংহের নহে, নিন্দা মহারাণা প্রতাপের। টড সাহেব ইহা বুঝিয়াও বোঝেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"Rajah Man was unwise to have risked this disgrace; and if the invitation went from Pratap, the insult was ungenerous as well as impolitic; but of this he is acquitted."

আমরা বুঝি না কেমন করিয়া প্রতাপ নিন্দার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মোট কথা, গৃহাগত অতিথিকে অপমানিত করিবার জন্য ভোজের আয়োজন, এবং প্রস্থানকালে মানসিংহ ও আকবরকে দু-দশটা গালাগালি দেওয়া নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা,—উপন্যাস মাত্র। যে চারণ এই মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল সে স্তাবক হইয়াও বুদ্ধির দোষে মহারাণা প্রতাপের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বৃথা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। তাহা মুছিতে হইলে ঐতিহাসিকগণকে বেগ পাইতে হইবে।

আমরা মনে করি, মানসিংহের নিমন্ত্রণ ও অপমানের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা; ইহাতে মানসিংহ ও প্রতাপের সাক্ষাৎকার ছাড়া অন্য এক বর্ণও সত্য নয়। টড সাহেব হইতে গৌরীশঙ্করজী পর্যন্ত যে গল্পটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্নলিখিত কারণে তাহা আমরা ভিত্তিহীন কবিকল্পনা বলিয়া মনে করি।

১। মানসিংহ প্রতাপের সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন মাস পরে রাজা ভগবান দাস

(ভগবন্ত নয়) ইডরের পথে সম্রাটের আদেশে আবার মেবারে গিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপ গোগুন্দায় আসিয়া তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করেন। মানসিংহ সত্যই যদি ঐভাবে অপমানিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতার পক্ষে তিন মাসের মধ্যে আবার মিত্রভাবে প্রতাপের সহিত দেখা করা কি সম্ভবপর? *

পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী 'আকবরনামা' হইতে অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু উপরে বর্ণিত কথাগুলি ইচ্ছাক্রমে কিংবা অনবধানতাবশতঃ তিনি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। মহারাণা প্রতাপ যুবরাজ অমরসিংহকে রাজা ভগবান দাসের সহিত আকবরের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; কেননা, আবুল ফজলের সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক নিজাম-উদ্দীন আহমদ্, কিংবা বদায়ুনী একথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা যদি সত্য হইত, তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনী বা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে মেবারবিজয় প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই ইহার উল্লেখ করিতেন; এবং কুমার কর্ণসিংহের মোগলদরবারে আগমনে বিজয়ের আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন না। স্বয়ং আবুল ফজলও তাঁহার পুস্তকের আর

* বেভারিজ কৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে নিম্নলিখিত কথাগুলি পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী আদৌ আলোচনা করেন নাই। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই প্রতাপের উত্তরাধিকারী (অমরসিংহ) রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে আকবরের দরবারে গিয়াছিলেন—যথা:

"The brief account of the campaign of this victorious army is...then proceeded towards Idar. The Zamindar thereof, Narain Das Rathor recognized the arrival of the imperial officers as a great honour and went forward to welcome them. He presented suitable gifts, and when the victorious army reached Goganda, which is the Rana's residence, Rana Kika expressed shame and repentance for his past conduct and prolonged deficiency in service, and by way of submission came and visited Rajah Bhagwant (? Bhagwan) Das. He also took to his house and treated him with respect and hospitality. He sent along with him his son and heir, and represented that by ill-fortune a feeling of desolation had taken possession of him, and that now he was presenting his petition through the Rajah and was sending his son as a mark of obedience. When his desolate (or savage) heart should become soothed by lapse of time, he too would come and do homage in person. After a little time Rajah Todar Mal also arrived from Gujrat and did homage...The Rana visited him on his way and displayed flattery and submissiveness."

(*Akbarnama*, iii. 92-93)

কোন স্থানে অমরসিংহের মোগলদরবারে আগমনের কথা লেখেন নাই। সুতরাং প্রতাপসিংহ পুত্রকে মোগলদরবারে পাঠাইয়াছিলেন এ কথাটি মিথ্যা। তাহা হইলে হয়ত সকলে বলিবেন, উপরিউক্ত সব কথাই মিথ্যা—আবুল ফজলের চাটুবাদ মাত্র।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, একজন রাজকুমার রাজা ভগবান দাসের সঙ্গে সত্যই আকবরের দরবারে কুর্নিশ করিতে আসিয়াছিলেন; রাজপুত্রের নাম অমরসিংহ হইতেও পারে; কিন্তু এ অমরসিংহ মহারাণা প্রতাপের পুত্র নহেন,—শ্যালক—ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোরের উত্তরাধিকারী। 'আকবরনামা' অনুবাদক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের বিচার-বিভ্রাটে এই ভুলটি হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে অনুবাদের পাদটীকায় অমরসিংহ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"The Lucknow editon [of *Akbarnama*] has 'the son of the Zamindar', and Blochmann (333), calls him Amar, son of the Zamindar or Rana of Idar, but it seems that he really was the son of Rana Kika.—See Jarret, (269) where he is described as Pertab's successor" (*ibid.*, p. 92, foot-note).

লক্ষ্ণৌ সংস্করণের পাঠই এস্থলে শুদ্ধ ছিল; ওখানে অমরসিংহ নাম নাই। ব্লকম্যান 'আইন্-ই-আকবরী'র অনুবাদের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন, উহা হয়ত 'আকবরনামা'র অন্য কোন হস্তলিখিত পুঁথি কিংবা অন্য ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। কিন্তু যে অমরসিংহকে ব্লকম্যান সাহেব ইডরের রাজকুমার বলিয়াছেন তাহাকেই বেভারিজ সাহেব প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ সাজাইয়াছেন। ব্লকম্যান সাহেবের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া বেভারিজ নিজেই মহাভুল করিয়াছেন। উপরি উদ্ধৃত 'আকবরনামা'র অনুবাদে "He sent along with him his son and heir···he too would soon come and do homage in person." এই কথাগুলি ইডরের রাও নারায়ণ দাস রাঠোর সম্পর্কে বলা হইয়াছে; অনুবাদে এগুলি যথাস্থানে রাখা হয় নাই। এগুলি আসিবে "He presented suitable presents" এই পদের ঠিক পূর্বে—পরে নয়।

যাহা হউক, কুমার মানসিংহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার তিন-চার মাস পরেই রাজা ভগবান দাস গোগুন্দায় মহারাণা প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—এটুকু অস্বীকার করিবার জো নাই। তাহা হইলেই প্রমাণিত হয় প্রতাপের মানসিংহকে অপমানিত করিবার কথাটা কাল্পনিক।

২। দ্বিতীয় কথা—হলদীঘাটের যুদ্ধের মাত্র চারি মাস পরে মানসিংহ দরবারে

ফিরিয়া আসিবার পর প্রতাপের হিতৈষী বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল বলেন,—

"Tricksters and time-servers suggested to the royal ear that there had been slackness in extirpating the wretch, and officers [among whom Man Singh was one] were nearly incurring the king's displeasure" [*Akbarnama*, iii. 260.]

বদায়ুনী লিখিয়াছেন,—

"And at this time, when news arrived of the distressed state of the army at Gogunda [not Kokandah] the Emperor sent for Man Singh, Asaf Khan, and Qazi Khan to come alone from that place, and on account of certain faults which they had committed, he *excluded* Man Singh and Asaf Khan (who were associated in *treachery*) *for some-time from the Court.*..."— Lowe's translation of *Muntakhab-ut-tawarikh*, p. 247.

নিজাম-উদ্দীন বলেন, মানসিংহ এবং আসফ খাঁ রাণার রাজ্যে লুটতরাজ করিতে না দেওয়ায় মোগল সৈন্যদের কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছিল—এজন্যই সম্রাট তাঁহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা মানসিংহ ঘরে-বাহিরে লাথি খাওয়ার পাত্র ছিলেন না। যদি মহারাণা প্রতাপ সত্যই তাঁহাকে ভোজন ব্যাপারে অপমানিত করিতেন তাহা হইলে মেবার-রাজ্যের উপর এতখানি দরদ মানসিংহের থাকিত কি?

৩। দুই বৎসর পর্যন্ত কুমার মানসিংহ ও রাজা ভগবান দাসের দ্বারা কার্যোদ্ধার না হওয়ায় ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সুচতুর সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁ সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াই রাজা ভগবন্ত দাস (ভগবান দাস) ও কুমার মানসিংহকে সম্রাটের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন, পাছে প্রতাপের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি কার্যে বিঘ্ন ঘটায়।

"...lest from their feelings as landholders there might be delay in inflicting retribution on that vain disturber."

৪। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে মনে হয় না মানসিংহ প্রতাপের অপমানিত শত্রু; বরং ব্যাপারটা আমূল আলোচনা করিলে মনে হয় তাঁহারা রাণার হিতৈষী ছিলেন। প্রতাপের খেলাৎ-গ্রহণ, বশ্যতাস্বীকার, শ্লোক-বাক্য ইত্যাদি সত্য না

হইতে পারে। কিন্তু বাদশাহের দরবারে এগুলি না লিখিলে নিজেদের মুখ রক্ষা হয় না, প্রতাপকেও সম্রাটের কোপ হইতে বাঁচানো যায় না, এইজন্য রাজা ভগবান দাস ও কুমার মানসিংহ এই সমস্ত কথা মোগলদরবারে বলিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা এ গল্পের কাল্পনিকতা প্রমাণিত হয়,—

১। 'বংশভাস্করে' লিখিত আছে, রাজা ভগবন্ত দাস (ভগবান দাস) মহারাণা উদয়সিংহের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ভোজন করিবার সময় কচ্ছবাহ-পতি মহারাণাকে বলিলেন—আপনিও আসুন। মহারাণা বলিলেন, আজ আমার একাশণা ব্রত ; আপনি অন্নগ্রহণ করুন। তবুও ভগবন্ত দাস মহারাণাকে ভোজন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন দেখিয়া নিজ কুলের দর্পাভিমানী শিশোদিয়া সামন্তেরা বলিয়া উঠিলেন,

> তুম সংগ ভোজন হমহু ন করহিঁ দুব বাণ উদন্ত।
> দিল্লীস কোঁ দুহিতা বিবাহ তো বড়ে কুল হন্ত॥

অর্থাৎ,—তুমি বড়ই কুলঘ্ন, দিল্লীশ্বরকে কন্যাদান করিয়াছ তুমি, রাণা উদয়সিংহের কথা দূরে থাক আমরাও তোমার সহিত ভোজন করি না। (বংশভাস্কর, পৃ ১২৪১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই বিষয়টি মামূলী গল্প।

২। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ভাটেরা এই গল্প সৃষ্টি করিয়া মোগলদের মেবার আক্রমণের কারণ স্বরূপ ইহা কখনও উদয়সিংহের নামে কখনও বা প্রতাপের নামে চালাইয়া দিয়াছে। মহারাণা উদয়সিংহের বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের কারণগুলি—অর্থাৎ মালবপতি বাজ বাহাদুরের মেবারে আশ্রয়গ্রহণ, কুমার শক্ত-সিংহের সহিত আকবরের সাক্ষাৎকার ও মোগল-শিবির হইতে কুমার শক্তসিংহের পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা ভাটদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—স্বয়ং টড সাহেবও এ সমস্ত ঘটনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। সেইজন্য রাজস্থানক ভগবন্ত দাসের অপমানের গল্পটাই আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রমণের কারণ স্বরূপ প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে ইহা আরও পল্লবিত হইয়া মহারাণা প্রতাপের নামে প্রচলিত হইল। হলদী-ঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ ও মানসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রতাপের ঘোড়া 'চেটকে'র (চৈতক নয়) পা মানসিংহের হাতীর মাথায় তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি এই গল্পের উপসংহার এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৩। যে সময়ে এ গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল সে সময়ে সগরজী ও তাঁহার তথাকথিত ধর্মত্যাগী পুত্র মহাবৎ খাঁ রাজপুতানায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; নতুবা মহাবৎ খাঁকে হলদীঘাটে টানিয়া আনিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মহাবৎ খাঁ নিজের বিশ্বস্ত রাজপুত সৈনিকদের সাহায্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়াছিলেন ; সুতরাং মহাবৎ খাঁর* দেহে রাজপুত রক্ত থাকাই সম্ভব ; এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসজ্ঞানহীন চারণ-কবি তাঁহাকে সগরজীর পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মনে হয় সম্রাট শাহ্‌জাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেই বোধ হয় উল্লিখিত গল্পটি সৃষ্ট হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয়, টড ও 'বীর-বিনোদ' প্রণেতা শ্যামলদাসজীর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করজীর মত ঐতিহাসিকও প্রতাপ ও মানসিংহ সম্বন্ধীয় অনৈতিহাসিক গল্পটি মানসিংহের মেবার অভিযানের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, অথচ এই ব্যাপার ও হলদীঘাটের যুদ্ধের মধ্যে পূর্ণ তিন বৎসরের ব্যবধান। উভয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রত্যেকেই বিবেচনা করিবেন।

* মহাবৎ খাঁব জীবনী, 'তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী' এবং 'মাসিব-উল্-উমারা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ; তাঁহার পূর্বনাম ছিল জমানা বেগ ; তিনি কাবুলবাসী ঘেউর বেগের পুত্র। মহাবৎ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর তিনি আশ্রিত মোল্লাদের দ্বারা কেতাব লেখাইয়া সৈয়দ হইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হলদীঘাটের যুদ্ধ

মহারাণা প্রতাপের রাজত্বের (১৫৭২—১৫৯৭ খৃঃ) ইতিহাস মোগল সাম্রাজ্যের সহিত তাঁহার অবিরত সংগ্রামের সুদীর্ঘ কাহিনী। রাজ্যারোহণের পর মহারাণার পক্ষে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা ও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য অবকাশ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল; সম্রাট আকবরও এই সময়ে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট জয়ে ব্যস্ত থাকায় উভয় পক্ষই সহসা যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিলেন। বিনাযুদ্ধে মহারাণাকে বশীভূত করিবার জন্য আকবর চেষ্টার কিছু ত্রুটি করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার আদেশে কুমার মানসিংহ এবং রাজা ভগবান দাস রাণাকে বুঝাইবার জন্য বন্ধুভাবে উদয়পুর গিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব নীতিবর্জিত ছিল না। তিনি মানসিংহ এবং রাজা ভগবান দাসকে নানা রকমে আপ্যায়িত করিয়া স্তোক-বাক্য ও ছলনা দ্বারা মোগল সম্রাটকে তিন বৎসর পর্যন্ত ভুলাইয়া রাখিলেন। 'আকবরনামা' পাঠে মনে হয় প্রতাপ যেন 'যাই যাই' করিয়া মোগলদরবারে যান নাই, অথচ তিনি ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে প্রতাপের পক্ষে অগৌরবের কিছুই নাই।—ইহাই রাজনীতি।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট আকবর মানসিংহের অধ্যক্ষতায় পাঁচ হাজার সৈন্য রাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তাহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন মীরবক্‌শী আসফ খাঁ। সম্রাট আকবরের মনের ভাব যাহাই হউক মোল্লারা এই অভিযানকে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ বিবেচনা করিয়া ইহাতে শরিক হওয়ার জন্য অস্থির হইলেন। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী দরবার হইতে কয়েক মাসের ছুটির জন্য নকীব খাঁকে সম্রাটের কাছে সুপারিশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নকীব খাঁ গোঁড়ামিতে মোল্লা সাহেবের উপর আরও এক কাঠি। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন,—এ লড়াইয়ের সর্দার যদি কাফের না হইয়া একজন মুসলমান হইতেন তাহা হইলে আমিই সর্বপ্রথম ইহাতে শরিক হইতাম। মোল্লা বদায়ুনী তাঁহাকে বুঝাইলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ; সর্দার হিন্দু হইলেও বাদশার নিমক্‌খোর গোলাম। সম্রাটের অনুমতি পাইয়া মোল্লা বদায়ুনী মহা উল্লাসে কাফের জয় করিবার জন্য আরও কয়েকজন 'একদিল' বন্ধুর সহিত মানসিংহের সেনায় যোগ দিলেন। তিনি হলদীঘাটের যুদ্ধের সরস ও নিরপেক্ষ বর্ণনা নিজের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন।

আজমীর হইতে মোগল সৈন্য মাণ্ডলগড় পৌঁছিয়াছে শুনিয়া মহারাণা কুম্ভলমীর দুর্গ হইতে সসৈন্য গোগুন্দায় আসিলেন। মোগল সৈন্য লম্বা লম্বা কুচ্‌ করিয়া জুন

মাসের প্রথমে নাথদ্বারার* পথে গোগুন্দার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নাথদ্বারা হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে খমনোর গ্রাম। খমনোর হইতে তিন মাইল পশ্চিমে গোগুন্দা ও খমনোরের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে হলদীঘাটের সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। কুমার মানসিংহ খমনোর ও হলদীঘাটের মাঝামাঝি বনাস নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। ওদিকে মহারাণাও গোগুন্দা হইতে যাত্রা করিয়া মোগল শিবির হইতে তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের আশ্রয়ে শত্রুসৈন্যের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 'বীর-বিনোদ' গ্রন্থে কবিরাজা শ্যামলদাসজী লিখিয়া গিয়াছেন, হলদীঘাটের যুদ্ধের একদিন পূর্বে কুমার মানসিংহ কয়েকজন অনুচরের সহিত শিকারে গিয়াছিলেন, গুপ্তচরদের মুখে খবর পাইয়া শিশোদিয়া সামন্তগণ মহারাণাকে বলিলেন এমন সুযোগ ছাড়া হইবে না; শত্রুকে বধ করা চাই। কিন্তু ঝালাসর্দার বীদার (মানসিংহ) মতানুসারে মহারাণা তাঁহাদিগকে এ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, ছল দাগাবাজী দ্বারা শত্রুকে বধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে।† এই গল্পটিতে কোন ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা সন্দেহ। মোল্লা বদায়ূনী কোন শিকারের উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ মহারাণা ছল-কৌশলে (guerilla warfare) মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াই অবশেষে কৃতকার্য হইয়াছিলেন; হলদীঘাটের যুদ্ধ ছাড়া খোলা ময়দানে তিনি মোগলদের সহিত আর কখনও লড়াই করেন নাই। সত্যই যদি মানসিংহকে হাতে পাইয়া মহারাণা ছাড়িয়া দিয়া থাকেন সেটার জন্য ক্ষত্রিয় ধর্মের দোহাই দেওয়া অনর্থক। ইহাতে বুঝা যায় মানসিংহের উপর মহারাণার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত খমনোরের নিকট মেবার ও মোগল সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, কুমার মানসিংহের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫,০০০ অশ্বারোহী এবং কয়েকটা জঙ্গী হাতী। মোগলব্যূহের মাঝখানে হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং মানসিংহ ও কয়েকজন মুসলমান মনসবদার, দক্ষিণভাগে সৈয়দ আহমদ্ খাঁর অধীনে রণকুশল ও সাহসী বারহা সৈয়দগণ, বামভাগে কাজী খাঁর (গাজী খাঁ?) নেতৃত্বে মুসলমান পল্টন, এবং রায় লুনকরণের অধীনে একদল রাজপুত, কুমার মানসিংহের সম্মুখে এবং হরাবলের পিছনে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে তাঁহার বড় ভাই মাধোসিংহের অধীনে

* বদায়ূনীর মূল ফারসীতে আছে '*dar* balda-i-*Namdara*'. লো সাহেব অনুবাদে 'is in city of *Darrah*' লিখিয়াছেন। মেবারে *Darrah* নামে কোন শহর নাই। ইহা হলদীঘাট হইতে এগার মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 'নাথদ্বারা'।

† রাজপুতানেকে ইতিহাসে উদ্ধৃত (৩য় ভাগ, পৃ. ৭৪৪)।

এক পল্টন রাজপুত সৈন্য। সামরিক পরিভাষায় সৈন্যের এই বিভাগকে "আলতামশ" বলা হইত। কেন্দ্রস্থ সৈন্যদলের পিছনের পৃষ্ঠরক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন মেহতর খাঁ, বাদশাহী ফৌজের হরাবলে রাজপুত পল্টনের অধ্যক্ষ ছিলেন জগন্নাথ কচ্ছবাহ, এবং মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন আসফ খাঁ। ঐতিহাসিক মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী হরাবলের মাঝখানে আসফ খাঁর পাশেই সওয়ার ছিলেন। হরাবলের এক অংশের নাম ছিল হরাবলের "মোরগবাচ্চা"। ইহারা হরাবল হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সর্বপ্রথমেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিত। "মোরগবাচ্চারা" সংখ্যায় আশি-নব্বুই জন, সৈয়দ হাসিম বারহার নেতৃত্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল।

অপর পক্ষে মহারাণা তাঁহার ৩,০০০ অশ্বারোহীকে যথারীতি বিভাগ করিয়া আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। মহারাণাব সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও পাহাড়ের আড়ালে থাকায় সমতলভূমির মোগল সৈন্যের যে কোন ভাগ আক্রমণ করিবার সুবিধাটুকু তাঁহার ছিল। মেবার সৈন্যের পাঠান বাহিনী হাকিম খাঁ সুরের নেতৃত্বে মোগল সৈন্যের সম্মুখস্থ পশ্চিম দিকের পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বরাবর 'মোরগ-বাচ্চা'দের উপর চড়াও করিল। উঁচু নীচু জমি, টিলা, টক্কর ও কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে মোগলেরা বেকায়দায় পড়িল। পাঠানেরা মোরগবাচ্চাদের তাড়াইয়া হরাবলের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। (*Harawal u-jauja-i-Harawal eke shud*)। তাহাদের নেতা হাসিম বারহা ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন; সৈয়দ রাজু তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। ঠিক এই সময়ে রাজপুত সেনা ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া মোগল সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিল। মেবার বাহিনীর হরাবলের অধিনায়ক ছিলেন বীর জয়মলের পুত্র রামদাস রাঠোর, মধ্যভাগে স্বয়ং মহারাণা, দক্ষিণ দিকে রাজা রামশা (গোয়ালিয়রী), বামদিকে ঝালা বীদা (মানসিংহ), ঘাঁটি হইতে বাহির হওয়ার সময় মহারাণার দক্ষিণ পক্ষই সৈন্যদলের অগ্রে* ছিল। তাহার ঘাঁটির মুখে কাজী খাঁর অধীনে মোগল-ব্যূহের বাম দিকেই মুসলমানদিগকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। কাজী খাঁর দলে শেখ মনসুরের কর্তৃত্বে ফতেপুর সিক্রীর

* বদায়ুনী লিখিয়াছেন *Ram Sah Gawaliori···ke pesh pesh-i-Rana me amad* অর্থাৎ রাম শা যিনি রাণার আগে আগে আসিতেছিলেন। কিন্তু লো সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Ram Shah······who *always kept in front.* ইহাতে মূলের অর্থ বিকৃত হইয়াছে। বদায়ুনীর বর্ণনায় দেখা যায় রামশার আক্রমণে মোগল হরাবলের বাম দিক হইতে (az *chup-i-*Harawal) মানসিংহের রাজপুতেরা (যাহাদের সর্দার ছিলেন লূনকরণ) ভেড়ার ন্যায় পলাইয়াছিল। সুতরাং মনে হয় রামশা প্রথমে ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া মোগলদলের বাম পক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

শেখজাদাগণও ছিল। যুদ্ধের প্রথমেই শেখজাদাগণ সোজা পিছনের দিকে ছুটিল। পলায়নের সময় শেখ মন্‌সুরের পশ্চাদ্দেশে একটি তীর লাগিয়াছিল—ইহার ঘা নাকি বহু দিন শুকায় নাই! কাজী খাঁ মোল্লা হইলেও সাহসে ভর করিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বুড়ো আঙ্গুলে তলোয়ারের চোট লাগাতে তাঁহার একটা হদিশ মনে পড়িল ; যথা

"Flight from overwhelming odds is one of the tradition of the Prophet."

এবং এই হদিস আওড়াইয়া তিনিও পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। মহারাণার রাজপুতেরা তাঁহার দলকে তাড়াইয়া মোগল বাহিনীর মধ্যভাগের উপর ফেলিল (bar qalb zad)।* রাজা রামশার আক্রমণে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া রায় লুনকরণের রাজপুতেরা ভেড়ার পালের ন্যায় শাহী ফৌজের হরাবলের দিকে ছুটিতে লাগিল, এবং হরাবল ভেদ করিয়া শাহী ফৌজের দক্ষিণ ভাগের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হাকিম খাঁ সুরের আক্রমণে মোগল হরাবল পূর্বেই পরাজিত ও ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। এ সময়ে লুনকরণের রাজপুতেরা ইহার উপর আসিয়া পড়াতে বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়া গেল। পলায়নপর মোগল-পক্ষীয় রাজপুত এবং তাহাদের অনুসরণকারী মহারাণার রাজপুত মিশিয়া যাওয়াতে বদায়ূনী আসফ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর! শত্রু মিত্র চেনা যায় না, তীর নিশানা করিব কোন্ দিকে?" আসফ খাঁ মীরবক্‌শী নির্বিকারচিত্তে হুকুম দিলেন, "কুছ্ পরোয়া নাই। যে কেহ সামনে থাকুক না কেন তীর ছুঁড়িতে থাক, হয় এদিকে না-হয় ওদিকের কাফেরই জাহান্নমে যাইবে, ইসলামের উভয়ত্র লাভ।" মোল্লা সাহেব ও তাঁহার বন্ধুরা বেপরোয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন। ঠাসাঠাসি মানুষের পাহাড়, মোল্লাজীর কাঁচা হাতের নিশানাও

* Lowe বদায়ূনীর অনুবাদে লিখিয়াছেন swept his [Qazi Khan's] men before him and bearing them along broke through his centre, অথচ মূলে আছে *bardashtah u raufiah bar qalb zad* ইহার অর্থ তাহাদিগকে উড়াইয়া সেনার মধ্যভাগের উপর ফেলিল। লো সাহেবের অনুবাদ শুদ্ধ নয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় কাজী খাঁর মধ্যভাগ ভাঙিয়াছিল। কাজী খাঁর মধ্যভাগ বলিয়া কিছু ছিল না, ভাঙার কথাও নাই। আশ্চর্যের বিষয় গৌরীশঙ্করজী বদায়ূনীর মূলের সহিত না মিলাইয়া লো সাহেবের অশুদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ হিন্দীতে ভাষান্তরিত করিয়াছেন। "উস্‌কী সেনা কা সংহার করতা হুয়া বহ উস্‌কে মধ্য তক্ পঁহুছ গিয়া"। (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৭৪৪) :

ব্যর্থ হইল না ; মোল্লা বদায়ুনী লিখিয়া গিয়াছেন, এ কাজটা যে কিছুমাত্র অধর্ম নয় তাঁহার নিষ্পাপ মনই সাক্ষ্য দিল। কালিদাসের দুষ্মন্তের মত তিনি ভাবিলেন

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু।
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল জেহাদের "সওয়াব" হাসিল করিয়া তিনি গাজী হইয়াছেন [*suab-i ghaza hasil shud*]। এ ভাবে কিছুক্ষণ বাদশাহী ফৌজের রাজপুত-দিগকে মারিয়া আসফ খাঁ ও মোল্লাজীর দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। হরাবলের মুষ্টিমেয় রাজপুতগণকে বিপন্ন করিয়াই আসফ খাঁ পলাইয়াছিলেন এ কথা বদায়ুনী লিখেন নাই।

হরাবলকে পরাজিত করিয়া হাকিম খাঁ সুর মানসিংহের সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিলেন। সৈয়দেরা সাহসী যোদ্ধা হইলেও এ আক্রমণের সম্মুখে হটিয়া গেল। পলায়নটা সংক্রামক ; একবার আরম্ভ হইলে উহাকে ঠেকান দায়। মানসিংহের হরাবল, বাম পক্ষ ও দক্ষিণ পক্ষ পরাজিত ও ভগ্ন হওয়াতে মহারাণার সৈন্য প্রবলবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। জগন্নাথ কচ্ছবাহের অধীনে হরাবলের বিপন্ন রাজপুতগণকে সাহায্য করিবার জন্য "আলতামশের" সেনাপতি মাধোসিংহ অগ্রসর হইলেন। এদিকে মহারাণা তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদের রক্ষা করিবার জন্য মাধো-সিংহকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধের এ অবস্থায় মাধোসিংহ ও জগন্নাথের সেনাদলকে ডানদিকে রাখিয়া কুমার মানসিংহ প্রাণপণে মহারাণার দক্ষিণ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বোধ হয় মানসিংহের সৈন্যকেও মহারাণা পিছু হঠাইয়া দিয়াছিলেন। জগদীশ মন্দিরের প্রশস্তিকার একটি সুন্দর শ্লোকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃত্বা করে খড়্গলতাং স্ববল্লভাং
প্রতাপসিংহে সমুপাগতে প্রগে॥
সা খণ্ডিতা মানবতী দ্বিষচ্চমূঃ।
সংকোচয়ন্তি চরণৌ পরাঙমুখী॥

আবুল ফজল লিখিয়াছেন, "in the opinion of the superficial the foe was prevailing." অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিতে মনে হইল শত্রু জয়ী হইতেছে। টডের 'রাজস্থানে' হলদীঘাটের যুদ্ধবর্ণনা এবং এ সম্বন্ধে রাজপুতপক্ষের জনশ্রুতিমূলক কথাগুলি প্রায় সাড়ে পনেরো আনা মিথ্যা। গৌরীশঙ্করজী ইহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"মহারাণা নীল (শ্বেত) ঘোড়া চেটকের উপর সওয়ার ছিলেন। তিনি কুমার

মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাঁহার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বর্মে সুরক্ষিত থাকায় মানসিংহ বাঁচিয়া গেলেন, এমন সময় চেটক সম্মুখের দুই পা মানসিংহের হাতীর মাথার উপর উঠাইয়া দেওয়াতে হাতীর শুঁড়ে বাঁধা তলোয়ার লাগিয়া চেটকের পিছনের একটি পা জখম হইয়া গেল। মহারাণা কুমার মানসিংহকে মৃতজ্ঞান করিয়া ঘোড়া পিছু হঠাইলেন।"

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপ এবং মানসিংহের আদৌ দেখা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। বদায়ুনী বলেন, মহারাণা,—যিনি মাধোসিংহের মুখোমুখি লড়িতেছিলেন, তীর দ্বারা আহত হইয়াছিলেন।

*U zakhma h-i-tir bar Rana ke ru-ba-ru-i-Madho Singh bud rasid.**

আবুল ফজল লিখিয়াছেন মোগল হরাবলের অন্যতম সেনানায়ক জগন্নাথ কচ্ছবাহের হাতে মহারাণার হরাবলের অধিনায়ক রামদাস রাঠোর মারা যান; কিন্তু জগন্নাথের জীবন বিপন্ন হওযাতে পিছনে গালতামশ হইতে মাধোসিংহ তাঁহার সাহায্যার্থ আসেন; সুতরাং তাঁহার সহিত মহারাণার (যিনি নিজ হরাবলের পিছনে ছিলেন) সংঘর্ষ হওয়াই সম্ভব। কুমার মানসিংহ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মাধোসিংহের পিছনে এবং শেষাশেষি তাঁহার বাম ভাগে থাকিয়া সম্ভবতঃ মহারাণার বিজয়ী দক্ষিণ পক্ষের সেনাপতি রামশার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। রামশা তাঁহার তিন পুত্রের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান; গোয়ালিয়রের তঁবর রাজবংশ নির্বংশ হইল। কিন্তু আবুল ফজল অন্যত্র লিখিতেছেন,—যুদ্ধের সময় মহারাণা ও মানসিংহ পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া অনেক বীরত্ব প্রকাশ করেন। বদায়ুনীর চাক্ষুষ বর্ণনা উপেক্ষা করিয়া ইহা গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নাই। আবুল ফজলের অপেক্ষা বদায়ুনী কুমার মানসিংহের অনেক বেশী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মানসিংহের সর্দারীর দ্বারা সেদিন মোল্লা শেরীর লেখা পদটির প্রকৃত মর্ম বুঝা গেল। *Ke Hindu me-zanad Shamsher i-Islam* (অর্থাৎ হিন্দুই ইস্‌লামের তলোয়ার)।

মহারাণা প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ ও দক্ষিণ ভাগের আক্রমণের সম্মুখে কুমার মানসিংহের বাহিনী যখন বিচলিত হইয়া পড়িতেছিল, তখনই একটি গোলমাল উঠিল

* Pers. text., ii. p. 233. লো সাহেব ইহার ইংরেজী অনুবাদে লিখিয়াছেন "And showers of arrows were poured on the Rana who was opposed to Madho Singh (ii. 239). ইহা অশুদ্ধ, "জখম" শব্দ তিনি বাদ দিয়াছেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর লো সাহেবের ভুল অনুবাদের অনুবাদ হিন্দীতে করিয়াছেন; মূল ফার্সীর সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই।

স্বয়ং বাদশা আকবর আসিতেছেন। বদায়ুনী বলেন প্রথম আক্রমণে বাদশাহী ফৌজ হইতে যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নদীর (বনাস) অপর পারে পাঁচ-ছয় ক্রোশ পর্যন্ত ঘোড়া দৌড়াইয়া তবেই দম লইয়াছিল। এ সময়ে মোগলবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যদলের নেতা মেহতর খাঁ মিথ্যা রব উঠাইলেন যে, স্বয়ং জাঁহাপনা আসিতেছেন। ইহা বিশ্বাস করিয়া পলাতক সৈন্যেরা ক্রমশঃ জমা হইয়া গেল। এই সৈন্যদল আবার সুশৃঙ্খল করিয়া তিনি মানসিংহের সাহায্যের জন্য (বোধ হয় বাম পক্ষ হইতে) সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় মহারাণার বাম পক্ষও মানসিংহের দক্ষিণ পক্ষের সম্মুখে ক্রমশঃ হটিতে লাগিল। এই ভাগের অধ্যক্ষ ঝালা বীদা মারা যাওয়াতে হাকিম খাঁ সুর পিছু হটিয়া মহারাণার সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় বাদশাহী ফৌজের পুনর্গঠিত বাম ও দক্ষিণ পক্ষ দ্বারা মেবার সৈন্য দুই পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া মহারাণা নিজের সৈন্য পিছু হঠাইয়া লইলেন। তিনি হলদীঘাটের মধ্য দিয়া পর্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বে ফিরিয়া আসিলেন। মেবার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাণভয়ে পলাইয়াছিল বলিয়া বদায়ুনী লিখেন নাই। তিনি বলেন মহারাণার পিছু লইবার মত সাহস ও শক্তি মোগল সৈন্যের ছিল না। দুপুর বেলায় ভীষণ "লু" চলিতেছিল এবং গরমে মাথার খুলির মগজ পর্যন্ত সিদ্ধ হইতে লাগিল। মোগল সৈন্যেরা বিশেষ সন্দেহ করিল রাণা পাহাড়ের পিছনে ছল করিয়া ওৎ পাতিয়া আছেন [*ghuman-i-ghalib in bud*]

হলদীঘাটের যুদ্ধ বর্ণনায় টড লিখিয়াছেন,—

"Sukhta whose *personal enmity* to Pertap had made him *a traitor* to Mewar, beheld from the ranks of Akbar the blue horse flying unattended · He joined in the pursuit, but only to slay the pursuers [*Khorasani and Multani*] who fell beneath his lance." *Rajasthan*, i. 314). মহারাণা জয়সিংহের সময় রচিত রাজপ্রশস্তি কাব্যের দ্বারা সমর্থিত হইলেও পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী স্বঃ হলদীঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত * এবং শত্রুর

* 'And when the air was like a furnace and no power of movement was left in the soldiers, the idea became prevalent that the Rana by stealth and stratagem must have kept himself concealed behind the mountains. This was why there was no pursuit, but the soldiers retired to their tents and occupied themselves in the relief of the wounded" (Lowe's translation of *Muntakhab-ut-tawarikh*, ii. 239).

পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল; অধিকন্তু রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে বিজেতাদের সোয়াস্তি ছিল না। শক্তসিংহ মোগলের পক্ষে বা বিপক্ষে হলদীঘাটে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং খোরাসানী ও মুলতানী সওয়ার এবং "খোরাসানী-মুলতানী কা অগ্‌গল" ভাটের কল্পনামাত্র। হলদীঘাটের যুদ্ধের পর মোগল-শিবিরে কুমার সেলিম কর্তৃক শক্তসিংহকে তিরস্কার ও বিদায় ইত্যাদিও জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যা; সে-সময় হয়ত ছয় বৎসরের বালক সেলিম ফতেপুর সিক্রীর অন্দরমহলে কবুতর উড়াইতেছিলেন। টড-বর্ণিত শক্তসিংহের জীবনীর এই অংশ পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন। কিন্তু শক্তসিংহের সহিত প্রতাপের বিবাদ. যুদ্ধে উদ্যত ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে পুরোহিতের প্রাণত্যাগ, প্রতাপ কর্তৃক শক্তসিংহের নির্বাসন ইত্যাদি ব্যাপার তিনি আলোচনা করেন নাই; যেন পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। টডের 'রাজস্থান' অনুসারে শিকারের সময় প্রতিযোগিতাই বিবাদের কারণ। 'বংশভাস্কর'-প্রণেতা সুরজমল বলেন, প্রতাপসিংহ চেটক ও অন্যান্য অনেক আরবী ঘোড়া খরিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার একটিও শক্তসিংহকে না দেওয়াতে তিনি রুষ্ট হইয়া মোগল-সম্রাট আকবরের কাছে গিয়াছিলেন। (বংশভাস্কর, পৃ. ১৬৫৮)। কিন্তু আকবরনামায় লেখা আছে শক্তসিংহ উদয়সিংহ বাঁচিয়া থাকিতে একবার মাত্র আকবরের কাছে গিয়াছিলেন; এবং আকবরের মেবার আক্রমণের জল্পনা-কল্পনা শুনিয়া তিনি মোগল-শিবির হইতে পলায়ন করেন। সুতরাং প্রতাপের রাজ্যারোহণের পর এ ঘটনা হয় নাই ইহা সুনিশ্চিত; এবং রাজ্যারোহণের পূর্বেও তাঁহাদের মধ্যে কোন বিবাদের কারণ বিদ্যমান ছিল না। উদয়সিংহের অবিচার ও তাচ্ছিল্য সমান ভাবেই প্রতাপ ও শক্তসিংহের পূর্বজীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও টড সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, আত্মত্যাগী পুরোহিতের বংশধরেরা তাঁহার সময় পর্যন্ত সম্ভবতঃ—অদ্যাবধি—জাগীর ভোগ করিয়া আসিতেছেন তবুও এ সমস্ত আগাগোড়া কাল্পনিক মনে হয়।

মহারাণা প্রতাপের সময় হইতে উদীয়মান শক্তাবতগণের পৌরুষ ও শৌর্যে চুণ্ডাবতদিগের প্রভাব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে; এবং পরবর্তীকালে "হরাবল" বা যুদ্ধবাহিনীর অগ্রভাগ চালনা করিবার দাবি লইয়া উভয় বংশের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। প্রতাপের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে শক্তসিংহ সম্বন্ধীয় গল্পটি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; ইহা শক্তাবত চারণদের মস্তিষ্কপ্রসূত। কথিত আছে, একদিন চুণ্ডাবত-কীর্তি-অসহিষ্ণু শক্তসিংহ চুণ্ডাবত-চারণদের "দস সহস মেবার কা বর কেবাড়" অর্থাৎ দশ হাজার চুণ্ডাবত মেবারের বড় কেবাড় বা তোরণ—এই

স্পর্ধা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইহাতে শক্তসিংহের চারণপ্রধান বলিয়া উঠিল, "কেন, আপনিই তো সেই কেবাড়ের অর্গল।" বোধ হয় আরও দু-এক পুরুষ পরে এই অর্গল শব্দের টীকা-ভাষ্য হইতে খোরাসানী ও মুলতানী এবং তাহাদের অগ্‌গল-স্বরূপ শক্তসিংহের হলদীঘাটের উপস্থিতির কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে।

এইবার আমরা মহারাণা প্রতাপ ও সম্রাট আকবরের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি আলোচনা করিব।

বিঃ সঃ ১৬৩৩, জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায় (১৮ই জুন, ১৫৭৬) হলদীঘাটের* যুদ্ধে শক্রর কৌশলে পরাজিত হইয়া মহারাণা প্রতাপ গোগুন্দার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই যুদ্ধে মেবার সৈন্য অপেক্ষা মোগলেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, মোগল পক্ষে ১৮০ মুসলমান নিহত ও ৩০০ আহত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে রাজপুতের সংখ্যাই বেশী ছিল—রাজপুত মরিয়াছিল মোট ৩২০ জন। মোটামুটি রাণার পক্ষীয় ২০০ জন যোদ্ধা বোধ হয় এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, ইহাদের মধ্যে ছিলেন ঝালা বীদা, ঝালা মানসিংহ, তঁবর রাম শা ও তাঁহার তিন পুত্র, রাবত নৈনসী, রাঠোর রামদাস, রাঠোর শঙ্করদাস, ডোড়িয়া ভীমসিংহ ইত্যাদি সর্দার। মোটের উপর চিলিয়ান্‌ওয়ালার যুদ্ধে যেভাবে ইংরেজেরা জয়ী হইয়াছিলেন, হলদীঘাটে মুসলমান পক্ষেরও সেরূপ অনিশ্চিত জয় ও অধিকতর ক্ষতি হইয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ স্থির করিলেন যে মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা হইবে না, কারণ যুদ্ধে বিজয়ী হইলেও ইহাতে তিনি সৈন্য সংখ্যায় দুর্বল হইয়া পড়িবেন, তিনি গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া পর্বতশ্রেণী আশ্রয় করিলেন, আরাবল্লীর প্রত্যেক গিরিসঙ্কট সুদৃঢ় করিয়া ভীলদের উপর উহার রক্ষার ভার দিলেন। যুদ্ধের পরদিন মানসিংহ গোগুন্দা দখল করিলেন। কিন্তু এইখানে মোগল সৈন্যেরা এক রকম অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, রসদ বন্ধ, সর্বদা রাণার আক্রমণের ভয়, ইহার উপর পার্বত্য প্রদেশে দারুণ বৃষ্টি। শাহী ফৌজ কয়েক দিন ধরিয়া রুটির অভাবে শুধু পাকা আম ও মাংস খাইতে লাগিল; ইহার ফলে অনেকের পীড়া (আমাশয় ?) দেখা দিল।

তিন মাস পরে সম্রাট আকবর স্বয়ং আজমীরে† পৌঁছিলেন (২৬শে সেপ্টেম্বর,

* উভয় সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল খমনোর নামক গ্রামে। উদয়পুরের নাথদ্বারা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত; হলদীঘাট ও খমনোরের মধ্যে ব্যবধান অনূন তিন মাইল।

† *Akbarnama*, iii. 259.

১৫৭৬ খৃঃ)। ইহার পূর্বেই মানসিংহ গোগুন্দা ত্যাগ করিয়া মেবারের সমতল ভূমিতে আসিয়াছিলেন। সৈন্যের দুর্দশার কথা শুনিয়া সম্রাট মানসিংহ ও আসফ খাঁকে আজমীর আসিতে আদেশ করিলেন। পুরস্কারের পরিবর্তে তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিল তিরস্কার ও অপমান। বাদ্‌শা কিছুদিনের জন্য তাঁহাদিগকে দরবারে প্রবেশ নিষেধ করিলেন (Lowe's *Muntakhab-ut-tawarikh*, ii *P. 247*).

মহারাণা প্রতাপকে দমন করিবার জন্য এবার স্বয়ং আকবর আসরে নামিলেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর আজমীর হইতে গোগুন্দা পৌঁছিয়া, কুতবউদ্দীন খাঁ, রাজা ভগবানদাস এবং কুমার মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, তাঁহাদের প্রতি আদেশ ছিল পার্বত্য প্রদেশে যেখানেই থাকুক প্রতাপের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিতেই হইবে। এদিকে গুজরাট সীমান্তে প্রতাপের শ্বশুর নারায়ণ দাসকে দমন করিবার জন্য কুলিজ খাঁ, তৈমুর বখ্‌শী প্রভৃতি সেনাপতিরা নিযুক্ত হইলেন। এ সময়ে প্রতাপের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ সিরোহীরাজ রাও সুরতান এবং জালোরপতি তাজ খাঁ পাঠানও মোগলদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। তাঁহাদের দমনের জন্য তরসুন খাঁ, রায় রায়সিংহ ও সৈয়দ হাশিম বারহা নিযুক্ত হইল। ইডর, সিরোহী ও জালোর পুনর্বার বিজিত হইল বটে, কিন্তু মহারাণা প্রতাপ দমিলেন না। রাজা ভগবানদাস ও কুতবউদ্দীন খাঁ কিছুদিন পাহাড়ে পাহাড়ে ফিরিলেন, কিন্তু প্রতাপের কোন সন্ধানই পাইলেন না। এবার রাজশ্যালক ভগবানদাস ও কুতবউদ্দীন খাঁ তিরস্কৃত হইলেন এবং তাঁহাদের কিছুদিনের জন্য দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।* সম্রাট অনেকটা হতাশ হইয়া বান্‌সওয়ারার দিকে চলিলেন, রাণাকে দমন করিবার জন্য বৈরাম খাঁর পুত্র রহিম (খান্‌-ই-খানান), কাসম খাঁ মীরবহর, রাজা ভগবানদাস ও কুমার মানসিংহ গোগুন্দার দিকে প্রেরিত হইলেন।† এইবার আরাবল্লী শৈলশৃঙ্গে মোগল ও শিশোদিয়া জীবন লইয়া লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিল। রাণা এক পাহাড়ে আছেন শুনিয়া মোগলেরা ঐ পাহাড় ঘিরিয়া ফেলিলে অন্যদিক হইতে রাণা আসিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করেন—ব্যাপার এ রকমই কিছুদিন চলিল। মোগল সেনাপতিরা উত্ত্যক্ত হইয়া উদয়পুর ও গোগুন্দা হইতে থানা উঠাইয়া লইল; মোহীর থানাদার মুজাহিদ বেগ রাজপুতদের হাতে প্রাণত্যাগ করিল।‡ রাজপুত

* *Ibid.*, P. 256.

† *Ibid.*, P. 277.

‡ আকবরনামা, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩০৫।

ঐতিহাসিকেরা বলেন এই সময়ে কুমার অমরসিং একবার খান্‌খানান আবদুর রহিমের তাঁবু হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীদের বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণা প্রতাপ তাঁহাদিগকে মাতার মত যত্নে ও সসম্মানে মোগল শিবিরে পাঠাইয়া দেন। রাজপ্রশস্তিকার ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"অমরেশঃ খানখানাদাবাণাং হরণং ব্যধাৎ।
স্ববাসিনীবৎ সংতোষ্য প্রেষযামাস তাঃ পুনঃ।"

কোন সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই। রাজপ্রশস্তিকার অনেক ভিত্তিশূন্য গল্প লিখিয়াছেন ; সুতরাং ইহা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। নিঃসন্দেহ এবারও মোগল সৈন্য অকৃতকার্য হইয়া মেবারের পার্বত্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

এক বৎসরের মধ্যে মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে তিনবার অভিযান করিয়াও মোগল সৈন্য মেবার জয় করিতে পারিল না, রাজা ভগবানদাস, মানসিংহ, আসফ খাঁ প্রভৃতি তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইলেন ; তবুও তাঁহাদের দ্বারা কার্যোদ্ধার হইল না। পর বৎসর অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট আকবর আবার আজমীরে আসিয়া মহারাণাকে দমন করিবার জন্য বিরাট আয়োজন করিতে লাগিলেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন,—

That the pleasant abode of the world may not be stained by the confusion of plurality, Rajah Bhawant Das, Kunwar Man Singh, Payinda Khan Mughal···were·········despatched to carry out *this great work.* Shah Baz Khan Mir Bakshi was appointed to command this force and the execution of the task was committed to him." (*Akbarnama*, iii. 307).

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় মহারাণা প্রতাপকে সম্রাট আকবর তাঁহার একাতপত্র প্রভুত্বের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন—এজন্য তাঁহাকে দমনের জন্য মোগল সম্রাটের বারংবার চেষ্টা। শাহবাজ নিজের নাম সার্থক করিবার জন্য বহু সৈন্য লইয়া প্রতাপের বাসস্থান কুম্ভলমীর দুর্গ অবরোধ করিল। দুর্গের রসদ বন্ধ হওয়াতে

রাজপুতানেকা ইতিহাসের ৩য় খণ্ড, ৭৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। আকবরনামায় দেখিতে পাই ১৫৮৬ খৃঃ মির্জোর্গীর কাছে একদিন খানখানান পুরস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া শিকারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার একটা বিপদ হইয়াছিল,—স্ত্রীদের বন্দী হওয়ার কথা নাই। (*Akbarnama*, iii. 711).

মহারাণা প্রতাপ কুম্ভলমীর ত্যাগ করিয়া রাণপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বড় তোপ ফাটিয়া যাওয়াতে দুর্গস্থ গোলা-বারুদ সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। দুর্গরক্ষক প্রতাপের মামা রাওভান সোন্‌গরা ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সমস্ত অনুচরের সহিত নিহত হইলেন; কুম্ভলমীর মোগলদের হস্তগত হইল (১৫৭৮ খৃঃ ৩রা এপ্রিল)। শাহবাজ উদয়পুর এবং গোগুন্দা অধিকার করিয়া ছারখার করিলেন; কিন্তু মহারাণা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। শাহবাজ খাঁ কিছুদিন পরে ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া মেবার ত্যাগ করিলেন। এদিকে শাহবাজ খাঁর সৈন্য চলিয়া যাওয়া মাত্র প্রতাপ অধিকাংশ স্থান আবার অধিকার করিলেন। মন্ত্রী ভামা শাহ মালব লুট করিয়া ২০,০০০ মোহর ও ২৫ লক্ষ টাকা চুলিয়া গ্রামে মহারাণাকে নজর দিলেন। ইহার পর শিশোদিয়াগণ দিবের দুর্গ পুনর্বার অধিকার করিল। দিবের হইতে বিজয়ী শিশোদিয়া কুম্ভলমীর দুর্গ আক্রমণ করিলেন; দুর্গরক্ষী মোগল সৈন্যরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এ সময়ে আকবর সীমান্তবাসী ইউসুফজৈ পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তিনি খান্ খানান্ আবদুর রহিমকে মালব প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া সাম ও দান দ্বারা রাণাকে বশীভূত করিবার জন্য পাঠাইলেন। মহারাণার মন্ত্রী ভামা শাহকে তিনি অনেক প্রকার লোভ দেখাইলেন। কিন্তু প্রতাপের দুর্জয় পণ অটল রহিল।

১৫৭৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে শাহবাজ খাঁ দ্বিতীয় বার মেবার আক্রমণ করিলেন। শত্রুসৈন্যেরা যাহাতে মেবারের নিকটবর্তী স্থান হইতে রসদ সংগ্রহ করিতে না পারে সেজন্য মহারাণা আদেশ করিলেন পাহাড়ের তলভূমিতে কেহ কৃষি কিংবা পশুচারণ করিতে পারিবে না। কথিত আছে এ আদেশ অমান্য করার জন্য তিনি এক কৃষকের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। শাহবাজ খাঁ তিন চার মাস পর্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

১৫৮৪ খৃঃ সম্রাট আকবর জগন্নাথ কচ্ছবাহকে অনেক সৈন্যের সহিত মহারাণার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। দুই বৎসর প্রাণপণ চেষ্টার পর হতাশ হইয়া তিনিও মেবার ত্যাগ করিলেন (১৫৮৬ খৃঃ)।

মহারাণা এক বৎসরের মধ্যে (১৫৮৬ খৃঃ) চিতোর ও মাণ্ডলগড় ছাড়া সমস্ত মেবার হস্তগত করিলেন। ইহার পরে জীবনের শেষ এগার বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজস্থানের চারণ-কাহিনী, যথা—ভীলদের আশ্রয়ে পর্বতগুহায় বাস করিবার সময় ঘাসের রুটি খাইয়া মহারাণার জীবনধারণ, কন্যার জন্য রক্ষিত রুটি লইয়া

বনবিড়ালীর পলায়ন, ক্ষুধার্ত বালিকার হৃদয়ভেদী চীৎকার, প্রতাপের পণভঙ্গ এবং মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ; কবি পৃথ্বীরাজের কবিতাপাঠে প্রতাপের উদ্দীপনা ইত্যাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রথমতঃ, উত্তরে কুম্ভলমীর হইতে দক্ষিণে ঋষভদেব পর্যন্ত অনুমান নব্বই মাইল লম্বা, এবং পূর্বে দেবারী হইতে পশ্চিমে সিরোহী সীমান্ত পর্যন্ত সত্তর মাইল প্রস্থ পার্বত্য ভূমি কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রতাপের হস্তচ্যুত হয় নাই; এই স্থান সমতল না হইলেও সুজলা, সুফলা, এবং গরু মহিষ ইত্যাদিও এ অঞ্চলে প্রচুর। সুতরাং টড প্রতাপের যে ছবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন উহা নাটকীয় চরিত্রের প্রতাপ; ইতিহাসের প্রতাপসিংহ নহেন।

দ্বিতীয় কথা, পৃথ্বীরাজের কবিতা ইতিহাস নহে। পৃথ্বীরাজের কবিতার সহিত প্রতাপের পরিচয়, কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতার সহিত কামাল পাশার পরিচয়ের চেয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ ছিল। সমসাময়িক কবির সমাদর হিসাবে পৃথ্বীরাজের কবিতার মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু উহাতে ইতিহাস নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কবিতাকেই গদ্যে পরিবর্তিত করিয়া অনেকে ইতিহাস বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

টড সাহেব অন্যত্র লিখিয়াছেন, প্রতাপ শপথ করিয়াছিলেন যতদিন পর্যন্ত চিতোর উদ্ধার না হয়, ততদিন তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা সোনা ও রূপার থালায় ভোজন করিবেন না, ঘাসের বিছানায় শুইবেন, দাড়ি কামাইবেন না এবং নাকাড়া বাদ্য মেবার বাহিনীর সম্মুখে না বাজিয়া পিছনেই বাজিবে।

পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজী বলেন, এই সমস্ত শুধু মনগড়া কথা। উদয়পুরের মহারাণারা এখনও প্রাচীন প্রথা অনুসারে ভোজন করেন। ভোজন-স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া উহার উপর ধোলাই সাদা কাপড় বিছানো হয়। ইহার উপর ছয় কোণ কিংবা চার কোণা নয় ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু চৌকির উপরে পত্তল এবং পাতার উপরে থালা রাখা হয়। তিনি বলেন, ইহা প্রতাপের শপথ পালনের জন্য নহে; ইহাই প্রাচীন কাল হইতে ভোজনের রীতি। মহারাণাদের বিছানার নীচে ঘাস উদয়পুরে কেহ কখনও দেখে নাই, নাকাড়া বাদ্য প্রতাপের রাজা হইবার পূর্বে আকবর কর্তৃক চিতোর অধিকারের সময় হইতে শিশোদিয়া সৈন্যের পিছনে বাজাইবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। দাড়ি কামানোর কথা লইয়া মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্করজী অনেক গবেষণা করিয়াছেন। আজকাল রাজপুতদের মত গালপাট্টা ও দাড়ি রাখিবার ফ্যাশন সম্রাট ফরোখসিয়রের রাজত্বকাল* হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহার

* রাজপুতানেকা ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃ ৭৭২।

পূর্বে নয়। মহারাণা প্রতাপের প্রাচীন চিত্রে কোথায়ও দাড়ির নাম-নিশানা নাই।

অর্থাভাবে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব মনে করিয়া মহারাণা প্রতাপের মেবার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ও ঐ সময়ে ভামা শাহের নিজের সঞ্চিত অনেক টাকা মহারাণাকে দান করা ইত্যাদি কথা অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক বলিয়া গৌরীশঙ্করজী প্রমাণ করিয়াছেন। মেবার রাজ্যের গুপ্তধন অনেক স্থানে প্রোথিত ছিল। কথিত আছে, ভামা শাহ মরণের সময় তাঁহার স্ত্রীর হাতে একটা বহি দিয়া বলিয়াছিলেন, যেন তাঁহার দেহত্যাগের পর ওটা মহারাণার কাছে পৌছাইয়া দেওয়া হয়, উহাতে গুপ্তধনের সমস্ত বিবরণ লিখিত ছিল।

মহারাণা প্রতাপসিংহ উন্নতদেহ ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি আজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন অথচ কথিত আছে তাঁহার শরীরে কোন শস্ত্রচিহ্ন ছিল না। তিনি কোন যুদ্ধে বিশেষ রকম আহত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একদিন একটি বাঘ শিকার করিবার সময় তিনি খুব জোরে ধনু কষিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার তলপেট ও অন্ত্রে বিশেষ চোট পাইযাছিলেন। কিছুদিন রোগে কষ্ট পাইয়া বিঃ সঃ ১৬৫৩ মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে (১৯শে জানুযারী, ১৫৯৬ খৃঃ) মহারাণার দেহান্ত হয়। চাবণ্ড হইতে অনুমান দেড মাইল দূরে বণ্ডোলী গ্রামেব নিকট একটি ছোট নদীর (নালা) ধারে তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দিল্লীশ্বর আকবরের মেবার-জয়ের জন্য প্রবল আয়োজন, একাধিক অভিযান ও উহার নিষ্ফলতাই মহারাণা প্রতাপের কৃতকার্যতার মাপকাঠি। মহারাণার দুর্জয় সঙ্কল্পের সম্মুখে আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, মেবার-স্বাধীনতার অনির্বাণ প্রদীপ আরাবল্লীশিখরে জ্বলন্ত রাখিয়া প্রতাপ বীরব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গেলেন। মহারাণা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বে মেবারের নৈতিক প্রভাব সমস্ত রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতানার যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন পঁচিশ বৎসর ভারত সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষণ করাতে মেবারের সেই প্রনষ্ট অধিরাজত্ব রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু জাগরণ মোগল সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল উহার মূলে প্রতাপের মহান্ আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মেবারে মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কিনা সন্দেহ, রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাডবারে আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ড নীতি প্রতিহত হইত না।

বিকানীর-রাজ রায়সিংহের ছোট ভাই কবি পৃথ্বীরাজ মহারাণা প্রতাপ সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি মহারাণা প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে পত্রব্যবহারের ধরনে লিখিত। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা ভ্রম করেন সত্যই পৃথ্বীরাজের তেজপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রতাপের হৃদয়দৌর্বল্য দূর হইয়াছিল, এবং আকবরের কাছে অধীনতা স্বীকার সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করেন। এমন কি, গৌরীশঙ্করজীর মত ঐতিহাসিক ইহাকে ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রতাপের জীবনীর একস্থলে উচ্ছ্বাসবশতঃ পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন, "প্রতাপ বাদ্‌শাহী খেলাত পরিধানের কথা দূরে থাকুক তিনি আকবরকে বাদশাহও বলিতেন না, 'তুর্ক' বলিতেন।" ইহার প্রমাণ? প্রমাণ শুধু পৃথ্বীরাজের কাছে লিখিত মহারাণার রচিত পদ—

তুরক কাহাসী মুখ পতো, ইন তন সূঁ ইকলিংগ।

অর্থাৎ, ভগবান্ একলিঙ্গজী প্রতাপসিংহের মুখ দিয়া বাদ্‌শাহকে 'তুরক'ই বলাইবেন, বাস্তবিক এই চিঠিখানির কোন ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা রাজপুত কবি কর্তৃক মহারাণার সমসাময়িক প্রশংসা—হৃতগৌরব রাজপুত জাতির অন্তঃনিরুদ্ধ স্বাধীনতাস্পৃহার গৈরিকস্রাব। এই হিসাবে পৃথ্বীরাজের কবিতাগুলির একটি স্থায়ী মূল্য অবশ্যই আছে। নিম্নে আমরা কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিব—

১। আকবর সমদ অথাহ, তিহঁ ডুবা হিন্দু তুরক।
মেবাড়ো তিণ মাহঁ, পোয়ন ফুল প্রতাপসী॥

—আকবর রূপী অতল সমুদ্রে হিন্দু মুসলমান সবই ডুবিয়া গিয়াছে। শুধু মেবারপতি প্রতাপ-রূপী কমল ইহাতে ভাসিয়া আছেন।

২। অকবর ঘোর অঁধার ঊঁঘাণা হিন্দু অবর।
জাগৈ জগদাতার পোহরে রাণ প্রতাপসী॥

—আকবর রূপী ঘোর আঁধারে সমস্ত হিন্দু নিদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু রাণা প্রতাপ ধর্ম-ধন রক্ষার জন্য প্রহরীস্বরূপ জাগিয়া আছেন।

৩। চম্পা চিতোরাহ, পোরস তণো প্রতাপসী।
সৌরভ অকবর শাহ, অলিয়ল আভড়িয়া নহীঁ॥

—চিতোর চাঁপাফুল, প্রতাপ ইহার সুগন্ধ। আকবর-রূপী ভ্রমর চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কাছে যাইতে পারিতেছে না।

কথিত আছে, মহারাণা প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সম্রাট আকবর কিছুক্ষণ উদাস ও নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহাতে দরবারিরা হয়রাণ হওয়ায় মহারাণা প্রতাপের

তাই জগমলের চারণ কবি আঢা একটি ষট্পদী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। উহার সারাংশ এই,—

হে গুহিলোত রাণা প্রতাপসিংহ। তোমার মৃত্যুতে বাদশাহ দাঁতে জিভ কাটিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত চোখের জল ফেলিয়াছেন। কেননা তোমার ঘোড়া বাদশাহী মনসবের দাগে কলঙ্কিত হয় নাই, নিজের পাগড়ী কাহারও কাছে তুমি নত কর নাই।...শাহী ঝরোকার নীচে তুমি কোন দিন দাঁড়াও নাই।

বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপের যশোগানে আরাবল্লীর উপত্যকাভূমি আজও মুখরিত। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে চিরদিন ভক্তি-অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছে। যতদিন পৃথিবীতে বীরপূজা প্রচলিত থাকিবে ততদিন মহারাণা প্রতাপের কীর্তি ম্লান হইবে না, তাঁহার জীবনী প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা দান করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেবারে মহারাণা প্রতাপের কোন স্মৃতিমন্দির নাই। তাঁহার দেহ-ভস্মের উপর যে একটি ছোট ছত্রী নির্মিত হইয়াছিল, সংস্কারাভাবে উহাও জীর্ণশীর্ণ।

রাজা মানসিংহ

১

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাধিক বিক্রমাদিত্য ছিলেন; উজ্জয়িনীর রাজসভাও ছিল। রত্নগর্ভা ভারতজননী কালিদাস-বররুচি-বরাহ-মিহির প্রমুখ নব-রত্ন সত্যই প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু সিপ্রাতীরে মহাকালের ক্রোড়ে উক্ত নবরত্নের একত্র সমাবেশ ঐতিহাসিক সত্য নয়। উহা প্রাচীন ভারতের আদর্শ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি;—অপূর্ণ বাসনার কল্পনা-বিলাস। কিন্তু মধ্যযুগের মোগল-বিক্রমাদিত্য আকবরের দরবার-ই-নব-রতন ষোড়শ শতাব্দীর জাতীয়তা-দৃপ্ত প্রবুদ্ধ ভারতের জাগ্রত স্বপ্ন নয়,—অতি সত্য ইতিহাসের এক অপূর্ব অধ্যায়। তোডরমল-মানসিংহ, ফৈজী-আবুল ফজল, বীরবল-তানসেন, আব্দুর রহিম-আবুলফতে জীলানী ও চিত্রকর দসবন্ত শোভিত দরবার ই-নবরতনের স্মৃতি এখনও ফতেপুর সিক্রীর দিবান-ই-খাস হইতে মুছিয়া যায় নাই। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে মনে হয় আকবর বাদশাহ শকারি বিক্রমাদিত্য হইতে ব্যক্তিত্ব, রাজনীতি ও পরাক্রমে ছিলেন শ্রেষ্ঠতর; তাঁহার দরবার উজ্জয়িনীর রাজসভা হইতে মহীয়ান্ এবং সর্বাঙ্গ-সৌষ্ঠবপূর্ণ;—শৌর্য ও ললিতকলার অপূর্ব সমন্বয়। গুণগ্রাহী ভেদ-বুদ্ধিহীন মোগল সম্রাট রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মে নবযুগের প্রবর্তক মহাপুরুষ—ভারতের জাতীয়তার প্রতীক; তাঁহার দরবার সমসাময়িক ভারতের প্রতিচ্ছবি। রত্ন-আহরণে তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দুস্থান-ইরাণ ইতরবিশেষ করেন নাই। অবতার-বাদী হিন্দু মহামতি আকবর ও রাজা মানসিংহকে কলিযুগের অবসানে কৃষ্ণার্জুনের অবতার জ্ঞানে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে।

খণ্ডশঃ বিভক্ত, হিংসাদ্বেষজর্জরিত, পশুবল-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে সাম্য-মৈত্রীর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং নবমহাভারত সৃষ্টির সহায়কারীরূপে সেই অপ্রমেয় পুরুষ বিষ্ণুরূপী জল্লালদীন "জিষ্ণু" অর্জুনকে স্মরণ করিয়াছিলেন; পার্থ-সারথির আহ্বানে পার্থরূপী মানসিংহ আবির্ভূত হইলেন—ইহা সংস্কৃতকাব্য 'মানপ্রকাশ'-রচয়িতা কবি মুরারিদাস রায়ের অলীক স্তুতি নয়—সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী উদার হিন্দুসমাজের অন্তরের বাণীর ঐতিহাসিক প্রতিধ্বনি। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই মানুষ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ঐতিহাসিক চরিত্র বিচার করিয়া থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এক অংশ মানসিংহ এবং আকবরকে

স্বাধীনতার শত্রু, সমাজের ও ধর্মের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করিত—ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। রাঠোর রাজকুমার কবি পৃথ্বীরাজ দেখিয়াছিলেন আকবররূপী অতল সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই গ্রাস করিয়াছে—বাকী শুধু মহারাণা প্রতাপ। ভারতের পূর্বসীমান্তে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিব্রত এই বাঙ্গালা দেশেও আমরা ইহাঁর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। বৃদ্ধ পুত্রশোকাতুর কেদার রায় সিংহবিক্রান্ত মানসিংহের "সিংহ"ত্বের উপর ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন—কচ্ছবাহপতি যথার্থই "সিংহ" বটেন, তবে বাদশাহী চিড়িয়াখানাই তাঁহার উপযুক্ত স্থান—মানুষের মধ্যে পশুরাজের গণনা হয় না। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ভিনত্তি ভীমং করী-রাজকুম্ভং।
বিভর্তি বেগং পবনাতিরেক ॥
করোতি বাসং গিরিবরশৃঙ্গং।
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

অর্থাৎ ভীমকায় গজরাজের কুম্ভবিদীর্ণকারী, পবন অপেক্ষা দ্রুত দুর্বারগতি, উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ-বিহারী হইলেও সিংহ পশুব্যতীত অন্য কিছু নয়।

২

রাজপুতানার "খ্যাত" কিংবা চারণ-কবিতার ন্যায় বাঙ্গালা দেশের ঘটকগণ এক-শ্রেণীর অর্ধঐতিহাসিক, অর্ধসামাজিক ছন্দোবদ্ধ পুস্তিকা বা কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রদ্বীপ-কারিকা" হইতে প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ বিষয়ক কয়েকটি ছত্র* নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

প্রতাপাদিত্য মানসিংহকে বলিতেছেন—

অয়ে রাজেন্দ্র ধর্মজ্ঞ ইক্ষ্বাকু-কুলভূষণ ॥
কথং যবনদাসত্বং করোষি নৃপসত্তম ॥
... ...
যবনানাং বধার্থায় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃতা ॥
কথং বিঘ্নপ্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে ॥

[হে রঘুবংশতিলক ধর্মজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি কারণে যবন (মোগল) দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন? আমি যবন সংহারের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ। এই কার্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য বঙ্গদেশে আপনি কি হেতু পদার্পণ করিয়াছেন?]

* ৺নিখিলনাথ রায়-কৃত 'প্রতাপাদিত্য', পৃঃ ৩৩৯-৩৪০

অত্যন্ত লজ্জাযুক্ত হইয়া মানসিংহ বঙ্গেশ্বরকে বলিলেন—

কথং দূষয়সে প্রাজ্ঞ কলিং কিং ত্বং ন পশ্যসি॥
আগমত্যাম মযা সার্দ্ধং দিল্লীশস্য চ সন্নিধিং।
সর্বদোষাদ্বিনির্মুক্তশ্চক্রোপালো ভবিষ্যসি।

[হে ধীমান! আমার প্রতি কেন দোষারোপ করিতেছেন? কলিকাল আপনি কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? আমার সহিত দিল্লীশ্বরের নিকট আগমন করুন। সর্বদোষ বিনির্মুক্ত হইয়া আপনি চক্রপাল পদ লাভ করিবেন।]

কেদার রায় মানসিংহের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সুতরাং তথা-লিখিত সতেজ সংস্কৃত পত্র ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য না হইলেও উহাতে বঙ্গবীরের অন্তরের বাণীর সত্যকার প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কখনও মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করেন নাই; বরং মোগলের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। এই কারিকার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইহাতে মানসিংহ **জয়পুরাধীশঃ** বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; অথচ বর্তমান জয়পুর স্থাপিত হইয়াছিল মানসিংহের মৃত্যুর প্রায় ১২০ বৎসর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে। এই কারিকা রচয়িতার মুসলমানবিদ্বেষ পলাশী পরবর্তী যুগের এক শ্রেণীর হিন্দু-লেখকগণের এক প্রকার সংকীর্ণ স্বজাতিপ্রবণতা—দেশপ্রেমের নিন্দনীয় বিকৃতি। বারভূঁইঞা আমলের বাঙ্গালী পরস্পরকে কোনদিন হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে আধুনিক পাইকারী মাপে অবিশ্বাস করিত না, ধর্মান্ধতা তাহাদের রাজ-নীতিকে সে-যুগে বিপথগামী করে নাই। উভয় সমাজের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতে ব্যক্তিগত শত্রুতা যেমন ছিল মিত্রতাও কম ছিল না; মুসলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সৈন্যদল হিন্দু ভূঁইয়াগণের প্রধান ভরসাস্থল ছিল; প্রমাণ, ভুলুয়ার ভূঁইয়া অনন্তমাণিক্যের উজীর ইয়ুসুপ খাঁ বারলাস, প্রতাপাদিত্যের অতিবিশ্বস্ত সুচতুর সেনাপতি "কমল খোজা" [খাজা কামালউদ্দীন] এবং সুমন্ত্র (Envoy) শেখ বদী। ভারতবর্ষে ষোড়শ শতাব্দীর মোগল-পাঠান সংঘর্ষ একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল—একথা ঐতিহাসিক সত্য এবং বাঙ্গালার স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান ভূম্যধিকারীমণ্ডল মানসিংহ ইসলাম খাঁ প্রভৃতিকে দিল্লীশ্বরের পোষমানা সিংহ বলিয়া হয়ত ঘৃণা করিত; সুন্দরবনের ব্যাঘ্ররাজ কোনদিন সার্কাসের সিংহকে পশুরাজ মনে করিতে পারে না।

বাঙ্গালার বারভূঁইয়ার এই ঘৃণাদৃপ্ত মনোভাব এদেশের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ও কবিগণ বাঙ্গালার

নবপ্রসূত জাতীয়তা অভিমানে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহিত্য ও ইতিহাসে নূতন রূপ দিয়াছেন। যিনি ইহার প্রতিবাদ করিবেন বাঙ্গালী আবালবৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান তাহাকে দেশদ্রোহী বাঙ্গালীকুলকলঙ্ক বলিয়াই গালাগালি করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী যতই মনোরম এবং জনপ্রিয় হউক না কেন, বাঙ্গালার সুবাদার হিসাবে রাজা মানসিংহকে উহার দ্বারা বিচার করিলে শাশ্বত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটিবে। দেশ, ধর্ম ও কুলাভিমান নিরপেক্ষ হইয়া ইতিহাস বিচার না করিলে সত্যের সন্ধান কখনও মিলিবে না। যে ইতিহাস দেশ, ধর্ম ও জাতি-প্রেমের প্রেরণায় লিখিত হয় প্রচার-পুস্তিকা হিসাবে উহার মূল্য থাকিতে পারে, কোন সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজন উহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু উহার স্থায়ী মূল্য নাই। অখণ্ড ভারতে এক বিরাট ভারতসমাজ এবং একই ভারতীয় সংস্কৃতি-সৃষ্টির প্রেরণা যিনি সর্বপ্রথম পাইয়াছিলেন, যাঁহারা এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ আকবর ও মানসিংহ প্রমুখ নবরত্নকে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করাই একমাত্র সুবিচার এবং উহাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস।

৩

রাজা মানসিংহের সুবাদারী আমলের (১৫৯৪ ১৬০৬ ইং)* ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। সুতরাং ইহার প্রমাণপঞ্জী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ইতিহাস-রসিকগণের নিকট নিবেদন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বাঙ্গালাদেশে মানসিংহ সম্বন্ধে সমসাময়িক কিংবা পরবর্তী শতাব্দীদ্বয়ের মধ্যে কোন বাঙ্গালী হিন্দু কিংবা মুসলমান উল্লেখযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

বর্তমান যুগের দ্রোণাচার্যপ্রতিম স্যর্ যদুনাথ জয়পুর-দরবারের পুরাতন দপ্তরখানা খুঁজিয়া মানসিংহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন। Baharistan-i-Ghaibi-প্রণেতা মীর্জা নথনের মত কোন ঐতিহাসিক মানসিংহের আমলে বাদশাহী ফৌজের সহিত এদেশে আসিয়া থাকিলেও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালার সহিত দিল্লীর সম্ভাব না থাকিলেও বাঙ্গালীকে নিজের কথা পরের মুখে, আবুল ফজল

* 39th year of Akbar's reign. *Akbarnama* iii 999. *Viceroyalty* of Bihar 1587. *Ibid.* p .891

নিজামুদ্দীন বদায়ুনীর নিকট হইতে শুনিতে হইবে। উক্ত ঐতিহাসিকগণের কথা খণ্ডন করিতে পারে এরূপ সমসাময়িক দলিলপত্র কিংবা মুদ্রার পাল্টা সাক্ষ্য বাঙ্গালী যত দিন উপস্থিত করিতে পারিবে না তত দিন ইতিহাসের একতরফা ডিক্রী আমাদের বিরুদ্ধে বলবৎ থাকিবে। আবুল ফজল যাহা লিখিয়াছেন উহা ব্যতীত সব কিছুই অপ্রামাণ্য এ মনোভাব কিন্তু ধৃষ্টতা—নিছক গোঁড়ামী। আমাদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে কোন কারণে আবুল ফজলের শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল।* ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং ১৬০২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবনান্ত হয়। 'আকবরনামার' শেষ অংশ ইনায়ৎউল্লা কিংবা অপর কাহারও দ্বারা সরকারী দলিল অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও আকবর-রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; ঐতিহাসিকের দৃষ্টি বাঙ্গালা হইতে দাক্ষিণাত্যের উপরই অধিক নিবদ্ধ; বাঙ্গালার বিবরণ স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং অশুদ্ধ।

'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' আবিষ্কারের পূর্বে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ ছিল মানসিংহের সুবাদারী আমলের ইতিহাস-জ্ঞানও বর্তমানে তদ্রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাহারিস্তান গ্রন্থে মানসিংহ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। আম্বের রাজগণ মির্জা-'রাজা' নামে ইতিহাসে পরিচিত। রাজা মানসিংহই যে প্রথমে মির্জা-রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ আকবরনামায় নাই; সর্বপ্রথম উল্লেখ বাহারিস্তানেই পাওয়া যায়। আকবরের নবরত্নের মধ্যে কুমার মানসিংহ ও বৈরাম খাঁর পুত্র আব্দুর রহিম ছিলেন আকবরের বিশেষ স্নেহের পাত্র। সম্রাট তাঁহাদিগকে 'ফরজন্দ' বা পুত্র উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ছিলেন যুদ্ধ এবং রাজনীতি শাস্ত্রে আকবরের মন্ত্রশিষ্য—সে-যুগের কর্ণার্জুন। আকবর-চরিত্রের সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন এই মন্ত্রশিষ্যদ্বয়—শাহজাদা সলিম, মুরাদ দানিয়াল নহে; 'মান-প্রকাশ' রচয়িতা লিখিয়াছেন—

মানেন সিংহো ভবিতেতি নূনং।
আবেক্ষ্য ক্ষৌণিপতিঃ কৃতজ্ঞঃ।
নাম্না রিপুব্রতে ভয়ঙ্করেণ
শ্রীমানসিংহং তনয়ং চকার।

---

* *Akbarnama* p. 1119.

রাজপুতের শৌর্য ও স্বামীধর্ম মোগলের উদারতা ও কূটনীতি এবং মুসলমানদের কার্যদক্ষতা ও 'আখ্‌লাখ্‌' বা সুমার্জিত সামাজিকতার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ মানসিংহ চরিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার মীর্জা রাজা উপাধি সার্থক করিয়াছিল।

মাসির-উল-উমারায় লিখিত আছে আচারনিষ্ঠ হইয়াও তিনি সহকর্মী মুসলমান আমীরগণের ভোজনের সময় উপস্থিত থাকিতেন। পারিবারিক কিংবা সামাজিক মোগলাই দস্তারখান্ (Dining-sheet) মাদ্রাজী কিংবা কনৌজিয়ার চৌকা নহে। ইহা ভব্যতা, শিষ্টাচার এবং সরস আলাপ-চাতুর্যের শিক্ষাকেন্দ্র—কোপ্তা কাবাব উহার উপলক্ষ মাত্র। এক দিন মানসিংহ বলিয়াছিলেন আমি মুসলমান হইলে প্রত্যেক দিন আপনাদের সঙ্গে অন্ততঃ একবার খানা খাইতাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও মাসির-উল-উমারায মানসিংহ জীবনী উপেক্ষণীয় নহে।

৪

আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মানসিংহ লেখাপড়া হয়ত আকবর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী জানিতেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা ও পণ্ডিতপোষণে মুক্তহস্ততা আকবরশাহী পরিমাপেই ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত **ভক্তিবিলাস** এবং জগন্নাথকৃত **মানসিংহকীর্তিমুক্তাবলী** কাব্যে (Aufrecht, II 104) মানসিংহের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। কচ্ছবাহ পতি মানসিংহের কাব্যানুরক্তির পরিচয় হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস 'মিশ্রবন্ধু-বিনোদ' প্রণেতা লিখিয়াছেন—মানসিংহ স্বয়ং কবি এবং কবিগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। মানচরিত্র নামক একখানা হিন্দীকাব্য ১৬১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকর্তা স্বয়ং মহারাজা মানসিংহ, আসলে তাঁহার আশ্রিত কবিগণ উক্ত জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে বয়স ৬০ বৎসরের কিছু কম হইলেও ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কুচ্‌বিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা যায় মানচরিত্র প্রবাসী হিন্দী কবিগণ কর্তৃক বাঙ্গালা দেশেই রচিত হইয়াছিল।

অন্যের দ্বারা বই লিখাইয়া নিজের নাম জাহির করা রাজারাজড়াদের একটা বাতিক মোগল যুগে ছিল—এ যুগেও আছে বলিয়া শুনা যায়; বৈরাম খাঁ নগদ প্রায় সাড়ে নয় হাজার টাকা দিয়া নিজের নামে প্রচার করিবার জন্য একখানা ফার্সি,

কবিতা বা মসনবী কিনিয়াছিলেন। দান-সাগর প্রণেতা মহারাজ বল্লাল সেনের ন্যায় রাজা মানসিংহও এদেশে ঐ কার্যই করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে একখানি সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি ১৭৩৮ শকাব্দে শ্রীহট্টের দিনারপুর পরগণায় নকল করা হইয়াছিল। পুঁথির নাম **'তুলাপুরুষ দান প্রমাণ'** বা **'তুলাপুরুষ পদ্ধতি'**। আরম্ভে লিখিত আছে—

প্রণম্য গোবিন্দ পদারবিন্দ,
নত্বা গুরুংশ্চৈব
বিচার্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি দানসাগব সংস্থিতান।
ক্রীয়তে মানসিংহেন
তুলাপুরুষ পদ্ধতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগে একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে নাম 'সভারঞ্জন পুঁথি' (১১ নং) বিষয়বস্তু কয়েকটি গল্প যাহা এ যুগে মনে মনে পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়; ভাষা ভারতচন্দ্রের সময়কালীন কিংবা পূর্ববর্তীও হইতে পারে; রচনার কোন তারিখ নাই, রচয়িতা দ্বিজমোহন, গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে :—

সংগ্রাম সিংহেব পুত্র মানসিংহ বাজা।
পবম ধার্ম্মিক বায় সুখী সব প্রজা।
খাজনা দুকরা নাই ভুম যত খায
নৃপাতব চাইলে ধন————
প্রতাপে শশক শিবা কবী পৃষ্ঠে ধায।
মৃগশিশু বাঘিনীব কোলে ঘুম যায॥
দিবাভাগে বাজকার্য্য কবে প্রজা সঙ্গ।
খেলোযাতে বসি বাত্রে শুনেন প্রসঙ্গ
--————রাজা বড বসিক সুজন
কাব্য শাস্ত্রে থাকে বাজা সতত মগন॥
পাঠক লিখিত আছে পুবাণ পঠিতে।
নকলী চাকব আছে গল্প শুনাইতে॥

দ্বিজমোহন রাজা মানসিংহের বাপের নাম ভুল করিয়াছেন—আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। মানসিংহের প্রতাপ ও জবরদস্ত শাসন কবির অত্যুক্তি নহে। বাঙ্গালা বিহারে বদলী হইবার পূর্বে কুমার মানসিংহ আলাহাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই অদম্য কাবুলীগণকে তিনি হরিসিংহ নালুয়ার মত ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়াইয়াছিলেন। আকবর পাঠানগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার

ব্রহ্মাস্ত্র সংবরণ করিলেন এবং প্রয়োজন বোধে সেই ব্রহ্মাস্ত্রই দুর্ধর্ষ ভোজপুরিয়া, উড়িষ্যার কতলু লোহানী, এবং বাঙ্গালার বারভূঁইয়ার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সভারঞ্জন পুঁথির গল্পগুলি যদি সত্যিই মানসিংহ হজম করিয়া থাকেন তবে আমরা তাঁহার সুরুচির প্রশংসা করিতে পারি না। আকবরী দরবারের রাজা বীরবল ও মোল্লা দোপেয়াজা বাঙ্গালা দেশে ছিল না—এ দেশে গোপালভাঁড়ই জন্মিয়াছে। মানসিংহ বোধ হয় ঐ রকম কয়েকটা "নকলী চাকর" যোগাড় করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেন।

রাজা মানসিংহের আমলে কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। এক দিকে কবির দুর্দশা, ঐ সময়ের কুশাসন ও অত্যাচারের বিভীষিকার ছায়া; অন্য দিকে মোহন কবি বর্ণিত রামরাজ্য—এই আলোছায়ার মধ্যে কোন্‌টা ঐতিহাসিক সত্য? ঐতিহাসিক কোনটিই অবিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ জগতের সর্বত্রই আলোছায়ার খেলা। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের মানসিংহ খণ্ডের ঐতিহাসিক সমালোচনা স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

৫

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বাঙ্গালার সুবাদার উজীর খাঁ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বলোকে গমন করিলেন। পূর্বাপর প্রথা অনুসারে বিহারের সুবাদার সৈদ খাঁ বাঙ্গালায় এবং কুমার মানসিংহ পেশাওয়ার হইতে বিহারে বদলি হওয়ার হুকুম পাইলেন। কুমার মানসিংহ জামরুদের থানা হইতে লাহোরে আসিয়া ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখে বিহার যাত্রা করিলেন। সৈদ খাঁ চাঘ্‌তাই শাহজাদা সেলিমের অন্যতম শ্বশুর, খান্‌দানী আমীর—তাঁহার বাপ-দাদা বাবর-হুমায়ুনের সময় হিন্দুস্থান জয় করিয়াছে। মানসিংহ শাহজাদার শ্যালক, আকবরশাহী তূণের শব্দভেদী বাণ। পূর্ববর্তী বাঙ্গালা-বিহারের সুবাদার যুগলের রেষারেষির ফলে কার্য পণ্ড হওয়াতে আকবর তাঁহার নিকট-আত্মীয়দ্বয়কে পূর্ব-ভারতে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সৈদ খাঁ রাজধানী টাণ্ডায় পদার্পণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন বিহারের সুবাদারীই তাঁহার পক্ষে ছিল ভাল—নূতন উপাধির আনুষঙ্গিক ব্যাধি ম্যালেরিয়া, উদরাময়, দাদ-বিখাউজ এবং অষ্টপ্রহর ভয় ও দুশ্চিন্তা। ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) এবং কুচবিহারকে কেন্দ্র করিয়া হতাবশিষ্ট বিদ্রোহী মোগল মন্‌সবদারগণ তখনও

বরেন্দ্রভূমিতে অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছিল। ইসা খাঁর হস্তে শাহবাজ খাঁর বিষম পরাজয়ের ফলে পূর্ববঙ্গে মোগলের বিজয়লক্ষ্মী ছায়ায় পরিণত, উড়িষ্যার কতলু খাঁর প্রতাপে সুবে বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখার তীর হইতে বর্ধমানে আসিয়া ঠেকিয়াছে। সৈদ খাঁ কোন রকমে জোড়াতালি দিয়া বিহারে টিকিয়া ছিলেন মাত্র। মানসিংহ আসিয়া দেখিলেন বিহারেও বহ্নি ধূমায়মান। গিধৌরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের জমিদার পূরণমল, পাটনা হাজিপুর অঞ্চলের পরাক্রান্ত রাজা সংগ্রাম এবং সাহাবাদ জেলার দুর্ধর্ষ চেরো জাতির নেতা অনন্ত চেরো—সকলেই বিদ্রোহী। দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রয়োজন মত দণ্ড এবং সাম-নীতি প্রয়োগ করিয়া কুমার মানসিংহ দক্ষিণ-বিহারে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আকবরশাহী নীতি অবলম্বন করিয়া মানসিংহ পূরণমলের কন্যার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভাণের বিবাহ দিলেন এবং গিধৌর প্রভৃতি বিজিত দুর্গ পূরণমলকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বিদ্রোহীগণের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে স্ব-স্ব স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয় করাই ছিল মানসিংহের শাসন-নীতি। মানসিংহ যখন অনন্ত চেরোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন সুলতান কুলী প্রভৃতি বাঙ্গালার বিদ্রোহীগণ সরকার তাজপুর এবং পূর্ণিয়া লুটপাট করিয়া উত্তর-বিহারের প্রধান মোগল থানা দ্বারবঙ্গের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। মোগল থানাদার ফাররুখ খাঁ বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বিদ্রোহীরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হাজিপুরে হানা দিল। এই সময়ে মানসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহ ছিলেন বিহার-শরীফের ফৌজদার। কিশোর বালক জায়গীরদারী ফৌজ সংগ্রহ করিয়া অসীম সাহসে বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এবং লুটের মাল কাড়িয়া লইয়া কুমার বিজয়গৌরবে বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত ৫৮টি হস্তী এবং লুটের মূল্যবান সামগ্রীসমূহ শাহী দরবারে সম্রাটের দৃষ্টি-প্রসাদ লাভ করিল।

৬

আকবর-রাজত্বের পঞ্চত্রিংশ বৎসরে, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মানসিংহ সুবে বিহারের ফৌজ লইয়া ঝাড়খণ্ড বা বর্তমান ছোটনাগপুরের পথে উড়িষ্যার অধিপতি অদম্য কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ভাগলপুর হইতে সাঁওতাল

পরগণা এবং বীরভূমের মধ্য দিয়া এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন। বর্ষা আসন্নপ্রায় এই অজুহাতে বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁ এই অভিযান স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন, তবে কয়েকজন বাদশাহী মনসবদার—পাহাড় খাঁ, বাবুই মানকালী, রায় পিতরদাস—সুবে বাঙ্গালা হইতে তোপখানা লইয়া মানসিংহের সহিত জাহানাবাদে যোগদান করিলেন। জাহানাবাদ বা বর্তমান হুগলী জেলার আরামবাগ বর্ধমানের দক্ষিণ ও হুগলীর পশ্চিম সীমান্তে ধলকিশোর নদীর পূর্ব তীর সেকালে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মেদিনীপুরের রাস্তা ধরিয়া মোগলবাহিনীর দক্ষিণমুখী অভিযান বিফল করিবার উদ্দেশ্যে কতলু খাঁ জাহানাবাদের ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণে ধারপুর* নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং বাহাদুর কুরোহ্† (গোড়িয়া?) নামক একজন ধূর্ত সেনানায়কের অধীনে একদল পাঠান সৈন্য রায়পুরের দিকে প্রেরণ করিলেন। সেকালে কসবা রায়পুর সরকার জলেশ্বরের একটি প্রধান স্থান ছিল; এখানে একটি মজবুত কেল্লাও ছিল। মেদিনীপুর পশ্চাতে রাখিয়া কতলু খাঁ বোধ হয় রূপনারায়ণের তীর হইতে শালবনী-রায়পুর পর্যন্ত সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর এই সময় কতলু খাঁর পক্ষ ত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। পাঠান ব্যূহের বামপার্শ্ব আক্রমণ এবং বিষ্ণুপুর রক্ষা করিবার জন্য মানসিংহ কুমার জগৎসিংহকে জাহানাবাদ হইতে সিলাই নদীর উত্তর তীর ধরিয়া পশ্চিমমুখী অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। ফাঁকা ময়দানের লড়াইয়ে বাহাদুর হইলেও অপরিচিত বনজঙ্গলে পাঠান সৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া জগৎসিংহ বেকায়দায় পড়িলেন। এই ঘটনার আবুল ফজল বর্ণিত অস্পষ্ট বর্ণনার মধ্যে মনোরম ঐতিহাসিক উপন্যাসের গুঞ্জাইস ছিল; বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী এই উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

কতলু খাঁর সেনাপতি বাহাদুর (গোড়িয়া?) মায়ামৃগের মত জগৎ সিংহকে

* *Akbarnama* ii, p. 879. রেনেলের ম্যাপে কিংবা আইন ই-আকবরীতে ধারপুর নামক কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় না। জাহানাবাদের দক্ষিণে যেখানে ধলকিশোর অন্য একটি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নদ সৃষ্টি করিয়াছে, ঐখানে ধামগিরি (?) নামক একটি স্থান রেনেলের ম্যাপে দেখা যায়। আবুল ফজল বর্ণিত ধারপুর বোধ হয় উহার কাছাকাছি কোন স্থান।

† "কুরোহ" শব্দের কোন মানে হয় না। মূল ফার্সিতেও অনেক সময় গাফ্ অক্ষরের স্থানে **'কাফ-ই-আরবী'** পাঠ করা হয়। শব্দটি Guroh বা গোড়িয়া বলিয়া অনুমান হয়। বাহাদুর নামজাদা পাঠান সর্দার; সম্ভবতঃ গৌড়ে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন। লোহানীরা বিহারের পাঠান।

অতিমাত্র ব্যাতিব্যস্ত করিয়া অবশেষে একটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খেঁকশিয়াল জালে পড়িয়াছে ভাবিয়া জগৎসিংহ আরাম-আয়াসে গা ঢালিয়া দিলেন। সাহসী এবং সুচতুর যোদ্ধা হইলেও কুমার অমিতাচারী এবং অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন,—পৈত্রিক আফিমের নেশাটা ছিল শরাবের উপরই ফাউ। রাজপুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া বাহাদুর কতলু খাঁকে লিখিলেন—শিকার বেহুঁসিয়ার হইয়াছে, আরও কিছু সাহায্য আবশ্যক। কতলু তাঁহার বিশ্বস্ত এবং স্থিরবুদ্ধি উজীর মির্ঞা ইসা এবং পাঠান শার্দ্দূল উমর খাঁর অধীনে অপর একটি সৈন্যদল বাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন—মানসিংহ বা জগৎসিংহ কেহই দুষমনের নূতন চাল কিছুমাত্র টের পাইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজা হামীর জগৎসিংহকে সাবধান করিয়াছিলেন। কুমার ধীরেসুস্থে* টহলদার সিপাহী পাঠাইয়া খবর লইলেন পাঠানেরা তখনও বহু দূরে ডেরা গাড়িয়া বসিয়া আছে; তিনি খোশ্‌মেজাজে শরাবের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। এদিকে নবাগত পাঠানসেনা তাহাদের তাঁবু ইত্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া জঙ্গলের রাস্তায় অতি সংগোপনে কুচ করিয়া খুব সম্ভব শেষ রাত্রে নিঃশব্দে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে যুগপৎ রাজপুত শিবিরে হানা দিল। জগৎসিংহ তখন নেশাজনিত গভীর নিদ্রায় অচেতন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁকা রাঠোর, মহেশদাস, নারু চারণ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বাদশাহী ফৌজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং ধ্বংসপ্রায় হইল (২১ মে, ১৫৯০)†। জাহানাবাদে খবর পৌঁছিল কুমার জগৎসিংহ মারা গিয়াছেন। মানসিংহ তাঁহার সহকারী সেনানীগণকে মন্ত্রণাকক্ষে আহ্বান করিয়া এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মে মাস প্রায় শেষ হইয়াছে। বর্ষার বিলম্ব নাই; তদুপরি এই শোচনীয় পরাজয়। অধিকাংশ সেনানায়কেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সোজা রায় দিলেন, সিপাহীদের পরিবার আছে সেলিমাবাদে- সেখানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করাই নিরাপদ। সেলিমাবাদ জাহানাবাদ হইতে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বর্ধমান হইতে পনের-কুড়ি মাইল দক্ষিণ পূর্বে সরকার সাতগাঁর মধ্যে অবস্থিত ও দামোদর নদী

* বাঙ্গালায় চলিত "ধীরে সুস্থে" পদ শুদ্ধ নয়। কারণ "সুস্থ' (healthy) "ধীরে"র সঙ্গে জুড়িয়া দিলে কোন মানে হয় না। আসলে মূল ফার্সি *Sust* (Lazy) *Susti* (Laziness) হইতে "সুস্থ" বাংলা ভাষায় অশুদ্ধ আকারে গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান শুদ্ধির যুগে "ধীরে সুস্তে" সংস্কার আবশ্যক।

† V. S. Bendry কৃত *Tarikh-I-Ilahi*, published by G. B. Nara, Poona, পুস্তক অবলম্বনে ১০ই খুরদাদ, ইলাহী সন ৩৫=২১শে, মে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ।

দ্বারা সুরক্ষিত। মানসিংহ পাঠানের চরিত্র ভালরকম জানিতেন ; বর্ষার দুর্যোগই পাঠানের পক্ষে সুযোগ ; নেকড়ে বাঘের পাল হইতে পলাইয়া যেমন কেহ কখনও বাঁচে না, তেমনি পাঠানের হাত হইতে পলাইয়া সেলিমাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বাদশাহী ফৌজ হয়ত রক্ষা পাইবে না। তিনি মনসবদারগণকে আশ্বস্ত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। আকবর বাদশাহ ছিলেন অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ; জয়পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে তাঁহার একাধিক শত্রু অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ কতলু খাঁ জগৎসিংহের পরাজয়ের দশ দিন পরেই রোগে ভুগিয়া পরলোকগমন করিলেন—বঙ্কিম-কল্পিত বিমলার বেণীমধ্যে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকাঘাতে নহে। ইতিমধ্যে আরও সুসংবাদ পৌঁছিল কুমার জগৎসিংহ রাজা হাম্বীরের চেষ্টায় রক্ষা পাইয়া বিষ্ণুপুরে নিরাপদে আছেন। ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও জগৎসিংহের মত বীরের পক্ষে ঐখান একটি "তিলোত্তমা" লাভ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। অবশেষে মানসিংহের অসামান্য সাহস এবং দৃঢ়তাই জয়ী হইল। আগস্ট মাসে (১৫৯০ খ্রীঃ) কতলু খাঁর পুত্র উড়িষ্যার মসনদের মালিক নাসির খাঁকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ উজীর মিঞা ইসা মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহী পেশকশ-স্বরূপ ১৫০টি হস্তী এবং বহু মূল্যবান সামগ্রী ভেট দিলেন। উভয় পক্ষই সন্ধির জন্য সমান উদ্‌গ্রীব, কারণ পাঠান শিবিরে আত্মকলহ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, এবং অপর পক্ষে মানসিংহের মাথার উপর মুষলধার বাঙ্গালার বর্ষা, উপরন্তু সুবাদার সৈদ খাঁর এই অভিযানে অনিচ্ছা এবং উদাসীনতার জন্য ক্ষোভ। সন্ধির শর্তানুসারে উড়িষ্যায় আকবরশাহী সিক্কা এবং খোত্‌বা পাঠ জারী হইল এবং পুরী জেলা জগন্নাথের মন্দির সমেত দেওয়ান ই-খালসার অধীন, অর্থাৎ বাদশার খাসদখলী স্বত্বে পাঠানেরা ছাড়িয়া দিল। যে সমস্ত জমিদার সম্রাটের প্রতি নিমক-হালালী করিয়াছে,—যথা বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর—পাঠানেরা তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিবে না—ইহাও ছিল সন্ধির অন্যতম শর্ত।

৭

জাহানাবাদের সন্ধির পর মানসিংহ বিহারে ফিরিয়া আসিলেন। এই সন্ধি সম্রাটের মনঃপূত হয় নাই। পাঠানেরা মনে করিল যুদ্ধে জিতিয়াও তাহারা মানসিংহের ধাপ্পাবাজীতে বেকুব বনিয়াছে। মোগল-পাঠানের সন্ধি পদ্মপত্রে জল—কেবল গড়াইয়া পড়িবার ফিকিরেই থাকে। কতলু খাঁর উজীর মিঞা ইসা

এক বৎসরের মধ্যেই প্রভুর অনুগমন করিলেন ; উড়িষ্যার পাঠানদিগের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য এবং ঘরোয়া বিবাদ দেখা দিল। শান্তির সময়ে পাঠানেরা প্রায়ই আত্মকলহপরায়ণ ; ভাই-ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া চরমে উপস্থিত হইলে তাহারা পিতৃব্যপুত্রের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া ভ্রাতৃবিরোধের অবসান ঘটাইয়া থাকে। কতলু খাঁর পুত্রের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান এবং অন্যান্যদের সদ্ভাব ছিল না। যোগ্যতা অনুসারে উড়িষ্যার মসনদ প্রাপ্য ছিল ওসমানের। যাহা হউক পাঠানেরা স্থির করিল, নিজেদের মধ্যে গলা কাটাকাটি অপেক্ষা মোগল রাজ্য আক্রমণ করাই লাভজনক। বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর কুমার জগৎসিংহকে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল—পাঠান সে কথা ভুলিতে পারে নাই। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাবসানে পাঠানেরা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিল।

আকবরের মন্ত্রশিষ্য, অনাগতবিধাতা মানসিংহ এইরূপ পরিস্থিতির জন্য আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিহারের মনসবদারী ফৌজ পূর্ব হইতেই তৈনাৎ ছিল ; অধিকন্তু পূরণমল গিধোরিয়া* রাজা সংগ্রাম, অক্কর (অক্রূর ?) পঞ্চানন প্রভৃতি হিন্দু সামন্ত রাজগণ এবং উত্তর-বিহারের বাদশাহী মনসবদারগণ মানসিংহের আমন্ত্রণে সসৈন্যে উপস্থিত হইল। বিগত অভিযানে বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁর আচরণ দিল্লীশ্বরের অজ্ঞাত ছিল না।

দিল্লীর বাদলগড় দুর্গে মহাসমারোহে তাঁহার সৌর জন্মদিবস (১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর—*Akbarnama* III 916) উপলক্ষে দ্বাদশ তুলাপুরুষ মহাদান সমাপ্ত করিয়া সম্রাট্ মীর শরিফ † আমুলী নামক তাঁহার বিশ্বস্ত মুরীদকে সুবে বাঙ্গালা-

* Puran Mal Kaidhurih (*Akbarnama* III 934)— বেভারিজ সাহেব গিধোরিয়াকে কৈধুরী পাঠ করিয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছেন, নাম সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ অনবধানতার উদাহরণ 'আকবরনামা'র অনুবাদে পাওয়া যায়।

† মীর শরীফ আমুলী পারস্যের অন্তর্গত আমুল নামক শহরের অধিবাসী। তিনি পূর্বে "শিয়া" ছিলেন, পরে সম্রাটের নিকট দীন-ই-ইলাহী ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। ফতেপুর সিক্রির এবাদৎ-খানার ধর্ম-বিষয়ক বিতর্ক-সভায় দার্শনিকের ভূমিকায় দাবিস্তান-উল-মুজাহেব গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অতি বিদ্বান্, সুনিপুণ তার্কিক, এবং সেই জন্যই মোল্লা সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল ছিলেন। তাঁহার প্রতি বদায়ূনীর তীব্র শ্লেষ Mr. Lowe সুন্দর ভাবে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন :

"There is a heretic Sharif by name,
Who talks big though of doubtful fame."

বিহারে যাইবার হুকুম দিলেন। আসন্ন উড়িষ্যা অভিযানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে তাহাকে প্রেরণ করার প্রয়োজন সম্রাট্ পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাদশাহী কৌমকী (auxiliary) ফৌজ মানসিংহের সাহায্যার্থে কাশ্মীরের সামন্তরাজ ইয়ুসুফ খাঁর অধীনে পূর্বেই যাত্রা করিয়াছিল। সাহায্যকারী মনসবদারগণের অধীন সৈন্যদিগের তদারক করিবার জন্য সম্মিলিত বিহার বঙ্গবাহিনীর বক্শীপদে (Paymaster General) উক্ত তারিখে নিযুক্ত হইলেন মীর শরীফ সরমদী। সম্রাট তাঁহার প্রিয় শিষ্য আমুলীকে একেবারে চতুর্মুখ বানাইয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়াছিলেন। শরীফ আমুলীকে একসঙ্গে চারিটি পদাধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল।* যথা (১) খলিফা, (২) আমিন, (৩) সদর, (৪) কাজী। আকবর বাদশাহ নিজেকে পয়গম্বর মনে না করিলেও দীন-ই-ইলাহী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হিসাবে খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার অধিকার তাঁহার ছিল (এখনও এদেশের নামজাদা পীরসমূহ এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু এক এক প্রদেশের জন্য খলিফা নিযুক্ত করিয়া থাকেন)। বাঙ্গালা-বিহারে আমীরদের মধ্যে যাঁহারা বাদশাহের মুরীদ ছিলেন তাঁহাদের ধর্ম-উপদেষ্টা হিসাবে বোধ হয় শরীফ আমুলী এই সম্মান-লাভ করেন। আমিন (arbitrator) পদ প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন শের শাহ—যাঁহার আমলে বাঙ্গালা দেশে কাজী ফজিলৎ আমীন নিযুক্ত হইয়াছিল। একাধিক সমপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে কোন বিবাদ কিংবা বিতর্কমূলক বিষয় উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতা করিয়া সরেজমীনে মীমাংসা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন আমীন। ইয়ুসুফ খাঁ (কাশ্মীরের রাজা), মানসিংহ এবং সৈদ খাঁ প্রায় সমপদস্থ; সুতরাং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হম্‌বড়া মনসবদারের মধ্যে অভিযান পরিচালনা

মীর শরীফ আমুলীকে "জগদ্‌গুরু" আকবরের চেলা না বলিয়া মুরীদ বলাই সঙ্গত; কেননা বাদশাহ গোলাম বাঁদী ইত্যাদি হীনতাসূচক শব্দের ব্যবহার সর্বত্র বাতিল করিয়া ক্রীতদাসদাসীগণকে চেলা-চেলী বলিবার রেওয়াজ চালু করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান পর্যন্ত এই অর্থে চেলা শব্দ প্রচলিত ছিল। মানবতার প্রতি এই দরদ ও ইজ্জৎ আকবরকে ইতিহাসে আকবরত্ব প্রদান করিয়াছে। কথ্য বাংলায় "ছেরা" "ছেরী" (ছোট ছেলেমেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য) বোধ হয় উক্ত শব্দদ্বয়ের বিকৃতি।

* *Akbarnama* iii, p. 916 and footnote 3. মূল অশুদ্ধ জানিতে পারিয়াও বেভারিজ সাহেব উহা এস্থলে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। *Khalifagi* শব্দ ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপিতে আছে। আকবরনামার আর একটি উন্নততর এবং প্রামাণিক মূল সংস্করণ সম্পাদনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ডক্টর মোদীর ন্যায় কোন পণ্ডিত একটা *Studies in Akbarnama* লিখিলে ঐতিহাসিকেরা সন্দেহমুক্ত হইতে পারিতেন।

সম্পর্কে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এই আশঙ্কায় সম্রাট শরীফ আমুলীকে আমিনের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সদর এবং কাজী ব্যতীত মুসলমানের আইনগত অধিকার রক্ষা এবং ফৌজদারী বিচার চলিত না। চারিটি বিভিন্ন পদে চারিজন কর্মচারী নিযুক্ত হইলে কার্য পণ্ড হইতে পারে—এই জন্য এই অদৃষ্টপূর্ব পদ সৃষ্টি করিয়া সম্রাট এক গুরুতর সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

৮

মীর শরীফ আমুলী বাঙ্গালায় পৌঁছিবার পূর্বেই মানসিংহের দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল। বিহারের ফৌজ ইয়ুসুফ খাঁর অধীনে ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুর—বীরভূমের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইল। রাজা মানসিংহ নৌকাযোগে (বোধ হয় ভাগলপুর হইতে) বাঙ্গালার রাজধানী টাণ্ডার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন (শুক্রবার ৫ই নভেম্বর ১৫৯১ খৃঃ)*। বাঙ্গালার সুবাদার সৈদ খাঁ অসুস্থতার দরুন মানসিংহের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিলেন না; কিছুদিন পরে তিনি বাবুই মানকালী প্রভৃতি জায়গীরদারগণ এবং ছয় হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদারগণ এবং যশোরের রাজা শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমার প্রতাপাদিত্যও বোধ হয় মানসিংহের আমন্ত্রণে এই অভিযানে জমিদারী ফৌজ লইয়া বাদশাহী শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার পাঠানগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইতিপূর্বেই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়াছিল। এইবার মোগলবাহিনী বর্ধমান-জাহানাবাদ-মেদিনীপুরের পথে অগ্রসর হইয়া সুবর্ণরেখার উত্তর-তীরে শিবির স্থাপন করিল। পাঠানেরা তাহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যবল একত্র করিয়া সুবর্ণরেখার দক্ষিণ তীরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় এবং দাঁতন হইয়া দক্ষিণমুখী যে রাস্তা জলেশ্বর গিয়াছে রাজা মানসিংহ সেই রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই রাস্তায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে টোডরমল-মুনিম খাঁর বাহিনী দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দাঁতনের অল্প কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তুকোরায় নামক স্থানে পাঠান সেনাকে পরাজিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধকেই পূর্বতন ঐতিহাসিকগণ মোগলমারীর যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সর্ যদুনাথ (Bengal Past and Present) প্রমাণ করিয়াছেন তুকোরায়ের যুদ্ধকে মোগলমারীর যুদ্ধ বলিবার কোন হেতু নাই, কারণ মোগলমারী

* "On 23 Aban of the *previous* (*i. e.*, 36th) year" : Akbarnama, iii, 934.

একটি স্বতন্ত্র স্থান, দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে, তুকোরায় হইতে ব্যবধান অন্যূন বারো-চৌদ্দ মাইল। তবে মোগলমারী নাম এবং ঐ স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল ইহা কি নিতান্ত বাজে কথা? কোন ঐতিহাসিক এই জনশ্রুতির সত্যতা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানা নাই।* মানসিংহের দ্বিতীয় উড়িষ্যা অভিযানের সময় মোগল এবং পাঠান সৈন্যেরা কোথায় পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘকাল টহলদারী তৎপরতা এবং আপোসের কথাবার্তায় কালহরণ করিতেছিল—উহা নির্ণয় করিতে পারিলে মোগলমারী যুদ্ধ-বিষয়ক জনশ্রুতির উপর আলোকপাত হইতে পারে। মানসিংহের শিবির ছিল একটি নদীর (সুবর্ণরেখার) উত্তর তীরে। পাঠানেরা নদী পার হইয়া মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং যুদ্ধের পরদিনই বাদশাহী সেনা জলেশ্বর অধিকার করে—এই মাত্র উল্লেখ আকবরনামাতে আছে। মোগলমারী গ্রাম হইতে জলেশ্বরের দূরত্ব প্রায় ষোল-সতের মাইল। মোগল অশ্বারোহী সৈন্যদল পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মোগলমারী হইতে এক দিনে জলেশ্বরে উপস্থিত হওয়া কিছু অসাধারণ ব্যাপার নহে। মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য পাঠানেরা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দুর্গম জঙ্গলে জমায়েত হইয়াছিল—স্থানটির নাম মালনাপুর পাঠান্তরে বিনাপুর। রেনেলের ম্যাপে কিংবা আইন-ই-আকবরীতে মোগলমারীর কাছাকাছি সুবর্ণরেখার দক্ষিণ তীরে মালনাপুর কিংবা বিনাপুর নামক কোন স্থান নাই। কিন্তু আকবরনামার বিবরণ পড়িয়া মনে হয় 'রায়বানিয়াগড়' অঞ্চলেই পাঠানেরা শিবির স্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানের পূর্ব দিকে সুবর্ণরেখার বাঁক, দক্ষিণে দুই মাইল ব্যবধানে একটি ছোট উপনদী; দশ-বারো মাইল দক্ষিণে অন্য একটি নদীও জলেশ্বরের নিকট সুবর্ণরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে; উত্তর পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত জঙ্গল। জলেশ্বরের দিকে কুচ করিলে সুবর্ণরেখা পার হইয়া মোগলবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিবে কিংবা মেদিনাপুরের রাস্তায় শত্রুর সরবরাহ এবং পলায়নের পথ বন্ধ করিতে পারিবে—এই মতলবেই পাঠানেরা রায়বানিয়াগড়ের জঙ্গলে আত্মরক্ষামূলক সমরকৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।

তুকোরায় যুদ্ধের প্রাক্কালে তোডরমল্ল-মুনিম খাঁর মতভেদ অপেক্ষাও এই অভিযানে তীব্রতর ঈর্ষা এবং অসহযোগিতা দেখা দিল। বাঙ্গালার সুবাদার অনিচ্ছায়, সম্রাটের ভয়ে এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার ফৌজ লইয়া তিনি একমঞ্জিল (আট-দশ মাইল) পিছনেই আলাদা তাঁবু ফেলিলেন। পাঠানেরা

* মানসিংহের সহিত পাঠান সেনার এই যুদ্ধ সুবর্ণরেখার উত্তর তীরে ঘটিয়াছিল এ কথা Mr. Beams নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণ করিয়াছেন (J.A.S.B. 183 p. 236.)

ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া মোগল শিবিরে কপট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিল ইহাতে মানসিংহ সৈদ খাঁর মতবিরোধ আরও বাড়িয়া গেল। যুদ্ধে অনুৎসাহী বাঙ্গালার মনসবদারগণ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য জিদ করিলেন, কিন্তু মানসিংহ কিছুতেই রাজী হইলেন না। এই অজুহাতে তাঁহারা আরও পিছনে হটিয়া দূরে ডেরা কায়েম করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। সৈদ খাঁ বিরক্ত হইয়া সোজা রাজধানী টাণ্ডায় ফিরিয়া চলিলেন, কেবল বাবুই মানকালী প্রমুখ কয়েকজন সর্দার সৈদ খাঁকে ত্যাগ করিয়া মানসিংহের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মানসিংহ যুদ্ধার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিহারের ফৌজকে অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। সুবর্ণরেখার উত্তর পারে পাঠান পর্যবেক্ষণকারী সৈন্যদের সহিত বাদশাহী ফৌজের ছোটখাটো হাতাহাতি কিছু দিন চলিল। মানসিংহ অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার হরাবল বা অগ্রগামী সেনাকে শত্রুর অবস্থানের নিকটবর্তী একটি টিলা অধিকার করিয়া দুর্গ নির্মাণের আদেশ দিলেন, কথা ছিল পাঠানেরা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে তিনি স্বয়ং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। এই টিলা সম্ভবতঃ রায়বানিয়াগড়ের মুখোমুখি কোন স্থান। মানসিংহের কৌশল সফল হইল। পাঠানেরা বোধ হয় মনে করিয়াছিল সমস্ত বাদশাহী সেনা নদী পার হইয়া ফাঁদে পড়িয়াছে। তাহারা আরও ভাটিতে সুবর্ণরেখা পার হইয়া ব্যূহবদ্ধভাবে মানসিংহের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষী সৈন্যদলকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল,—কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে মানসিংহের অধিকাংশ সৈন্য মূল শিবিরেই ছিল। নদী পার হইয়া বরং পাঠানেরাই ফাঁদে পড়িল, পশ্চাতে নদী, - যুদ্ধ না করিয়া প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই।

৯

আমাদের মনে হয় উড়িষ্যার মোগল-পাঠানের এই শেষ যুদ্ধ দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী গ্রামেই ঘটিয়াছিল। আবুল ফজলের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়—উভয় পক্ষে অন্ততঃ পনের-ষোল হাজার সৈন্য ছিল এবং যুদ্ধটাও ঘোরতর হইয়াছিল। কিন্তু এত গোলাগুলি ব্যয়, এত হানাহানির পর পাঠান পক্ষে ৩০০ এবং মোগল পক্ষে মাত্র ৪০ জন সৈন্য মরিল,—আবুল ফজলের এই উক্তি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। পাঠানের মাথাগুলি শিউলি ফুল নহে যে, বাদশাহী ফৌজের ফুৎকারেই মাটিতে গড়াগড়ি দিবে। পাঠান সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয় নাই। উহাদের একদল হিজলীর পাঠান সর্দার ফতে খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, অন্য

দল কটকের দিকে পলাইয়া উড়িষ্যার হিন্দু ভূস্বামী রাজা মন্ত, পুরুষোত্তম ইত্যাদির সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। খুরদার রামচন্দ্র শরণাগত সকলকেই শরণগড় দুর্গে (কটক শহরের তিন মাইল দক্ষিণে বর্তমানে বড়-বাটির কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ) আশ্রয় দিলেন। মানসিংহের সহিত এই যুদ্ধকে "মোগল-মারী" আখ্যা দিয়া পরাজিত পক্ষ 'আত্মপ্রবঞ্চনা' করিয়াছিল। পাঠানেরা যুদ্ধ হারিলেও বিজিত হয় না। পরাজয়ের মনোভাব পাঠানের নাই; হটিলেও মনে করে জিতিয়াছে। যাহা হউক, মোগলমারীর যুদ্ধ উড়িষ্যায় পাঠান-স্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটাইল।

শরণগড় দুর্গে অবরুদ্ধ উড়িষ্যার হিন্দু-মুসলমান ভূমিয়াগণের যুদ্ধ, খুরদার রাজা রামচন্দ্রের প্রতি মানসিংহের অবিচার, আকবর বাদশাহ আদেশে মানসিংহ কর্তৃক স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা আকবরনামা ও অন্যান্য সমসাময়িক ইতিহাসে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বর্তমানে আমরা কাব্য এবং জনশ্রুতিমূলক মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য বিষয়ক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক আলোচনা করিব। বাঙালী মান-সিংহ অপেক্ষা প্রতাপাদিত্যকে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন—বিশেষতঃ স্বর্গীয় ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র। সুতরাং এ প্রবন্ধে প্রতাপাদিত্যের পূর্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ অবতারণা অপরিহার্য।

প্রতাপাদিত্যের বংশ পরিচয় এবং বাল্যজীবন যশোর-খুলনার ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল দরবারের সহিত প্রতাপাদিত্যের যেটুকু সম্বন্ধ আমরা শুধু সেটুকুরই সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যুবক প্রতাপ শঠতাক্রমে খুল্লতাত বসন্ত রায়কে ঠকাইবার জন্য নিজের নামে বাদশাহী সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য জনশ্রুতি মাত্র। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের সর্বপ্রথম কোথায় এবং কেন সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল মোগল দরবারী ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। ঘটকপঞ্জী, ভারতচন্দ্রের কাব্য, ক্ষিতীশবংশাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত কিংবা বাংলায় যাহা কিছু মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য সংবাদ বর্ণিত আছে সবই পরবর্তী কালের বিকৃত জনশ্রুতি এবং উদ্ভট কল্পনার সমাবেশ মাত্র। সতীশচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস রচনায় "বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণের প্রতিবন্ধক" একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় (যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ) নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতামত খণ্ডন পণ্ডশ্রম মাত্র। ৺নিখিলনাথ রায় সম্বন্ধে প্রায় ঐ কথাই বলা যায়—তবে অনেক মৌলিক উপাদানের জন্য আমরা তাঁহাদের কাছে অশেষ প্রকারে ঋণী।

মানসিংহের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী তথাকথিত "বাইশ আমীর" প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ৺নিখিলনাথ রায় যুক্তিসঙ্গতভাবে ঐ কাহিনী অবিশ্বাস করিয়াছেন (প্রতাপাদিত্য, পৃ. ১৫৮-১৫৯)। অন্নদামঙ্গল কাব্যের "বাইশ লস্কর সঙ্গে" উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সম্ভবতঃ নিখিলনাথ অনুমান করিয়াছেন এই "বাইশ আমীর" বোধ হয় মানসিংসের সঙ্গেই প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অভিযান করিয়াছিলেন। মানসিংহের সহিত বাইশ কিংবা ততোধিক আমীরের উপস্থিতি কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে এই বাইশ আমীরের অনুসন্ধান নিছক গরু-খোঁজা ব্যাপার মাত্র। আমাদের মতে মানসিংহের সহিত কস্মিন্ কালে আদৌ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয় নাই এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় এরূপ সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল না।

কথাটা কিছু নূতন নহে। বহু বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় Bengal Chiefs' Struggle for Independence প্রবন্ধ-পর্যায়ে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভট্টশালী মহাশয়ের যুক্তি-প্রমাণ নিখুঁত; নিখিলনাথ রায় শ্রেণীর লেখকের উপর তিনি একেবারে খড়্গহস্ত। তবে মনে হয় তিনি একটু অতিরিক্ত অসহিষ্ণু; তাঁহার দৃষ্টিপ্রসার একটু অনুদার—প্রতাপকে তিনি মোগল সুবাদারগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত, এমন কি দেশদ্রোহী বলিতেও দ্বিধা করেন নাই।

বাঙালী লেখকগণের মধ্যে ৺রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" পুস্তকে লিখিত আছে মানসিংহ যখন সসৈন্যে পাটনা হইতে বর্ধমানে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন তখন প্রতাপাদিত্যের আমন্ত্রণে যশোরে গমন করিয়া মৌতালার দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা হয়ত সত্য ঘটনা নয়। কিন্তু "সিংহ রাজার সহিত প্রতাপের অধিক অন্তরঙ্গতা" ঐতিহাসিক সত্য। প্রতাপাদিত্য কিংবা যশোরের কোন হিন্দু জমিদার মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন—এই কথা আকবরনামায় পাওয়া যায় না। কিন্তু গোপালপুরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি "গোবিন্দদেব," উক্ত বিগ্রহের সহিত আগত সেবাইৎ বল্লভাচার্য, উৎকলেশ্বর শিব—এই সমস্ত প্রতাপাদিত্য কোথা হইতে পাইলেন? সুতরাং দরবারী ইতিহাসে না থাকিলে, আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত উড়িষ্যা অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন, এবং খুরদার রাজা রামচন্দ্রের সহিত সন্ধির পর লুটের অন্যান্য মালের সহিত যশোরে আনিয়া মহাসমারোহে বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সুতরাং সতীশ মিত্র মহাশয়ের পরিশ্রম এক্ষেত্রে সফল হইয়াছে। (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৫৫)।

কিন্তু আসল কথা, প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ, ভবানন্দ মজুমদারের সহিত বাদশাহের সাক্ষাৎকার, মজুমদারের রাজ্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার। "যশোরজিৎ" রাঘব রায় দেশদ্রোহী, জ্ঞাতিদ্রোহী হইয়া ইসলাম খাঁ চিশতীর সৈন্যদলে সম্ভবতঃ যোগ দিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর বাংলার সুবাদারগণের নিকট হইতে ভবানন্দ মজুমদার হয়ত জমিদারির কোন পরওয়ানা বা নিশান পাইয়াছিলেন—কিন্তু মানসিংহের শাসনকালের সহিত উক্ত ঘটনাবলী জড়িত করিয়াই ইতিহাসমূলক জনশ্রুতি পরবর্তীকালে বিকৃত হইয়াছে। জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকার না করিলে ইতিহাসের একটি অঙ্গহানি ঘটে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কমল খোজা বা খাজা কামাল উদ্দীন খাঁর পরিচয় একমাত্র 'বাহারিস্থানে'ই পাওয়া যায়; জাহাঙ্গীরের সমকালীন অন্য কোন মুসলমান ইতিহাসে নাই। আজ পর্যন্ত যদি বাহারিস্থান অনাবিষ্কৃত থাকিত তাহা হইলে অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিকপন্থী ঐতিহাসিকগণ হয়ত কমল খোজাকে কাল্পনিক ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে বাদ দিয়া বসিতেন। সূর্যকান্ত গুহ ইত্যাদি প্রতাপের হিন্দু সেনাপতিগণের নাম জনশ্রুতিমূলক কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না—এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া অবিচার মাত্র। কিন্তু "নাহমূলাঃ জনশ্রুতিঃ" এই দুর্বলতা বিচারের সীমারেখা অতিক্রম করিলেই ইতিহাস উপন্যাস হইয়া পড়ে। "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে"র ত্রিংশ এবং একত্রিংশ পরিচ্ছেদ এই কারণেই উপন্যাস বলিয়া উপেক্ষিত। "ক্ষিতীশ বংশাবলী"কে ইতিহাস ভ্রম করিবার কোন হেতু আছে কিনা উহার আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

১০

কটকের সন্ধির পর ওসমান প্রমুখ পাঠান সর্দারগণ উড়িষ্যা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা মানসিংহ সরকার খেলাফতাবাদে (বর্তমান যশোর-খুলনা জেলায়) তাঁহাদের জায়গীর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠানেরা সপ্তগ্রাম অতিক্রম না করিতেই মোগল সুবাদার হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ শিবিরে তলব করিলেন। পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠানগণ মানসিংহের অন্ত

দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আবার বিদ্রোহী হইল এবং লুটতরাজ করিতে করিতে ভূষণা বা ফরিদপুর জেলায় উপস্থিত হইল। শ্রীপুরের প্রবল-পরাক্রম ভূঁইয়া বৃদ্ধ কেদার রায়ের পুত্র চাঁদ রায় পদ্মার দক্ষিণ তীরে সরকার ফতেহাবাদ বা বর্তমান ফরিদপুর জেলা কয়েক বৎসর পূর্বে অধিকার করিয়া ভূষণা দুর্গে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যা হইতে নির্বাসিত ওসমান প্রভৃতি পাঠানগণকে স্বীয় রাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়া পরে তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। আবুল ফজল সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণন করিয়াই দায়মুক্ত হইয়াছেন। রাজা মানসিংহ প্রথমে ওসমান প্রভৃতি পাঠানগণকে কেন ভূষণা বাক্‌লা (বরিশাল), এবং যশোর-খুলনার হিন্দু জমিদারত্রয়ের রাজ্যের প্রত্যন্ত ভাগে জায়গীর দিয়াছিলেন এবং পরে কেনই বা মত পরিবর্তন করিলেন, পাঠানগণের প্রতি চাঁদরায়ের বিশ্বাসঘাতকার মধ্যে রাজা মানসিংহের কোন প্ররোচনা ছিল কিনা—কোন ঐতিহাসিক এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করেন নাই। অথচ মনে হয় এই অজ্ঞাত মনস্তত্ত্বের পশ্চাতে অনেকখানি ইতিহাস আছে।

মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা

"ইক্ হাডা বুন্দী ধনী, দুবো মহোবাপাল।
সালত ঔরঙ্গজেব উব, বে দোনো ছত্রসাল॥"

ইতিহাসে ছত্রসাল (সংস্কৃত শক্র-শাল) নাম সার্থক করিয়াছেন দুইজন। একজন—হাডাবংশী বুন্দীরাজ ছত্রসাল, অপর জন—বুন্দেলখণ্ড-কেশরী মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা। ইঁহারা দুইজনই ঔরঙ্গজেবের বুকে শল্য-স্বরূপ ছিলেন। প্রথম ছত্রসাল দারার পক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধে বীরত্ব ও স্বামিধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছত্রসাল শিবাজীর মন্ত্রশিষ্য—সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুজাগরণের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। এই শেষোক্ত ছত্রসালের জীবন-চরিত সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বংশ-পরিচয়

গহিরবার ক্ষত্রিয়গণ কাশী ও কনৌজে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঘোরী স্থলতান শিহাবুদ্দীন কর্তৃক পৃথ্বিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চন্দ্রের পরাজয়ের পর গহিরবার বংশের এক শাখা বুন্দেলখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে চন্দেল বংশীয়দের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় নবাগত গহিরবারগণ তথায় সহজে আধিপত্য স্থাপন করেন। বুন্দেলা ও বুন্দেলখণ্ড নামের উৎপত্তি যাহা আমরা লালকবির ছত্রপ্রকাশে পাই তাহা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য। যাহা হউক, পলাতক গহিরবারগণ রাজপুতানায় যেমন পরবর্তীকালে রাঠোর নামে পরিচিত হইয়াছেন, সেরূপ ইঁহাদের অন্য শাখা নূতন উপনিবেশে বুন্দেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে যমুনার দক্ষিণ, মালবের পূর্ব, এবং বিন্ধ্যপর্বতের শাখা কৈমুর পর্বতশ্রেণীর দ্বারা অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যাকীর্ণ ভূমি বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত হইল। লালকবির মতে বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলাদের আদি রাজধানী ছিল ধরমপুর। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় প্রতাপরুদ্র * বা রুদ্রপ্রতাপ দেব ঔরছা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রায় সমস্ত বুন্দেলখণ্ড আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের

* লালকবির বর্ণনানুসারে প্রতাপরুদ্রের একপুত্র ছিল কীরৃতি শাহ। ইনি নিশ্চয়ই আব্বাস সরবাণী কথিত কালিঞ্জর-রাজ কিরত (কিরাত নয়) সিংহ—যিনি শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রথম পুত্র ভারতীচন্দ্র, এবং অপুত্রক ভারতীচন্দ্রের মৃত্যুর পর রুদ্রপ্রতাপের দ্বিতীয় পুত্র আকবরের সমকালিক মধুকর শাহ ঔরছায় রাজা হইয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের তৃতীয় পুত্র উদয়াজীৎ মহোবায় সামন্তরাজরূপে রাজত্ব করিতেন। এই উদয়াজীতের প্রপৌত্র চম্পৎ রায় মহারাজ ছত্রসালের পিতা। মধুকর শাহের পুত্র বীরসিংহ দেব ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করিয়া জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ঔরছার রাজত্ব পাইয়াছিলেন। বীরসিংহ দেবের পুত্র জুঝার সিংহ চৌরাগড় লুটের অংশ সম্রাট শাজাহানকে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মোগল সৈন্য বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিল। এই বিদ্রোহদমন-ব্যাপারে বাদ্‌শাহের অন্তররুদ্ধ ধর্মান্ধতার প্রথম গৈরিকস্রাব মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিল। ঔরছার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবমন্দির তাঁহার আদেশে মস্‌জিদে পরিণত হইল। জুঝার সিংহের স্ত্রী-কন্যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল-অন্তঃপুরে চিরবন্দিনী হইলেন। জুঝার সিংহের এক পুত্র ও মন্ত্রী স্বধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ায় ঘাতকের খড়্গে প্রাণবলি দিল। জুঝার সিংহের সহিত চম্পৎ রায়ের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের এই দুর্দশা দেখিয়া তিনি গৃহবিরোধ ভুলিয়া গেলেন। মোগলসম্রাট বুন্দেলার বিভীষণ দেবীসিংহকে ঔরছার গদীতে বসাইয়াছিলেন (১৬৩৫ খৃঃ)। কিন্তু শত্রু দ্বারা রক্ষিত বিজেতার হাতের পুতুলকে আত্মসম্মানী কোনো বীরজাতি রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

চম্পৎ রায় মোগল-বিরোধী বুন্দেলা জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্বক জুঝার সিংহের শিশুপুত্র পৃথ্বিনারায়ণকে ঔরছার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিছুদিন পরে পৃথ্বিনারায়ণ ধৃত হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল; কিন্তু চম্পৎ রায় মোগলের সিংহাসনতলে মাথা নোয়াইলেন না। শিবাজীর পিতা শাহজীর মত তিনিও রাজা এবং রাজ্যশূন্য দলের অধিনায়ক হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোগল-ঐতিহাসিকের চক্ষে চম্পৎ রায় সাম্রাজ্য ও সমাজের শত্রু—বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে তিনি নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক —দেশ ও জাতির ত্রাণকর্তা। আধুনিক ঐতিহাসিক চম্পৎ রায়কে দেশভক্ত বা বিদ্রোহী যাহাই বলুন ক্ষতি নাই। উভয়ের মধ্যে তফাতটাও বড় বেশী নয়, কৃত-কার্যতার মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই চম্পৎ রায় বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডবাসী চিরদিন মনে রাখিবে—

> "প্রলয় পয়োধি উমণ্ড মে জ্যোঁ গোকুল যদু রায়।
> ত্যোঁ বুড়ত বুন্দেল কুল রাখ্যো চম্পৎ রায়॥"

অর্থাৎ, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রলয় মেঘের অবিরাম বর্ষণ হইতে গাভীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই নিমজ্জমান বুন্দেলা-কুল চম্পৎ রায়কে আশ্রয় করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল।

১৭০৬ বিক্রম সম্বতের (১৬৫০ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়ায় চম্পৎ রায়ের চতুর্থ পুত্র ছত্রসাল জন্মগ্রহণ করেন। ছত্রসাল অল্পবয়সেই অস্ত্রচালনা ও লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছিলেন। শিবাজী, আকবর, রণজিৎ সিংহ, হায়দর আলী ইত্যাদি মধ্যযুগের অধিকাংশ খ্যাতিমান পুরুষের মত ছত্রসাল নিরক্ষর ছিলেন না। মাতৃভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল, তিনি পরিণত বয়সে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন", "শ্রীরাম-যশ-চন্দ্রিকা", "হনুমদ্-বিনয়" ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—এগুলি কয়েক বৎসর পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের না হইলেও ছত্রসালের জ্ঞানচর্চা এবং ধর্মজীবনের একটা দিক হিসাবে এগুলির মূল্য আছে। ছত্রসালের পিতা চম্পৎ রায় নিরুপায় হইয়া কিছুকাল মোগল সরকারে চাকরি করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরি করিতে হইলে ত্বকের স্থূলতা, চাটুবাদ, চুকলি ইত্যাদি যে-সব গুণ থাকা দরকার চম্পৎ রায়ের তাহা অর্জন করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এজন্য তাঁহার মুরব্বি শাহজাদা দারা শুকো তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চম্পৎ রায় দারার সহিত ঝগড়া করিয়া মহোবায় ফিরিয়া আসিলেন। ছত্রসালের বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র। বিপদ, অভাব ও চাঞ্চল্যের মধ্যেই তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর তক্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চম্পৎ রায়কে দমন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বুন্দেলখণ্ডে আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া চম্পৎ রায় মুক্তপিঞ্জর ব্যাঘ্রের মত পঁচিশজন মাত্র অনুচর লইয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মত দক্ষ শিকারীর হাত হইতে তিনি পলাইবেন কোথায়? ছত্রসালের মাতুল সাহেব রায় নিজ ভগ্নীপতিকে কয়েদ করিয়া বাদশাহের হাতে সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। চম্পৎ রায় ও রাণী কালীকুমারী বিশ্বাসঘাতক ধন্ধেরাদের হাতে পড়িবার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন।

মাতাপিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর, মাতুলালয় ছত্রসালের পক্ষে জতুগৃহবাসের ন্যায় হইয়া উঠিল। একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি বড় ভাই অঙ্গদ রায়ের নিকট দেবগড়ে পলাইয়া গেলেন। কপর্দকশূন্য, আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত দুই ভাই মায়ের কিছু অলঙ্কার (যাহা অঙ্গদ রায় দৈলবারায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল)—বিক্রয় করিয়া পাথেয় সংগ্রহপূর্বক দাক্ষিণাত্যে মির্জারাজা জয়সিংহের অধীনে মোগল-সৈন্যে যোগ দিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। এই সময়ে ছত্রসালের বয়স মাত্র পনের বৎসর।

মোগল সেনাপতি লোক চিনিতেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুরন্দর-দুর্গ অবরোধকালে ছত্রসাল ও অঙ্গদ রায় বিশেষ সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জয়সিংহের সুপারিশে সম্রাট ঔরঙ্গজেব চম্পৎ রায়ের দুই পুত্রের অপরাধ মার্জনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ অঙ্গদ রায়কে এক হাজারী ও ছত্রসালকে তিনশত সদী মন্‌সবদারের পদ দিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর সম্মিলিত মোগল ও মারাঠা সৈন্য যখন বিজাপুর আক্রমণ করে, ছত্রসাল তাহাদের বিভিন্ন যুদ্ধনীতি বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর (১৬৬৫—১৬৭০ খৃঃ) মোগল সরকারে চাকরি করিবার পর ছত্রসাল শেষে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর কাছে পলাইয়া গেলেন।

মির্জারাজা জয়সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন চাকরির আঁচ ছত্রসালের গায়ে লাগে নাই। ১৬৬৭, জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর ছত্রসাল সম্ভবতঃ পাঠান সেনাপতি দিলীর খাঁর অধীনে দেবগড় আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে ছত্রসাল আহত হন। কিন্তু পুরস্কারের বেলা তাঁহার ভাগ্যে কিছুই মিলিল না, অথচ সেনাপতির মনসব বাড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে চাকরিতে তাঁহার ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিল। তাহার মনস্বী জয়সিংহের প্রতি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার দেখিয়াও তাঁহার চোখ খুলিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের স্বধর্মপ্রীতি পরধর্মনির্যাতনের আকার ধারণ করিল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমস্ত সুবাদারগণের প্রতি আদেশজারি হইল যেন তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে অ-মুসলমানদের পাঠশালা এবং দেবমন্দির ধ্বংস করেন। ঔরঙ্গজেব এ বিষয়ে পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পূর্বে কোনো মুসলমান রাজার কোপদৃষ্টি হিন্দু গৃহস্থবাড়ীর বাঁশ খড়ের ঠাকুরঘর পর্যন্ত পৌছায় নাই। বাদশা যে হিন্দুসমাজকে মৃত মনে করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাহাই সহসা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। হিন্দুর এই পুনরুত্থানকে সপ্তদশ শতাব্দীর এক বিরাট শূদ্র-জাগরণ বলা যাইতে পারে। শূদ্র শিবাজীই এই নব-বোধনের পুরোহিত। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুকাল নীরব থাকিয়া শিবাজী এ সময়ে (১৬৭১ খৃঃ) আবার ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর এই শেষ যুদ্ধই প্রকৃত স্বাধীনতাসংগ্রাম—যাহার লেলিহান শিখা দক্ষিণী হাওয়ায় উত্তরাপথে বিস্তৃত হইয়া সম্রাট ও সাম্রাজ্য উভয়কেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কুমার ছত্রসাল এই স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া শিবাজীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আশ্রয়, উন্নতির সুপ্রশস্ত পথ, আত্মীয়-স্বজন এবং জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডের মায়া কাটাইয়া ছত্রসাল যে মহান্ ভাবের অনুপ্রেরণায়

স্বেচ্ছাসেবকরূপে শিবাজীর সহায় হইতে চাহিয়াছিলেন তাহার উপমা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। দেশ ও জাতিনির্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতাকামীদের জন্য যুদ্ধ করিবার যে প্রেরণা রুসোর মন্ত্রশিষ্য ফরাসী যুবকগণ পাইয়াছিলেন, যে অজ্ঞাত আহ্বানে তাঁহারা মার্কিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জর্জ ওয়াশিংটনের পতাকাতলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একশত বৎসর পূর্বে সেই একই প্রেরণাবলে ভাবপ্রবণ যুবক ছত্রসাল মহারাষ্ট্র শিবিরে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছত্রসালের নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানে শিবাজীর বুক আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলে তাঁহার সুযশটুকু মহারাষ্ট্রই আত্মসাৎ করিবে। ভারত-আকাশের প্রভাতী তারকা সহ্যাদ্রির নিবিড় অরণ্যানীর অন্তরালে ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া অস্ত যাইবে। অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত সমাজে ছত্রসালের প্রতিভার সহজ স্ফূর্তি হইবে না—তাঁহার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র বুন্দেলখণ্ড। তাই তিনি কয়েক দিন পরে ছত্রসালকে সস্নেহে জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কেহ কেহ বলেন, শিবাজী ফাঁকা কথায় ছত্রসালকে বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রত্যাখ্যানে ছত্রসাল ভগ্নহৃদয়ে মারাঠা-দরবার হইতে প্রস্থান করেন। লালকবি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই—এই সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিত করিলে শিবাজীর প্রতি অবিচার করা হয়। ছত্রসালের শক্তি ও মহান্ ভাব শিবাজী নিজ স্বার্থে ব্যয় না করিয়া মধ্যভারতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত করেন।

ছত্রসাল দেশ ও ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামিতে কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং শত্রুমিত্রনির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে এ কার্যে ব্রতী করিবার চেষ্টা তাঁহার অবশ্যকর্তব্য। তিনি নিজের সঙ্কীর্ণতা ও পূর্ব শত্রুতা ভুলিয়া তাহার পিতার পরম শত্রু রাজা শুভকরণ বুন্দেলার সহিতই প্রথমে দেখা করিলেন। শুভকরণ কয়েকদিন বিশেষ স্নেহ করিয়া ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং যুবকের উৎকণ্ঠা এবং বিষণ্ণতায় দয়াপরবশ হইয়া বাদশাহের কাছে তাহার জন্য উচ্চ মনসব এবং মহোবার জায়গীর প্রার্থনা করিয়া উকীল পাঠাইতে চাহিলেন। এক সময়ে ইহা অপেক্ষা অল্পেও হয়ত ছত্রসাল আজীবন সম্রাটের সেবা করিতেন। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া আজ তাঁহার প্রেয় কিছুই নাই। তিনি বিনা দ্বিধায় বলিয়া ফেলিলেন—আমি চাকরি করিব না—বাদশার সহিত যুদ্ধ করিব। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ? এ যেন গলায় পাথর বাঁধিয়া সন্তরণের চেষ্টা। শুভকরণ তো অবাক! আন্তরিক রাজভক্তি না থাকিলেও শুভকরণ সেকালের 'মভারেট'—পাছে বিপদে পড়েন এই ভাবিয়া তিনি ছত্রসালকে তৎক্ষণাৎ বিদায়

দিলেন। ধরাইয়া দিলে নিশ্চয়ই কিছু পুরস্কার মিলিত, কিন্তু বাদ্‌শা ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ হিন্দুগণকে এই নীচতার কিছু উর্ধ্বে টানিয়া তুলিয়াছিল। রাজদণ্ড কিংবা নেতৃত্বলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছত্রসাল এ কার্যে অবতীর্ণ হন নাই—যোগ্যতর ব্যক্তির পরিচালনায় তিনি কাজ করিতে সর্বদা প্রস্তুত। সুতরাং শুভকরণ তাঁহাকে এভাবে বিদায় দেওয়ায় তাঁহার দুঃখ কিংবা চিত্তের অবসাদ ঘটিল না। তিনি অন্যান্য হিন্দুরাজাদের কাছে গেলেন, কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থমনোরথ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতালাভের দুরাশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ঠিক এই সময়ে ঔরঙ্গজেব ফিদাই খাঁকে ঔরছার মন্দিরগুলি ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। শঙ্খধ্বনি কানে গেলে মুসলমানের নিস্তার নাই—এ কথা সম্রাট নূতন ভাবে ঘোষণা করিলেন—

"জো কহুঁ কান সংখ ধুনি আওবে।
মুসলমান তৌ ভিস্ত ন পাওবে॥
সিদৌ উটি কান জো নাওবে।
তৌ দোজখ তে খুদা বচাবে॥
তাতৈ ঢাহি দেবালৈ দীজৈ।
তিনকে ঠৌর মসীদে দীজে॥
মুলনা তহাঁ নিবাজ গুদারে।
বাঁগ দেহি নিত সাঁঝ সকারে॥
ন্যাউ চুকাবে ফাজিল কাজী।
জাতে রহে গোসাই রাজী॥*

ফিদাই খাঁ গোয়ালিয়র হইতে একদল সৈন্য লইয়া বাদ্‌শাহের হুকুম তামিল করিতে ঔরছায় আসিল। ঔরছার রাজা সুজান সিংহ এ সময়ে বাদ্‌শাহের কাজে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। তিনি ঔরছায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত তাঁহার পিতা (?) দেবীসিংহের মত মন্দিরধ্বংস-ব্যাপারে উদাসীন থাকিতেন, অন্তত বাধা দিতে সাহস করিতেন না। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যাঁহার মনসব যত উঁচু এবং রাজ্য যত বড়, তাঁহার মানসিক কাপুরুষতাও সে অনুপাতে বেশী ছিল। ভয়ভাবনা বা

* কানে শঙ্খধ্বনি আসিলে মুসলমান তো বেহেস্তে যাইতে পারিবে না। এক্ষেত্রে যদি দুইটি কান ধরিয়া জমিতে মাথা ঠেকায় তবে খোদা তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। দেবালয়গুলি ধ্বংস করিয়া উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা হোক্, যেখানে মৌলানা নিত্য সকালসন্ধ্যায় আজান দিয়া নমাজ পড়িবে; বিদ্বান কাজী ন্যায় বিতরণ করিবে। এরূপ করিলে খোদাতালা রাজী থাকিবেন।

পাটোয়ারি বুদ্ধি জনসাধারণের স্বাভাবিক সাহস ও সৎকর্মের প্রেরণাকে দমিত করে না। এজন্য ঔরছাবাসীরা রাজার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া বক্শী ধর্মাঙ্গদের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্যকে গোয়ালিয়রের সীমা পর্যন্ত তাড়াইয়া দিল। এ সংবাদ রাজা সুজান সিংহের কাছে পৌঁছিলে তিনি প্রমাদ গণিলেন। বাদ্‌শাহের সহিত শত্রুতায় পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। জুঝার সিংহের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি অর্ধমৃত হইলেন। এ অপরাধের জন্য ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা লাভ করিতে হইবে, হয়ত মন্দিরগুলি নিজ খরচায় ভাঙিতে হইবে—যাহারা ধর্মরক্ষার জন্য ফিদাই খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্রাটের নির্দেশমত শাস্তি দিতে হইবে। গোঁয়ার বুন্দেলাগণের এ হঠকারিতায় রাজার পশ্চাৎ অপসরণের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দায়ে পড়িয়া বুন্দেলখণ্ডের গৌরব ও হিন্দুর মালা তিলক রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সুজান সিংহ শুনিলেন, ছত্রসাল মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বুন্দেলখণ্ডে যাইতেছেন। চম্পৎ রায়ের পুত্র তাঁহার পরিবারের শত্রু। কিন্তু পরের সহিত বিবাদে জ্ঞাতিশত্রুতা ভুলিয়া যাওয়াই মহত্ত্বের পরিচায়ক। ছত্রসাল সুজান সিংহের কাছে কিছু ভরসা পাইয়া ঔরঙ্গাবাদে বলদেব নামক বুন্দেলা-সর্দারের সহিত দেখা করিলেন। এখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি "ইসাবা" বা দেবাদেশ গ্রহণ করিয়া উভয়ে একত্র বুন্দেলখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে (১৭২৮ বিঃ সং*) বাইশ বৎসর বয়সে ছত্রসাল অখণ্ডপ্রতাপ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। অনেকদিন বেকার বসিয়া থাকায় তাঁহার হাতে কিছুই ছিল না। মাতা কালীকুমারীর অবশিষ্ট কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মাতৃভূমির দাসত্ব-মোচনের মূলধন সংগৃহীত হইল। পাঁচজন অশ্বারোহী এবং পঁচিশজন মাত্র পদাতিক অনুচর লইয়া তিনি যুদ্ধার্থে বাহির হইলেন। ছত্রপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে বিজোর বা বিজোরী নামক স্থানে ছত্রসালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রতন শাহ বাদ্‌শাহের প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন। ছত্রসাল তাঁহাকে আঠার দিন পর্যন্ত অনেক বুঝাইয়াও ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণে রাজী করাইতে পারিলেন না। কিন্তু এ সময়ে বাকী খাঁ বুন্দেলা নামক পাঠান দস্যুসর্দার আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ছত্রসালের দলে যোগ দিল। বাকী খাঁ দস্যু হইলেও মোগলের শত্রু এবং বুন্দেলখণ্ডের সন্তান। কোনো দেশে দেশভক্তের দলে সবই "কেটো", "ব্রুটাস্" হয় না। কার্যারম্ভের প্রথমে স্থির হইল, বুন্দেলখণ্ডের এই স্বদেশী দল লুটতরাজ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে মোগলপক্ষীয় জায়গীরদারগণকে উত্ত্যক্ত করিবে। তাহারা যদি

* ছত্রপ্রকাশ, পৃঃ ৭৯।

দলে যোগ দেয় কিংবা "চৌথ" (রাজস্ব) দিতে স্বীকৃত হয় তবেই অব্যাহতি পাইবে। সমস্ত দেশে লুটতরাজ আরম্ভ করিলে শত্রুরা প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইবে এবং দেশ নিজেদের হাতে আসিবে ও লোকেরা তাহাদের দলভুক্ত হইবে। এই ডাকাত-জয়েণ্ট-স্টক্ কোম্পানির লাভের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ছত্রসাল এবং পঁয়তাল্লিশ ভাগ দেওয়ান বলদেব পাইবেন—ইহাও কথাবার্তায় স্থির হইল। এই ভাবেই বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সমরের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত হইল।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কুমার ছত্রসাল ২২ বৎসর বয়সে মাত্র ৩৫ জন অশ্বারোহী ও ৩০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে নামিলেন। ১৬৭২—১৬৮০ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের দম ফেলিবার অবকাশ ছিল না। দাক্ষিণাত্যে শিবাজী, পঞ্জাবে তেগ বাহাদুর, বর্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খুশ্‌হাল খাঁ খাটক, দিল্লীর দরজায় সৎনামী সম্প্রদায়—সকলেই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের তুলনায় ছত্রসাল ক্ষুদ্র শত্রু বলিয়া উপেক্ষিত রহিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার ভার বুন্দেলখণ্ড ও মালবের স্থানীয় মোগল ফৌজদারগণের উপর পড়িল। সিরোঞ্জের ফৌজদার হাশিম খাঁকে পরাজিত করিয়া ছত্রসাল সমস্ত জেলা লুঠ করিলেন। ছত্রসালকে দমন করিতে আসিয়া ধামোনীর ফৌজদার খালিখ নিজেই ধরা পড়িল। কেশো রায় বুন্দেলা ছত্রসালকে চৌথ দিতে অস্বীকার করায় প্রাণ হারাইল। প্রতি যুদ্ধের পর ছত্রসালের সৈন্যবল দশগুণ বাড়িয়া চলিল। তাঁহার বড়ভাই রতন সাহ—যিনি এযাবৎ ছত্রসালকে "লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ" বলিয়া কৃপা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তিনি এবং আরও দু-একজন বাদশাহী মনসবদার ছাড়িয়া এ দলে যোগ দিলেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ধামোনীর ফৌজদার রণদৌলা খাঁ (রুহুল্লা ?) এবং যশোবন্ত সিংহ বুন্দেলা ছত্রসালকে দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। প্রাকার-বেষ্টিত শহর ও প্রধান দুর্গগুলি ছাড়া বুন্দেলখণ্ড ও মালবের কিয়দংশে মোগলশাসন একেবারে লোপ পাইল।

এই বৎসর সম্রাট ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর প্রবর্তন করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন। মন্দিরধ্বংস, হিন্দু ব্যবসায়ীর উপর দ্বিগুণ বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য (শতকরা ৫৲), হিন্দু দেওয়ান ও পেশকারদের শতকরা ৫০ জনের পদচ্যুতি ও তাহাদের স্থানে মুসলমান নিয়োগ ইত্যাদি ব্যবস্থার পর এই মুণ্ড-কর হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়াইয়া দিল। মিবারের রাণা হইতে দরিদ্র কৃষক পর্যন্ত কেহই এ কর দান হইতে অব্যাহতি পাইল না। বাদশা হিন্দুদিগকে "হাতে ও ভাতে" মারিবার যোগাড় করিতেছেন দেখিয়া তাহারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিদ্রোহীদের সহায়তা করিতে

লাগিল। যাহারা মুণ্ড-কর দিতে পারিল না তাহারা মুসলমান হইয়া গেল; যাহারা গোঁয়ার (যথা—মালবের রাজপুত ইত্যাদি) তাহারা জিজিয়া-আদায়কারী নিরপরাধ কাজীদের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িয়া লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হিন্দুস্থান হইতে শেষ বিদায় লইয়া দাক্ষিণাত্য বিজয়ে চলিলেন। চোরাবালিতে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে লোকের যে অবস্থা হয়, ঔরঙ্গজেবেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল। মারাঠা, আদিল শাহ ও কুতব শাহর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি এতই ব্যস্ত রহিলেন যে, ছত্রসালের বিরুদ্ধে কোন বৃহৎ অভিযান পাঠাইবার সুবিধা পাইলেন না। পূর্ববৎ মালবের ফৌজদার তাঁহাকে বাধা দিবার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতে লাগিল। শের আফ্‌গন খাঁ নামক রানোডের ফৌজদার ছত্রসালকে ১৬৯৯ এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে দুইবার সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং গাগরোণ পরগণা অধিকার করেন। গৃহভেদই বোধ হয় ছত্রসালের পরাজয়ের কারণ; এ সময় ছত্রমুকট বুন্দেলা নামক সর্দার তাঁহার দল ছাড়িয়া মোগলদের সঙ্গে যোগ দেন। ছত্রসাল সাময়িক ভাগ্য-বিপর্যয়ে নিরুৎসাহ হইলেন না। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ধামোনীর ফৌজদার খায়ের আন্দেশ খাঁ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। এই সময়ে গন্দোয়ানায় দেবগড়ের রাজা বখ্‌ত বুলন্দ গন্দ বিদ্রোহী হওয়ায় ছত্রসালের শক্তি আরও বাড়িয়া গেল। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে ছত্রসাল মারাঠা সেনাপতি নীমা সিন্ধিয়াকে নর্মদা পার হইয়া মালব আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব প্রসিদ্ধ তুরানী সেনাপতি ফিরোজ জঙ্গকে মালব ও বুন্দেলখণ্ডে প্রেরণ করিলেন। ফিরোজ জঙ্গ নীমা সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন; কিন্তু ছত্রসালের ক্ষমতা সুদৃঢ় দেখিয়া তাঁহার সহিত একটা আপোস করিবার জন্য বাদ্‌শাহকে অনুরোধ করিলেন। ফিরোজ জঙ্গের মধ্যস্থতায় ছত্রসাল ৪-হাজারী মন্‌সব পাইয়া ঔরঙ্গজেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। মন্‌সবের লোভে তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন নাই; ৩৩ বৎসর যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। ছত্রসাল বুঝিয়াছিলেন, মোগল সাম্রাজ্যের নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে এবং সম্রাটের জীবন-প্রদীপও নির্বাণোন্মুখ; সুতরাং ভাবী সংঘর্ষ ও বিপ্লবের জন্য বলসঞ্চয় আবশ্যক।

শিবাজী, শম্ভুজী, রাজারাম মরিলেন, শাহু ধৃত হইল, সাতারা পান্‌হালা সিংহগড়ে মোগলের বিজয় পতাকা উড়িল, মহারাষ্ট্রভূমি তৃণবৃক্ষশূন্য শবাস্থি-শুভ্র শ্মশানে পরিণত হইল; তবুও মারাঠা জাতি মরিল না। বরং তাহারা এখন বৃদ্ধ সম্রাটকে জগতের অন্নদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে লাগিল, এবং প্রতি সপ্তাহে

বাদশাহী রাজ্যলুটের কিয়দংশ তাঁহার মঙ্গলার্থ মিষ্টান্ন বিতরণ ও কাঙ্গালী-ভোজনে ব্যয় করিত। কেননা লুটের বাজার যখন একটু নরম পড়িয়াছিল, তখন তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করিয়া তাহাদের বিচরণক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত ও নিরাপদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরোক্ষভাবে তিনি মারাঠা জাতির জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রের বাহিরে মালব ও গুজরাটে বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের সন্ধান দিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পরে পেশবা বাজীরাও মহারাষ্ট্র-স্বরাজের ভিত্তি প্রসার করিয়া আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুপৎ পাদশাহী স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। যাঁহারা এ কার্যে বাজীরাওয়ের সহায়ক হইয়াছিলেন, মহারাজা ছত্রসাল তাঁহাদের অন্যতম।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ছত্রসাল দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মোগল দরবারের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। লালকবি লিখিয়াছেন, শিখদের লোহাগড-দুর্গ বিজয়ে সহায়তা করিবার পুরস্কার-স্বরূপ সম্রাট্ ছত্রসালকে মনসব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায়, ছত্রসাল বলিয়াছিলেন —"জাহাপনা। আমি বার্ষিক দু কোটি টাকা আয়ের ভূমির অধিকারী; ইহা ছাড়া গুরু প্রাণনাথজীর কৃপায় পান্নার খনি পাইয়াছি। যিনি দুনিয়ার মালিক আমি তাঁহার মন্‌সবদার, বাদশাহী মন্‌সবে আমার প্রয়োজন নাই।" ইহা কবি-হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র, ঐতিহাসিক সত্য নয়। সম্রাট ফরুখশিয়ারের রাজত্বকালে ছত্রসাল সৈয়দভ্রাতাদের স্বপক্ষে যোগ দিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ৬-হাজারী মন্‌সবদারের পদে উন্নীত হইলেন। সেকালে হয় মোগল সম্রাটের কর্মচারী, কিংবা মূর্ধাভিষিক্ত স্বাধীন রাজা ব্যতীত অন্য কেহ ন্যায়ত প্রজাশাসনের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। যে কারণে কোম্পানী বাহাদুর সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াও তাঁহাদের আশ্রিত দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে এলাহাবাদের চায়ের টেবিলের উপর বসাইয়া সসম্মে তাঁহার হাত হইতে সুবাত্রয়ের দেওয়ানী সনন্দ লইয়াছিলেন, ঠিক সেই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর কার্যত স্বাধীন রাজা, মহারাজা, নবাব, নিজাম ইত্যাদি—যাঁহারা তলোয়ারের জোরে ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন—মোগল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা অপমানজনক মনে করিতেন না।

সম্রাট ফরুখশিয়ারের রাজত্বকালে সৈয়দভ্রাতাদ্বয়ের পরিচালনায় দিল্লী সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল। স্ব স্ব প্রধান রাজা ও নবাবগণ প্রমাদ গণিলেন।

রাজা ছত্রসাল বুন্দেলা, বুন্দীরাজ বুধসিংহ হাডা, গোহডের জাট (ধোলপুর রাজবংশ), এবং মালবের ক্ষুদ্র জমিদারগণ এক মণ্ডলী গড়িয়া মুসলমান প্রাধান্য খর্ব করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মহম্মদ শাহের রাজ্যারোহণের পর ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের হিন্দু সুবেদার ছাবিলারাম নাগরের ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধর বাহাদুর বিদ্রোহী হইলে এই হিন্দুমণ্ডলী তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে ছত্রসাল ৩০ হাজার সৈন্যসহ কাল্পী আক্রমণ করেন এবং এলাহাবাদের নূতন সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গশের প্রতিনিধি দিলীর খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সমস্ত বাঘেলখণ্ড এবং সুবা পাটনার প্রান্ত পর্যন্ত দখল করিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সুযোগ্য পাঠান সেনাপতি বহু রোহিলা সৈন্য লইয়া বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন।

মহম্মদ খাঁর পুত্র কায়েম খাঁ বান্দা জিলা এবং স্বয়ং মহম্মদ খাঁ মহোবার নিকটবর্তী স্থানসমূহ অধিকার করিলেন।

মহোবার ২০ মাইল পশ্চিমে জৈতপুরের নিকটবর্তী পাহাড়ে ছত্রসাল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। গোহদের জাঠেরা তাহাদের তোপখানা লইয়া ছত্রসালের সাহায্যার্থ আসিল। জৈতপুরের ৪০ মাইল দূরে প্রথম যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ছত্রসাল পরাজিত হইয়া জৈতগড়ের পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল এখানে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ৩৫ হাজার সৈন্য ও তোপখানা লইয়া ছত্রসাল অতর্কিতভাবে পাঠান সৈন্যকে আক্রমণ করেন। বুন্দেলা সৈন্য পাঠান-ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ পরাজিত করিয়া শত্রুপক্ষের তাঁবু ও আসবাব লুটিয়া লইতে লাগিল। এদিকে মহম্মদ খাঁর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল।

আশী বৎসরেও বৃদ্ধ ছত্রসাল যৌবনের রণোন্মাদনায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতী দুইটি তীরবিদ্ধ হওয়ায় অসংযত হইয়া পলাইয়া গেল। মহম্মদ খাঁর পরাজয় জয়ে পরিণত হইল।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জৈতপুর দুর্গ পাঠানেরা অধিকার করিল। ছত্রসাল সন্ধি প্রার্থনা করিয়া মহম্মদ খাঁকে ৪০ লক্ষ টাকা কর-স্বরূপ দিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রহিল। দিল্লীতে গুজব উঠিল, ছত্রসালের সাহায্যে পাঠানেরা তৈমুর-বংশকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে। ছত্রসাল দিল্লীর দরবারে মহম্মদ খাঁর শত্রুপক্ষীয় মনোভাব জানিয়া যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইলেন। অযোধ্যার নবাব সাদত খাঁও বুন্দেলাদিগকে অনেক ভরসা দিলেন। ছত্রসাল এ

সময়ে পেশবা বাজীরাওয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন; সন্ধির প্রস্তাব শত্রুকে প্রতারিত করিবার সময়লাভের কৌশলমাত্র। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া জৈতপুরের নিকটবর্তী পাঠান-শিবির অবরোধ করিলেন। মহম্মদ খাঁর পুত্র বান্দা জেলা হইতে জৈতপুরের ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে সুপা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। মারাঠা ও বুন্দেলা সৈন্যের অধিকাংশই কায়েম খাঁকে বাধা দিবার জন্য চলিয়া গেল। এই সুযোগে পাঠানেরা শিবির হইতে বাহির হইয়া জৈতপুর দুর্গে আশ্রয় লইল। চারি মাস ধরিয়া মহম্মদ খাঁ অসীম বীরত্ব ও ধৈর্যের সহিত আত্মরক্ষা করিলেন। মনুষ্য ছাড়া অন্য প্রাণী সমস্তই নিঃশেষে ভক্ষিত হইল, দুর্গবাসীরা অনাহারে মরিতে লাগিল। মহম্মদ খাঁ সাহায্যের জন্য ওমরাহগণ ও বাদশাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। খান্ দৌরাণ সমসাম-উদ্দৌলা জৈতপুর যাইবেন বলিয়া মহা আড়ম্বরে দিল্লীর বাহিরে তাঁবু ফেলিলেন। অথচ গোপনে ছত্রসালকে লিখিলেন—মহম্মদ খাঁর মাথাটি বাদশাহের কাছে পাঠাইয়া দিলে বহু ইনাম মিলিবে, শত্রুকে হাতে পাইয়া ছাড়িলে ভাল হইবে না। তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহকেও বুঝাইয়া দিলেন, পাঠান সেনাপতি যুদ্ধে জিতিলে ভবিষ্যতে শাহী তখতের উপর নজর ফেলিবে। ছত্রসাল চালবাজীতে খান-দৌরাণ প্রমুখ দরবারীদিগকে মাত করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, মহম্মদ খাঁ বাঁচিয়া থাকিলে খান-দৌরাণের পাল্লা ভারী হইতে পারিবে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে শত্রুতাও নাই, বন্ধুত্বও নাই। মহম্মদ খাঁ কখনও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিবেন না কিংবা কোন কর দাবি করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতিমাত্র লইয়া ছত্রসাল সসম্মানে তাঁহাকে জৈতপুর ত্যাগ করিতে দিলেন। কয়েক দিন পরে কায়েম খাঁ নূতন ফৌজ লইয়া যমুনা পার হইলেন, কিন্তু পাঠান সেনাপতি পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মহারাজ ছত্রসাল পেশবা বাজীরাওকে নিজ রাজধানী পান্না নগরে আমন্ত্রিত করিয়া অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পেশবার হিন্দুপৎ পাদ্‌শাহীর স্বপ্ন সফল হইল। আজীবন যুদ্ধ করিয়া ছত্রসাল যে বুন্দেলখণ্ডে মুসলমান শাসন ধ্বংস করিয়াছিলেন, বাজীরাও সাহায্যার্থ না আসিলে কালে উহা রোহিলখণ্ডের ন্যায় পাঠান উপনিবেশে পরিণত হইত। দেশের ও ধর্মের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি বাজীরাওকে জ্যেষ্ঠপুত্র-রূপে গ্রহণ করিলেন এবং রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ তাঁহার নামে লিখিয়া দিলেন। এরূপ ত্যাগ ও দূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। অনেকে মনে করেন, ইহা "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" নীতিমাত্র,—

স্বেচ্ছায় না দিলে পেশবা বাজীরাও কাড়িয়া লইবার শক্তি রাখিতেন। পেশবা বলপূর্বক ছত্রসালের রাজ্যগ্রহণ করিলে উহা উভয়ের পক্ষে অযশস্কর হইত।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী যেমন কর্মজীবনে গুরু রামদাসকে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন, মহারাজ ছত্রসালও তেমনি জীবন-সংগ্রামের সঙ্কটপূর্ণ সময়ে মহাত্মা প্রাণনাথজীকে একাধারে গুরু ও মন্ত্রীরূপে পাইয়াছিলেন। কৃতকার্যতার জন্য শিবাজী রামদাস স্বামীর কাছে যে পরিমাণ ঋণী, ছত্রসালও তদ্রূপ প্রাণনাথজীর কাছে ঋণী। প্রাণনাথজীর জন্মস্থান কাথিয়াবাড় প্রদেশের জামনগর। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম মেহরাজ বা মেঘরাজ। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাথিয়াবাড় ও সিন্ধুদেশে কাটাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপদেশ-গ্রন্থের নাম "কুলজম স্বরূপ।" 'কুলজম' আরবী শব্দ—ইহার অর্থ সমুদ্র। এই গ্রন্থে আরবী ও সিন্ধী শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। প্রাণনাথ নানক-পন্থী না হইলেও গুরু নানকের মতের সহিত তাঁহার উপদেশ ও ভাবের অনেকটা মিল আছে। গুরু নানকের ন্যায় ইনিও আধ্যাত্মিক-রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সামঞ্জস্য, এবং ব্যবহারিক জগতে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণনাথজী নিজেকে কৃষ্ণ, মহম্মদ ও যিশু-খৃষ্টের সমন্বয় যুগাবতার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কখন বুন্দেলখণ্ডে আসিয়াছিলেন এবং কোন্ সময় মহারাজ ছত্রসাল তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন তাহা সঠিক বলা যায় না। জনপ্রবাদ, পান্নার হীরকখনির সন্ধান প্রাণনাথজীই সর্বপ্রথম ছত্রসালকে দিয়াছিলেন। কথিত আছে, পান্নার ধর্মসাগর হ্রদের তীরে "মন্দারতুঙ্গ" নামক পাহাড়ের পাদভূমিতে এক শিলাখণ্ডের উপর বসাইয়া প্রাণনাথজী ছত্রসালের কপালে "রাজটিকা" পরাইয়া দিয়াছিলেন এবং কোমরে তরবারি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ ছত্রসালের বংশধর পান্না-নরেশ বিজয়া দশমীর দিন এখানে আসিয়া সেই অস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন, সর্বপ্রথমে এস্থানে প্রাণনাথজীর নামে পানের বিড়া উৎসর্গ করা হয়, এবং এইস্থান হইতেই বিজয়া দশমীর "সিন্দূর যাত্রা" আরম্ভ হয়।

মহারাজ ছত্রসাল প্রাণনাথজীর কাছে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিতার একছত্রে নিজেকে "ব্রহ্ম-রস-রত্তা, এক কায়েম ঠিকানে কা," অর্থাৎ ব্রহ্ম-রস-মগ্ন নিত্যধামবাসী বলিয়াছেন। প্রাণনাথজীর শিষ্যেরা নিজেদের "ধামী" বলিয়া পরিচয় দেয়। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা অনন্যাজু ছত্রসালের জ্ঞান-পরীক্ষার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তরে মহারাজ লিখিতেছেন :—

ছো অনন্য, নহি অন্য কোউ, অচ্ছর ছতা অনন্য
ইক রস মে বস মানিবী, আর কীজিবী ধন্য।

—হে অনন্ত! "অন্য" (সুফীদের "বিগানা" অর্থাৎ পর) কেহই নয়; অক্ষর (ওঁ), ছত্তা ও অনন্ত (অর্থাৎ আমি ও আপনি) এক। এই (একত্ব-জ্ঞান-জনিত) রসকেই প্রকৃত রস জ্ঞান করিয়া আমাকে দর্শন দিয়া ধন্য করিবেন।

ছত্রসালের এই একেশ্বরবাদ কবীর ও একনাথের একেশ্বরবাদের ন্যায় সাকার। উপাসনা ও অবতারবাদ বিরোধী নহে।

ইতিহাস ও জাতীয়তার দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি, রামদাস ও প্রাণনাথজীর নিকট ভারতবর্ষ কত বেশী ঋণী। নির্যাতিত হিন্দুধর্ম রক্ষাকল্পে মোগল সাম্রাজ্যের কালাগ্নি-স্বরূপ যে অসি কোষমুক্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা মন্ত্রবলে সংযত করিয়া মহারাষ্ট্র ও বুন্দেলখণ্ডে কোরাণ ও মস্‌জিদ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শত্রুভীত পদদলিত ভারতের ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন না। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা স্পেনের খৃষ্টান পাদরীর মত জিহাদের বিষ ঢালিয়া মুসলমানকে ধ্বংস কিংবা নির্বাসিত করিবার জন্য হিন্দুজাতিকে উত্তেজিত করিতে পারিতেন। শিবাজী ও ছত্রসাল অবাধে বালকবৃদ্ধ-নির্বিশেষে নিরপরাধ স্বদেশবাসী মুসলমানের রক্তে তাঁহাদের তরবারি কলঙ্কিত করিয়া সাক্ষাৎ কল্কিঅবতার হইতে পারিতেন।

যেখানে ক্ষাত্রশক্তি এরূপ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সুসংযত হয় নাই, সেখানে হিন্দুরা দানবলীলা প্রকট করিয়াছে। রাজারাম জাঠ আকবর বাদশাহের কবর খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, এবং তাজমহল ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল। ভরতপুর-রাজ সুরজমলের পুত্র জবাহির সিংহ আগ্রার জুম্মা মসজিদে বাজার বসাইয়াছিল। শিখেরা সরহিন্দ শহরে মুসলমানদের কত্‌লে আম করিয়াছিল। শিবাজী ও ছত্রসাল মুসলমান-শাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নাই বা মুসলমানমাত্রকে সবংশে নিধন করিবার সঙ্কল্প করেন নাই।

১৭৩১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে ছত্রসালের দেহান্ত হয়। তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা, চতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সুশাসক ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি প্রজাদিগকে পালন করিতেন। ব্যক্তিগত বিরোধকে তিনি জাতিগত বিবাদ করিয়া তোলেন নাই। তিনি সেকালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেতু-স্বরূপ হইয়া জাতীয় ভাবের পুষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা আজও পান্না প্রভৃতি বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন।

মহারাণা রাজসিংহ

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মহারাণা রাজসিংহ সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঔপন্যাসিক; আমি ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু; উভয় দলের মধ্যে বিরোধ শাশ্বত হইলেও তাঁহার অনুপম কল্পনা-সৌধের ভিত্তি-খনন আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস-লেখক আপন মনে পুতুল গড়েন, তাঁহার সৃষ্টি নিত্যনূতন। ঐতিহাসিক নূতন কিছু বলিতে বা গড়িতে পারেন না; তিনি সমাজের বার্তাবহ, সত্যের ধর্মাধিকরণে বিচারক। ইতিহাস অনেক অপ্রিয় কথা শুনায়। নীতিবিদের "সত্যং নানৃতং ব্রুয়াৎ" বাক্য উপেক্ষা করিলে যে বিপদ তাঁহাকে তাহাই সর্বাগ্রে বরণ করিয়া লইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন, তিনি ইতিহাস-বিচার করেন নাই—তিনি গল্প-লেখক; সুতরাং ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ না করিবার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পত্নী-স্থানীয়া উদীপুরী বেগমকে দিয়া রাজপুতনীর তামাক সাজাইয়াছেন, এজন্য প্রবুদ্ধ মুসলমান-সমাজ তাঁহার উপর রুষ্ট; মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ অনেক মুসলমান পড়িতে চান্ না; অনেকে উত্তেজনার আতিশয্যে পাল্টা জবাব লিখিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য জিনিসের মত বিলাত হইতে নায়ক-নায়িকা আমদানি না করিলে উপন্যাস-লেখকও নিরাপদ নন। ইতিহাস-চর্চা আরও বিপজ্জনক; ইহাতে কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছায়াপাত দেখেন।

ইতিহাস-বিচারে সর্বপ্রথম প্রমাণ-পঞ্জী আলোচনা আবশ্যক। রাজসিংহ-উপাখ্যানের মৌলিক উপাদানগুলি, অর্থাৎ সমসাময়িক বিবরণ-সমূহ, সরকারী ও বেসরকারী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, মোগল-দরবারের সরকারী ইতিহাস, ওয়ারিস লিখিত পাদ্‌শানামা, মির্জামহম্মদ কাজিম কৃত আদাব-ই আলমগিরি, এবং সম্রাট্ শাহ্ আলমের সময়ে সাকী মুস্তায়িদ খাঁ লিখিত মাসির-ই-আলমগিরি। রাজপুতানায় চারণ এবং কবিই ঐতিহাসিক; এই হিসাবে রাজসিংহের সভাকবি "মান" বিরচিত 'রাজবিলাস' কাব্যই তাঁহার রাজত্বের সরকারী ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বে-সরকারী ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরদাস নাগর কৃত ফতুহাৎ-ই-আলমগিরি এবং ম্যানুসীর *Storia do Mogor* উল্লেখযোগ্য।

সরকারী ইতিহাসের যাহা কিছু দোষগুণ, অর্থাৎ ঘটনার সন তারিখ ও বর্ণনার প্রাচুর্য, পরাজয়-গোপন, কৃতিত্বের অতিরঞ্জন ও চাটুবাদ মোগল-দরবারের ইতিহাসে থাকিবে —ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। দরবারী ইতিহাসের এই সব দোষ মহারাণার জীবনচরিত রাজবিলাসেও আছে; কিন্তু গুণ অনেকগুলি নাই। চিতোর-দুর্গ সংস্কার করার অপরাধে সাদুল্লা খাঁর সেনাপতিত্বে মহারাণার বিরুদ্ধে মোগল-অভিযান, দারা শুকোর কাছে মহারাণার দূত-প্রেরণ, শাহজাদার মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের শান্তিস্থাপন, সম্রাট শাহজাহানের আদেশে সাদুল্লা কর্তৃক চিতোরের দুর্গপ্রাকার ধ্বংস ইত্যাদি কাহিনী রাজবিলাসে নাই; ওয়ারিসের পাদ্‌শানামায় এইসব ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মহারাণা কর্তৃক মালপুরা ধ্বংস এবং রূপকুমারীর স্বয়ংবরের কথা একমাত্র মান কবিই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাদ্‌শানামায় ইহার উল্লেখ না থাকিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। রূপকুমারীকে ঔরঙ্গজেব বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে, তবে রাঠোর-দুহিতা যে রাজসিংহকে বরণ করিয়াছিলেন, ইহা কবি-কল্পনা হইতে পারে না। কবি "মান" সরস্বতী-বিনয়ে দুই স্থলে তাঁহার কাব্যরচনার সময়-নির্দেশ করিয়াছেন—১৭৩৪ সংবতের (১৬৭৮ খৃঃ)। আষাঢ় মাস, বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথি, অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মিবার আক্রমণের ঠিক এক বৎসর পূর্বে। •বহুস্থলে পরবর্তী সময়ের "প্রক্ষেপ" থাকিলেও রাজসিংহের মৃত্যুর পর "রাজবিলাস" রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা ভ্রমাত্মক; কেননা, হিন্দী কাব্যের রীতি অনুসারে কবি দেবতা-স্তুতির পর রাজবন্দনা স্থলেও রাজসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন; পরবর্তী রাণা জয়সিংহ কিংবা অন্য কাহারও রাজত্বে এ কাব্য রচিত হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থারম্ভে রাজবন্দনায় সমসাময়িক অন্য মিবার-নৃপতির প্রশংসা থাকিত। কবি মান বলিতেছেন—

সব হিন্দবান কুল রবি সমান
রাজন্ত রাজ শ্রী রাজরাণ।
ইক লিঙ্গ রূপ মেবার ইশ,
যাচক-জন-মন-পূরণ জগীশ॥

রাজবিলাসে রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। কোন কোন বিষয়, যথা মন্ত্রী দয়াল-সাহর মালব-লুট ইত্যাদি যাহা রাজসিংহের মৃত্যুর পরে ঘটিয়াছিল, রাজবিলাসে তাহার সন্নিবেশ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়। মহারাণার মৃত্যুর বিবরণ রাজবিলাসে নাই; তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু অশুভ বিবেচনা

করিয়াই কবি বোধ হয় 'রাজবিলাস' অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজস্থানী কবির প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনা হিসাবে ইতিহাসের দিক্ দিয়া এ কাব্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সমসাময়িক রাজপুত-সমাজ, রাঠোর, কচ্ছবাহ, শিশোদিয়ার পরস্পর বিদ্বেষ, মহারাণার সৈন্যবল, এবং সামন্তগণের বীর্যবত্তার কাহিনী এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দু'এক স্থলে ঘটনার তারিখের গোল, অথবা রাজকুমার আকবরের অধীনস্থ সৈন্যবলের সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল ও অতিরঞ্জনের অজুহাতে রাজবিলাসকে ইতিহাসের পর্যায়ে না ফেলা যুক্তিবিরুদ্ধ। এই কাব্য অবলম্বন করিয়াই টড সাহেব রাজসিংহ উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি অনেক জায়গায় এমন সব ভুল করিয়াছেন যাহার জন্য রাজবিলাসকে দোষ দেওয়া চলে না। স্যর যদুনাথ তাঁহার আওরংজীবের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৩৭৮) সুনিপুণভাবে টডের গ্রন্থের বিস্তর সমালোচনা করিয়াছেন।

বে-সরকারী ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরদাস নাগর কৃত ফতুহাৎ-ই-আলমগিরিতেই মোগল-রাজপুত যুদ্ধের নিরপেক্ষ ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। লেখক হিন্দু হইলেও মুসলমান ভাবাপন্ন এবং মোগল-দরবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর, শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব দোষ কাটিয়া গিয়াছিল। এমন কি, স্থানে স্থানে তিনি অনেক মুসলমান-লেখক অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে স্বজাতি-নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, রাজসিংহের সহিত তাঁহার অহেতুকী শত্রুতা বা প্রীতি কিছুই ছিল না। সুতরাং তিনি যে রাজসিংহের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। ম্যানুসীর *Storia do Mogor* গ্রন্থের কিয়দংশ শাহ্‌জাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে বে-সরকারী ইতিহাস। হিন্দু-মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলে সম-সাময়িক ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী ও ভাগ্যান্বেষীদের সাক্ষ্যই নিরপেক্ষ বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ম্যানুসী বিদেশী হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক নহেন। বিলাতী সাহেব দেশী হইয়া গেলে যেমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গুণ-বর্জিত হইয়া উভয়ের দোষরাশির সমন্বয় হইয়া পড়েন, দীর্ঘকাল মোগলাই আব্‌হাওয়ায় বাস করার ফলে তিনিও অনেকটা সেই রকমই হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাদশাহী গল্পগুচ্ছ ইতিহাস হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা ও বিচারের প্রয়োজন। তিনি প্রথম বয়সে দারা শুকোর চাকরি করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজ্যারোহণের পর মোগল-সরকারে চাকরি স্বীকার করিলেও সম্রাটের প্রতি তাঁহার পূর্ববিদ্বেষ দূর হয় নাই; এইজন্য মনে হয়, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে

বহুবিধ মিথ্যা আজগুবি গল্প ইতিহাসের নামে চালাইয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের দুইটি প্রধান দোষ—বিশ্বাস-প্রবণতা ও বিচার-মূঢ়তা, ম্যানুসীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। প্রাচ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত কল্পিত ও মানব-বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার ইয়োরোপে তাহাই ঐতিহাসিক মহাসত্য বলিয়া সমাদৃত হয়; সেইজন্য বোধ হয় যাহা কোনদিন ভূভারতে ছিল না অথবা যাহা লোপ পাইয়াছে তাহাই ম্যানুসীতে পাওয়া যায়। আজকালকার মত বাদ্‌শাহী আমলেও "গুপ্তকথার" চানাচুর ও রাজনিন্দার চাটনী দিল্লী-আগ্রার অলি-গলিতে এবং সময় সময় চকেও প্রকাশ্যভাবে বিক্রী হইত; আমীরি মজলিসেও এগুলির চাহিদা ছিল। বেগমমহলের কলঙ্ককাহিনী, রাজসিংহের সহিত যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের লাঞ্ছনা ও উদীপুরী বেগমের দুর্গতি এই জাতীয় বস্তু। এরকম জিনিসের বেশ কাটতি হইবে বুঝিয়া ম্যানুসী বে-পরোয়াভাবে হিন্দুস্থানের বাজার-গুজবে কিঞ্চিৎ মসলা-সংযোগ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাতে চালান দিয়াছিলেন, একশত বৎসর পরে সাহেবেরা উহাই আবার এদেশে আমদানি করেন। বিংশ শতাব্দীতেও বিলাতী-ছাপ দেখিলেই জিনিসের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়, বঙ্কিম যুগে আদৌ সন্দেহই হইত না; কাজেই ঐরকম গুপ্ত কথা ও গুজব এদেশে ইতিহাস বলিয়া অবাধে প্রচারিত হইয়াছে।

১৭৮৬ বিক্রম সংবতের কার্তিক মাস কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে বুধবার রাত্রে রাঠোর-রাজকুমারী রাণী জনা দেবীর গর্ভে মহারাণা জগৎসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজসিংহের জন্ম হয়। দ্বিতীয় দিন দৈবজ্ঞের জন্ম-পত্রিকা গণনা, ষষ্ঠী-বাসর জাগরণ, একাদশ দিবসে রাণীর শুচিস্নান ও দ্বাদশ দিবসে প্রীতিভোজ—কবি যথারীতি বর্ণনা করিয়াছেন। জন্ম ও বিবাহের মধ্যবর্তী এগারো বারো বৎসরে রাজকুমারের বাল্যজীবনে উল্লেখ-যোগ্য কিছু ঘটে নাই। তাঁহার শিক্ষায়ও কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মোগল-বিদ্বেষ তাঁহার জন্মগত ভাব কিংবা শিক্ষার ফল নহে। শিশোদিয়া ও মোগল-রাজ পরিবারের সহিত কোনরূপ বিবাহ-সম্বন্ধ না থাকিলেও সখ্য ও কৃতজ্ঞতার বন্ধন তখনও অটুট ছিল। মিবার-বিজেতা যুবরাজ খুরম্ কুমার কর্ণকে পাগড়ী-বদল করিয়া ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই এ সময় দিল্লীশ্বর শাহজাহান, কর্ণের পুত্র জগৎ সিংহ ধর্ম-সম্পর্কে তাঁহার ভাইপো। মিবার-রাণা মোগল-সরকারের নামমাত্র পাঁচ-হাজারী মনসব্‌দার হইলেও সন্ধির শর্তানুসারে তাঁহাকে স্বয়ং বাদশাহী দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত না। মিবার-সৈন্য কোন

সর্দার বা রাজ-পরিবারের কোন ব্যক্তির অধীনে সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করিত। মুসলমানদের সহিত মিবারের বিশেষ সম্পর্ক না থাকাতে উহা যোধপুর অম্বরের মত অশনে [নিষিদ্ধ বস্তু ব্যতীত], বসনে, সভ্যতায় ও আচার-ব্যবহারে "মোগলাই" হইয়া পড়ে নাই। শিশোদিয়ার রাজচ্ছত্র-ছায়ায় তুর্কী-তেজ কিঞ্চিত স্তিমিত ছিল; মহারাণা তখনও হিন্দুপতি; মিবার উত্তর-ভারতে সনাতন আর্য-সভ্যতা ও হিন্দু-ধর্মের আশ্রয়স্থল। কুমার রাজসিংহ সনাতন হিন্দুভাবের মধ্যে বর্ধিত, তিনি কখনও বাদশাহী দরবারে কুর্ণিশ করিতে যান নাই; সুতরাং সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য ও সৈন্যদল তাঁহাকে চমকিত বা ভীত করিতে পারে নাই। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মোগলের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর বিধ্বস্ত মিবারভূমি শস্য-সম্পদ ও পশুযূথে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া আবার পূর্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত এবং রাজকোষ ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। মিবারের বুকে অর্ধশতাব্দীব্যাপী রণচণ্ডীর তাণ্ডব-লীলার চিহ্ন অপনয়নে মহারাণা জগৎসিংহ এই নবসঞ্চিত ধন অকাতরে ব্যয় করিলেন। কুমার রাজসিংহ ও তাঁহার সমবয়সী সর্দারপুত্রেরা দুর্দিনের সে ভয়াবহ স্মৃতি-চিহ্ন শুধু পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরেই দেখিতে পাইতেন; কেননা, ইহার সংস্কার ও দৃঢ়ীকরণ সন্ধির শর্তানুসারে নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধক্লান্তি অপনয়নের পর বীরজাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা ও রণোন্মাদনা ফিরিয়া আসে; নববলে বলীয়ান্ শিশোদিয়া-হৃদয়েও মোগলের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনা-বীজ আবার অঙ্কুরিত হইল। চারণের গীত একাধারে রাজপুতানার ইতিহাস, কাব্য ও সঙ্গীত, মাড়বারের মরুভূমি ও আরাবল্লীর গিরি-কন্দরে তখনকার রাজপুত বালকের মনোবৃত্তি চারণ-গীতিদ্বারা গঠিত হইত। চারণ দুঃখ, দৈন্য ও নিরাশার গীত গায় না; তাহার গান রক্তরাগোজ্জ্বল মৃতসঞ্জীবনী সুরা; তাহার অগ্নিবীণায় অগ্নি ও অসির ভৈরবী তান ও বীরের রৌদ্রসাধনার সুর বাজিয়া উঠে। রাজসিংহ রাণা প্রতাপের কীর্তি-লতার শেষ প্রসূন; রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার মুহূর্তোজ্জ্বল আরক্তিম আভা।

বুন্দীপতি রাও ছত্রসাল হাড়ার এক কন্যার সহিত কুমার রাজসিংহের প্রথম বিবাহ হয়। তাঁহার দুই কন্যার সম্বন্ধ একই সময়ে কুমার রাজসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের সহিত স্থির হইয়াছিল; এবং একই দিনে মিবার ও মারবাড়ের বর-পক্ষ বুন্দীতে উপস্থিত হন। কোন্ রাজকুমার প্রথমে বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিবে এই লইয়া উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাধিল। কোনো পক্ষই পশ্চাদপদ হইবার নহে; ক্রুদ্ধ সিংহশাবকদ্বয় পরস্পরের প্রতি কুটিল দৃষ্টি হানিতে লাগিল। যশোবন্ত বলিয়া

উঠিলেন, "আমরা উদ্ধত রাঠোর; অনাদিকাল হইতে মূর্ধাভিষিক্ত রাজা; বিবাহ-তোরণে আমিই প্রথমে ভল্লাঘাত করিব।" কুমার রাজসিংহ বলিলেন, "বটে কামধ্বজ! তোমরা কোন্ দিন হইতে নৃপ-পদ বাচ্য হইলে? তোমরা অম্বরের পদানত; কন্যা-বিনিময়ে ভূমি রক্ষা করিয়াছ; এস! আজই পুরুষকারের পরীক্ষা হউক্।" শিশোদিয়া ও রাঠোরের তরবারি যুগপৎ কোষমুক্ত হইল; বুন্দীরাজ তখন যুদ্ধোদ্যত কুমারদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া যশোবন্তের হাত ধরিলেন। বৃদ্ধ হাড়া-নৃপতির বাক্যে উভয় পক্ষ নিরস্ত হইল। তিনি যশোবন্তকে বলিলেন, "কামধ্বজ কুমার! ইহার সহিত তোমার স্পর্ধা ও বিরোধ শোভা পায় না। ইহারা যুগে যুগে হিন্দুপতি আখ্যা সার্থক করিয়া আসিতেছেন।" কুমার রাজসিংহ প্রথমে "তোরণ বন্দনা" করিলেন; কিন্তু চতুর বুন্দীরাজ কনিষ্ঠ জামাতা যশোবন্তকে অধিক ধন ও যৌতুক দিয়া সংবর্ধনা করিলেন। রাজকুমারদ্বয় বন্ধুভাবে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর পরে যশোবন্ত রাজসিংহের এক ভগ্নীকে বিবাহ করেন; ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইল।

রাজবিলাসে রাজসিংহের রাজ্যারোহণের পূর্বে উদয়পুরের অগ্নিকোণে ঋতু-বিলাস নামক উদ্যান-নির্মাণের উল্লেখ আছে। ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বের পর মহারাণা জগৎসিংহ পরলোকগমন করেন। তেইশ বৎসর বয়সে ১৬৫৩, ২৮এ মার্চ* খৃষ্টাব্দে রাজসিংহ গদিতে বসিলেন; তাঁহার কাছে যথারীতি বাদশাহী "খেলাত" (পোশাক, এবং উপহার ইত্যাদি) প্রেরিত হইল। কিন্তু রাজ্যারোহণের কয়েক মাস পরেই মোগল-সম্রাটের সহিত মহারাণার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা গেল। অমরসিংহ কর্তৃক সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া রাজসিংহ চিতোর-দুর্গের প্রাকারাদি সংস্কার করিয়া দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝা যায় না; রাজবিলাসের কবি প্রভুর পক্ষে অযশস্কর এই সংঘর্ষের কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই; জানিয়াও এ বিষয়ে সত্য গোপন, কিংবা ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে, "সত্যের মিতব্যয়" করিয়াছেন। তিনি কবি; তাঁহার কাব্য চাটুবাদ, এজন্য তিনি বিশেষ নিন্দার্হ নহেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি,

* টডের মতানুসারে ১৭১০ সংবতে জগৎসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল; ইহা ভুল। রাজবিলাসে সঠিক তারিখ নাই। ওয়ারিসের গ্রন্থপাঠে (*f.* 68 *b*) জানা যায়, ১৬৫২, ২৭এ অক্টোবর তারিখে বাদশাহ পঞ্জাবের সরহিন্দের নিকট জগৎসিংহের মৃত্যু-সংবাদ পান।

হয়ত চিতোর-দুর্গ সংস্কারের উদ্দেশ্য মোগল-সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করা; কিংবা যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সন্ধির ঐ অপমানজনক শর্তটি অপসারিত করা। ১৬৫২ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ও দারার সেনাপতিত্বে দুইবার অর্ধলক্ষাধিক সৈন্য পাঠাইয়া শাহ্‌জাহান কান্দাহার-দুর্গ পারসীকদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইহাতে হয়ত রাজসিংহও সম্রাটের বৈরিতা সাধনে সাহসী হইয়াছিলেন।

মোগল-সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার এই নিষ্ফল চেষ্টাকে অনেকে হয়ত রাজসিংহের অবিমৃষ্যকারিতা বলিবেন; এবং সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ শাহজাহান এই বিরুদ্ধাচরণকে কৃতঘ্নতা বলিয়া নিন্দা করিবেন। অধীনতার অপমানে উদাসীনতা স্বাধীনতা লাভে নিশ্চেষ্টতা বোধ হয় এরূপ নিষ্ফল চেষ্টা হইতে সমধিক নিন্দনীয়; কৃতজ্ঞতার প্রতিদান সখ্য ও প্রত্যুপকার;—উপকারীর কাছে আত্মসম্মান বিক্রয় কিংবা দাসত্বস্বীকার নহে। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে মহারাণার বিরুদ্ধে এক বিরাট মোগলবাহিনী সজ্জিত হইল। মোগলের ইঙ্গিতে কচ্ছবাহ, রাঠোর, হাডা প্রভৃতি সমস্ত রাজপুত কুল শিশোদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল, কেননা, তাঁহারা মোগল-দরবারের ভুক্তিভুক যোদ্ধা; কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাদশার নিমক খাইয়াছেন, স্বকৃত কার্যের ন্যায়-অন্যায় বিচারের অধিকার তাঁহাদের নাই। মহারাণা প্রমাদ গণিলেন, তিনি মোগল-সম্রাটের ক্রোধ-প্রশমনের জন্য হিন্দুর একমাত্র আশ্রয় দারার শরণাপন্ন হইলেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর (২ জিলহজ্জ, ১০৬৪ হিজরা, Waris, ii. 73) মহারাণার পক্ষ হইতে রাও রামচাঁদ চৌহান, রঘুদাস হাড়া, সাদুদাস রাঠোর, গণপৎ দাস পুরোহিত দারার সহিত দেখা করিলেন। কিন্তু দুইদিন পরেই মোগল-সৈন্য মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁর সেনাপতিত্বে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিল, তাঁহার প্রতি সম্রাটের কঠোর আদেশ ছিল,—যেন অগ্নিতে অসিতে মহারাণার রাজ্য ধ্বংস করা হয়। উভয়পক্ষে শান্তিস্থাপন ও রাণাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য দারা প্রথমে নিজের ইমারত-বিভাগের দেওয়ান চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে মিবারে প্রেরণ করেন, কিছুদিন পরে তাঁহার রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান আবদুল করিমকেও তথায় পাঠাইলেন। এদিকে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দারাকে সঙ্গে লইয়া আজমীঢ়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দারা আম্বেরাধিপতি মির্জা রাজা জয়সিংহকে যে-সমস্ত চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে মহারাণার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে স্যর যদুনাথ সরকারই সর্বপ্রথমে এই সমস্ত চিঠি জয়পুর-দরবারের সরকারী দলিল-বিভাগ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ২২শে অক্টোবর, ১৬৫৪

(২৯ জিলকাদ, ১০৬৪ হিঃ) দারা জয়সিংহের কাছে লিখিতেছেন, "দ্বিতীয় সংবাদ সম্রাট আজমীঢ়ের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, আপনার বাড়ীর কাছ দিয়াই যাইবেন। আমি আপনার ওখানে অতিথি হইব, বাদশাহী ফৌজ মহারাণার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। আমি সর্বদাই রাণার শুভানুধ্যায়ী। রাণার রাজভক্তি ও সদুদ্দেশ্যের কথা সম্রাটের কাছে নিবেদন করিয়া তাঁহার রাজ্য যাহাতে বাদশাহী ফৌজের পায়মাল হইতে রক্ষা পায় সে চেষ্টা করিব।"

শাহজাহানের কাছে দারার সব আবদার চলিত, শাহ্‌জাদা রাতকে দিন করিতে পারিতেন। তিনি মহারাণার জন্য কৃপাভিক্ষা করিলেন, মিবার-রাজ্য রক্ষা পাইল, চিতোর-দুর্গের নবনির্মিত প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়া সাদুল্লা খাঁ ফিরিবার আদেশ পাইলেন। নবেম্বর মাসেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। সম্ভবতঃ এই মাসের শেষদিকে লিখিত অন্য একখনি পত্রে দারা জয়সিংহকে জানাইতেছেন, "রাণা মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁহার মামলা মিটাইয়া দিয়াছি; তাঁহার রাজ্য ও সম্মানের কোন হানি হইতে পারে নাই। রাজপুত জাতি জানুক আমি তাহাদের কিরূপ হিতৈষী এবং তাহারা সর্বদা আমার বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন।"

টড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, রাজসিংহ শিশোদিয়াবংশের লুপ্ত প্রথা "টিকা-দৌর" (অভিষেকের পর পররাজ্য আক্রমণ) পুনঃপ্রবর্তিত করিযা মোগল সাম্রাজ্যের অধীন আজমীঢ় প্রান্তস্থিত মালপুরা নামক জনপদ লুট করেন। এ সংবাদ শাহজাহানের কানে পৌছিলেও তিনি রাণার কোন শাস্তি বিধান না করিয়া বলিলেন, "এটা ভাইপোর [নাতি ?] দুর্বুদ্ধি।" ওয়ারিসের পাদ্‌শানামায় মালপুরা-লুটের কোন উল্লেখ নাই, চিতোর-দুর্গ সংস্কার অপেক্ষা অকারণ মোগল-রাজ্য আক্রমণ গুরুতর অপরাধ। সত্যই যদি এ রকম কোন ব্যাপার ঘটিত সম্রাট শাহজাহান কখনও রাণাকে এত সহজে অব্যাহতি দিতেন না। টড সাহেব রাজবিলাস হইতে নিশ্চয়ই মালপুরা-লুটের কথা গ্রহণ করিয়াছেন। রাজবিলাসে মালপুরা-লুটের কথা কাছে, শাহজাহানের সদাশয়তা কিংবা মোগলের সহিত সংঘর্ষের কোন উল্লেখ নাই। রাজ্যারোহণ অধ্যায়ের অব্যবহিত পরেই মালপুরা-লুটের বর্ণনা থাকায় টড বোধ হয় এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত রাজবিলাসে মালপুরা-লুটের সময় নির্দেশ আছে।—

"সংবত প্রসিদ্ধ দহ সত্ত [সপ্ত] ভাস।
বৎসর সু পঞ্চদশ জিঠ মাস॥"

অর্থাৎ, ১৭১৫ সংবতের (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাস। মালপুরা-লুট সত্য ঘটনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু টড কথিত টীকা-দৌর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন এবং শাহজাহানের ভাইপোর উৎপাত নীরবে সহ্য করা ইত্যাদি ভিত্তিহীন জনশ্রুতি মাত্র। ১৬৫৯* খৃষ্টাব্দে সম্রাটের কারাবাসের পর মোগল-সাম্রাজ্য যখন অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল তখন সুযোগ বুঝিয়া রাজসিংহ মালপুরা লুট করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব তখনও দারা এবং সুজার সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং রাণার এ কার্যের দণ্ডবিধান নীতিবিরুদ্ধ মনে করিয়া বোধ হয় তিনি নীরব ছিলেন।

কবি মান মালপুরা-লুটের পরই দুই অধ্যায়ে রূপনগরের রাজকন্যার উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কবিই "সত্যবাদীর" সাধারণ সংজ্ঞায় পড়েন না; তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কি একটা গুরুতর ব্যাপারকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত? কবি হইলেও একজন সমসাময়িক ব্যক্তি মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কাল্পনিক রাজকন্যার সহিত তাঁহার রাজার বিবাহ দিবেন, ইহা অনুমান করা যায় না। রূপনগর রাজপুতানার মানচিত্র হইতে মুছিয়া যায় নাই, রূপসিংহ রাঠোরের নাম ওয়ারিসের পাদশানামায় মনসবদারের তালিকাতে আছে, একাধিক মানসিংহের নামও উহাতে দেখা যায়, কিন্তু রূপকুমারীর নাম কিংবা রাজসিংহ কর্তৃক ঔরঙ্গজেবের বিবাহের পাত্রী হরণ করা কোন সরকারী ইতিহাসে নাই, থাকিতেও পারে না, সুতরাং কবি-বর্ণিত ঘটনাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রথমতঃ বিচার্য, কোন্ সময়ে ঔরঙ্গজেবের ঈপ্সিতা নারীকে মহারাণা হরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? রাজবিলাসে এই ঘটনার কোন তারিখ নাই, কিন্তু টড সাহেব ঘটনাটিকে এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে দেখিলেই মনে হয় ইহা মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল, এবং ইহা সেই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, রাজসিংহের জীবনীর ঘটনাগুলি কবি তারিখ অনুসারে সাজাইয়াছেন তাহা হইলে বলিতে হয় ১৭১৫ সংবত (১৬৫৯) এবং ১৭১৭ সংবতের (রূপকুমারী-পরিণয়ের পরবর্তী অধ্যায় মিবারে সাতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের আরম্ভের তারিখ) মধ্যে রাজসিংহ রাঠোর-কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬৫৯-১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মোগল-সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধের জের চলিতেছিল; ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন তখনও নিষ্কণ্টক হয় নাই; কাজেই এ সময় স্বার্থহানির ভয়ে তিনি দু-একটা চড়চাপড় বিরুক্তি না করিয়া হজম করিতেও পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার করা উচিত আলমগীর বাদশা ছিলেন জিন্দাপীর; তাঁহারও কি রূপ-তৃষ্ণা ছিল? সরল ধর্মবিশ্বাসী, অপ্রতিম শৌর্য ও

নীতির আধার, সুকুমার বৃত্তি বর্জিত হইলেও তাঁহার ভয়াবহ হৃদয়-মরুর নিভৃত-প্রদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রেম-স্রোতস্বিনীর গুপ্তধারা প্রবাহিত হইত; এবং সময়ে সময়ে উহা ফোয়ারার মত সহস্রধারায় উৎসারিত হইত; হীরাবাঈ ও উদীপুরী সেই মরু-মালঞ্চের লাবণ্য-প্রসূন।

রূপকুমারীর রূপে ঔরঙ্গজেবের প্রেমোচ্ছ্বাস হইয়াছিল কিনা ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান রাখেন না। এ সময়ে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সহিত তাঁহার বিরোধ চলিতেছিল; ভেদনীতি দ্বারা রাঠোরকুলকে হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মানসিংহ রাঠোরের ভগ্নীর সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং "রাজশ্যালক" হইবার লোভে রাঠোর-সর্দারও এরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিলেন—কিছুই আশ্চর্য নহে।

ঔরঙ্গজেব রূপকুমারীকে আনিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন; রাজসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাঠোর-কুমারীকে উদ্ধার করিলেন—এ সমস্ত কথা রাজবিলাসে নাই; অথচ টডের রাজস্থানে আছে। রূপনগরে মহাসমারোহে মানসিংহ রাঠোর আপনার ভগ্নীকে পরমশ্লাঘ্য শিশোদিয়া-রাজের হস্তে অর্পণ করিলেন; বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে বর-বধূ উদয়পুরে ফিরিয়া আসিলেন—মান কবি এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

এইবার আমরা রূপকুমারীর সংবাদের বিস্তৃত উপাখ্যান ও রাজসিংহ-চরিত্রের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিব।

মানসিংহ রাঠোর মাড়বারের একজন ভূমিয়ারাজা; তিনি মোগল-দরবারের সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ মনসবদার ছিলেন। তাঁহার এক সর্বসুলক্ষণা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী ছিল; নাম রূপকুমারী। সম্রাট ঔরঙ্গজেব বহু ধন ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া মানসিংহের কাছে রূপকুমারীর সহিত নিজের বিবাহ প্রস্তাব করেন। দিল্লীশ্বরের আদেশ অলঙ্ঘনীয়; ভয়ে ও লোভে তিনি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। রাজপুতের নিকট মুসলমানকে কন্যাদান মৃত্যুতুল্য অপমানজনক; তবে রাঠোর এবং কচ্ছবাহের এ অপমান কতকটা সহিয়া গিয়াছিল; তাই মিবারের কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "কলি যুগ প্রমাণ কবি মান কহি কমধজ কচ্ছবাহা কুমতি," অর্থাৎ কলিযুগে অনাচারের প্রমাণ কুমতি রাঠোর ও কচ্ছবাহ।

এই ঘৃণ্যপ্রস্তাবে ভ্রাতা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া রূপকুমারী অন্নজল ত্যাগ করিলেন। রাজপুত-বালিকার দুঃখ ও অভিমান কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; পর পৃষ্ঠায় কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

করুণা-করতে ইহ বিধি করী,
অব আসুর-গেহ তিয়া অমরী।
গুরু সংকট তেঁ মুহি কৌন গহেঁ,
কুননন্দি সখীজন মংঝ কহেঁ॥
গিবি শৃঙ্গ উতংগনি তে যু গিঁক
কুল কজ্জ হলাহল পান কক ॥
জরতে ঝব পাবক-কুণ্ড জক,
বরিহোঁ সুব আসুর হো ন বক ।
জিন আনন রূপ লংগুর জিসো,
পল সব্ব ভখে সুর সোঁ যুগ সোঁ॥

করুণাময়! তোমার কি বিধান! অমরী এখন অসুরগৃহে বন্দিনী, আমায় এ ঘোর সঙ্কট হইতে কে উদ্ধার করিবে? কুমারী সখিজনমধ্যে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিব, কুল-কার্য হলাহল পান করিব, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব, তবুও অসুরকে আত্মদান করিব না,—সুরকেই বরণ করিব। যাহার মুখাকৃতি বাঁদরের ন্যায়, যে সর্ব-মাংস ভক্ষণকারী, সে কি সুরস্ত্রীর যোগ্য হইতে পারে?

রূপকুমারী মহারাণা রাজসিংহের কাছে এক বিনয়-পত্রিকা প্রেরণ করিলেন, ভূমি ও স্ত্রী ভাগ্যক্রমেই মিলে, গৃহাভিমুখী লক্ষ্মীকে কে উপেক্ষা করে? (মহি মানিনী জানি দসাক মিলে, ঘর আবত লচ্ছিয় কোন ঠিলে), শিশোদিয়া কুলের শরণার্থিনী রাঠোর-দুহিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চিতোর হইতে সসৈন্য রূপনগর যাত্রা করিলেন। মহারাণা স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাঁহার ভগ্নীকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যাদান না করিয়া ঔরঙ্গজেবকে দিবে—এরূপ ভয় ও নীচতা কোনো রাজপুতের থাকিতে পারে না। রূপনগরবাসী মিবার-বাহিনীকে বরযাত্রীভাবে সংবর্ধনা করিল, বিবাহান্তে মানসিংহ বহুমূল্য যৌতুকসহ রূপকুমারীকে মহারাণার সঙ্গে উদয়পুরে প্রেরণ করিলেন। রূপনগরে কোন মোগল-সৈন্যের উপস্থিতি কিংবা তাহাদের সহিত মহারাণার সংঘর্ষের কথা রাজবিলাসের এ অধ্যায়ে নাই। নবপরিণীতা রাণীর রক্ষার্থ মিবারের রক্ত-পতাকাতলে শিশোদিয়া সামন্তমণ্ডলীর যুদ্ধোদ্যম, ইত্যাদি যাহা আমরা টডের রাজস্থানে পড়িয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এই বিবাহের অন্ততঃ আঠার-উনিশ বৎসর পরে ঔরঙ্গজেবের সহিত মহারাণার বিবাদের সূচনা হইয়াছিল।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের অভিজ্ঞতার পর মহারাণা রাজসিংহ সম্রাট শাহজাহানের সহিত

আর বিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। দিল্লীশ্বর শাহজাহানের এক ভুজ ছিল দারা শুকো, অন্য ভুজ ঔরঙ্গজেব, ভ্রাতৃদ্বয় যেন তাঁহার দ্বিমূর্তি; তাঁহারই চরিত্র-চিত্রের আলো ও ছায়া। জীবনের অপরাহ্ণে যখন তাঁহার জরাকম্পিত হস্ত রাজদণ্ড-ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহার পুত্রত্রয় দারার সৌভাগ্যে ঈর্ষাপ্রজ্বলিত হইয়া অসিবলে ভাগ্যপরীক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। দারা জীবনের অধিকাংশ ভাগ হিন্দুদর্শন আলোচনায় এবং হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর সাহচর্যে কাটাইযাছিলেন। তিনি তাঁহার প্রপিতামহের মত উদারচরিত্র, পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন, এবং বিপন্ন হিন্দুর পক্ষে যেন বিধাতার আশীর্বাদ। ঔরঙ্গজেব সর্ববিষয়ে ইঁহার বিপরীত, শরিয়তের চাকে ইনি নিখুঁত মৌলানা-মডেলে তৈয়ারী। তিনি সরলবিশ্বাসী মুসলমান, যুক্তিতর্ক বিচারের অধিকার তিনি দাবি করিতেন না, তাঁহার ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি ছিল কোরাণ হদিস, নবী ও তাঁহার পরবর্তী পুণ্যশ্লোক খলিফা চতুষ্টয়ের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যকে খাঁটি খিলাফতে পরিণত করাই ছিল তাঁহার জীবনের মোহন স্বপ্ন। ঔরঙ্গজেবের মত চরিত্র সর্বদেশে সর্বকালে গোঁড়া সমাজ কর্তৃক আদর্শভাবে পূজিত হইয়া থাকে, মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন, হিন্দু হইলে তিনি ভবভূতির রামচন্দ্রের মত শূদ্রতপস্বীর মাথা কাটিতেন কিংবা জয়দেবের কল্কি অবতারের মত "ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং" হইতেন। কবি মান ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের একদিক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"বসনা রটন্ত মহম্মদ রসূল,
ইদহ, নিবাজ, রোজা অভুল।
* *
গররর বদন্ত ফারসী গুমান,
প্রাসাদ শিখা খণ্ডে পুরাণ।"

তাঁহার জিহ্বায় সর্বদা মহম্মদ রসুলের নাম, ইদ্ নমাজ ও রোজা পালনে তিনি ত্রুটি করেন না, অহঙ্কারে তিনি বিড়বিড় করিয়া ফারসী কথা বলেন, প্রাচীন দেবালয় ও তীর্থ ধ্বংস করাই তাঁহার কাজ। হিন্দুদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং অকর্মণ্যতার ফলে দারার পরাজয় হইল। হিন্দুসমাজের এই দুর্দশার জন্য রাঠোর কচ্ছবাহের তুলনায় হিন্দুপতি মহারাণাও কম দোষী নহেন। রাজসিংহ হতভাগ্য দারার পূর্ব উপকারের কোন প্রতিদান দেন নাই; আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলেও প্রকাশ্যে ঔরঙ্গজেবের সহিত বিবাদ করিতে তিনি সাহসী হন নাই। তাঁহার এরূপ

দুর্বলতা ও অকৃতজ্ঞতা শিশোদিয়া কুলের দুরপনেয় কলঙ্ক। তিনি চতুর রাজনৈতিক কিংবা দূরদর্শী নেতা ছিলেন না; তাঁহার স্বধর্মপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ ক্ষুদ্র মিবার-রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল। মহারাণা সমস্ত হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হইয়া "জিজিয়া" বা অ-মুসলমানের মুণ্ড-করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই। এ সম্বন্ধে যে চিঠি টড রাজসিংহের নামে চালাইয়াছিলেন, স্যর যদুনাথ তাহা শিবাজী কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া বাকী সমস্ত হিন্দুকে নিষ্পেষিত করিলেও তিনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন কিনা সন্দেহ। হিন্দুর মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস ব্যাপারেও মহারাণার ভাব এরূপই ছিল। যশোবন্তের মৃত্যুর পর ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সমস্ত মাড়বার রাজ্য মোগল সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। পরস্পরস্পর্ধী মুসলমান ফৌজদারগণ মাড়বারের প্রধান প্রধান শহর ও দুর্গগুলি হস্তগত করিয়া সর্বত্র মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস শুরু করিল। তথনও মহারাণা নিশ্চেষ্ট; বরং ঔরঙ্গজেবের কোপ-দৃষ্টি যাহাতে মিবারের উপর পতিত না হয় সেজন্য এপ্রিল মাসে সম্রাটের নিকট কুমার জয়সিংহকে পাঠাইয়া দিলেন; তবুও ঔরঙ্গজেব মিবারের উপর জিজিয়ার দাবি ছাড়িলেন না। জুলাই মাসে দুর্গাদাস অসীম বীরত্বে যশোবন্তের পরিবার এবং শিশুপুত্র অজিতকে মোগলের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া যোধপুর পৌছিলেন। মহারাণার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত রাঠোর-সর্দারগণ স্ত্রীপুত্র সহিত মিবার-রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল; মহারাণা তাঁহাদিগকে বারখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নানাপ্রকারে সম্মানিত করিলেন। ঔরঙ্গজেব দেখিলেন মিবার জয় না করিলে রাঠোরেরা দমিত হইবে না। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর আজমীঢ় হইতে সসৈন্যে মিবার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহারাণা রাঠোর ও শিশোদিয়া সর্দারগণকে দরবারে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রত্যেকের মুখেই দুর্জয় সাহস ও অদম্য উৎসাহের উজ্জ্বল জ্যোতি; সকলেই শত্রু-সৈন্যের উপর আপতিত হইবার জন্য উৎসুক। কিন্তু বৃদ্ধ কুলপুরোহিত গরীবদাস নিবেদন করিলেন, আরাবল্লীর পর্বতশিখর আশ্রয় করিয়াই রাণা প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন; সম্মুখসমরে সৈন্যবল ক্ষয় না করিয়া আরাবল্লীর দুর্গম গিরিসঙ্কট এবং বনদুর্গের আশ্রয় হইতে অতর্কিত আক্রমণে মুসলমান-সৈন্য ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত। চিতোর কিংবা উদয়পুর রক্ষার জন্য বৃথা সৈন্যক্ষয় না করিয়া মহারাণা আরাবল্লীর পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব উদয়পুরের বুকে ধ্বংসলীলা প্রকট করিলেন। এ যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার

এক বৎসর পরেই ২২শে অক্টোবর মহারাণা রাজসিংহের হঠাৎ মৃত্যু হয়। তিনি উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। মোগলেরা যাহাতে সমস্ত শক্তি মিবারের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে না পারে, সেজন্য তিনি রাজপুতদিগকে মালব এবং গুজরাত প্রান্ত লুট করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে যে শুধু যুদ্ধের খরচ যুদ্ধের আমদানি হইতে নির্বাহিত হইত তাহা নহে; অপেক্ষাকৃত অল্প-আয়াসসাধ্য জয়লাভে রাজপুতদের আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধে না হারিলেও ঔরঙ্গজেব আশাভঙ্গজনিত পরাজয়ে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। রাজপুতজাতির এক বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া রাজপুত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; যে হারিয়াও হার মানে না, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে পরাজিত করিতে পারে না; প্রবলতর শত্রু দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া মরিলেও সে জয়োচ্ছ্বাস অনুভব করে। রাজসিংহ রাজপুতের মনোবৃত্তিতে এইভাবে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহের প্রারব্ধ কার্য মহাবীর দুর্গাদাসের নেতৃত্বেই বহু বৎসর পরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জীর্ণ অক্ষয়বটের মত সপ্তদশ শতাব্দীতে মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির যে কয়েকটি নূতন শাখার উদ্গম হয়, মহারাণা রাজসিংহ তাহারই অন্যতম।

মরু-বধূ

[প্রাচীন মাড়বারী প্রেমগাথা "ঢোলা-মারু রা দূহা" কাব্য-পরিচয়]

১

ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের কোন এক অজ্ঞাত সন্ধ্যায় আকবরের স্বপ্ন-পুরী ফতেপুর সিক্রীর বাদশাহী মহলে যথারীতি গুণীমণ্ডলীর সাপ্তাহিক মজলিস বসিয়াছে। দণ্ড, মুকুট ও রাজপরিচ্ছেদ বর্জিত স্বয়ং সম্রাট এই আসরের মধ্যমণিরূপে বিরাজমান। এই অন্তরঙ্গ সম্মেলনে দরবারী আড়ষ্টতা নাই, ভাষা ও ভাব বিনিময়ে সরল ভব্যতা আছে, দূরত্ব কিংবা সঙ্কোচ নাই। বিকানীরপতি রায়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুকবি কুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোর সম্রাটকে অভিবাদন করিতেই তিনি স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "কুমারজী, আপনার 'বেলি' (প্রেমকুঞ্জ) ঢোলা-র উট উজাড় করিয়া গিয়াছে!"

ঢোলা-র উট প্রভুর বিরহিণী মরু-বধূকে আনিবার জন্য মালব হইতে পুষ্করের পথে, বিকানীরের নিকটবর্তী পূগল যাইবার কথা; উহা কেমন করিয়া পৃথ্বীরাজের কবিকীর্তি গ্রাস করিল? তিনি বুঝিলেন, ভ্রমর উদ্যানবল্লরী মাধবীর মায়া কাটাইয়া কাঁটাবনে কেতকীর সোহাগে মজিয়াছে অর্থাৎ কাব্য-বিচারে সম্রাটের রুচিবিকার দেখা যাইতেছে। অভিমানী কবি নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে শ্লেষ্ আশ্রয় করিয়া নিবেদন করিলেন, "জাঁহাপনা! 'বেলি'-র জন্য আফসোস করিবেন না। অনুমতি হইলে 'বেলি'-র উজাড় কেয়ারীতে একটি সপুষ্প শমীবৃক্ষ শোভা পাইতে পারে।" কেহ কেহ বলেন, কবি পৃথ্বীরাজ "দোঁহা"-কে হার মানাইবার অভিপ্রায়ে স্বদবুদ্-সালংগা নামক অনুরূপ একটি "বার্তা" বা প্রেম-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, এবং উহা সম্রাটের প্রশংসাও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে "ঢোলা"-র উটের গ্রাস হইতে "বেলি" রক্ষা পাইলেও স্বদবুদ্-সালংগা কবিতা হিসাবে উটের তুলনায় খচ্চর সাব্যস্ত হইয়াছে।*

---

* এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে "বেলি"-র প্রতি আকবর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন উহা পৃথ্বীরাজ রচিত 'ক্রিসন্-রুক্‌মণীরী বেলি' নামক শৃঙ্গার-রসাত্মক ডিঙ্গল ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের একাধিক টীকা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পরবর্তীকালে হিন্দী সাহিত্যরসিকগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা বর্তমানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্য। বিষয়বস্তু হিসাবে

কবি পৃথ্বীরাজ বিদগ্ধ সমাজের জন্যই বেলি রচনা করিয়াছিলেন, আকবর উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কবি নন্দদাস রুক্মিণী-মঙ্গল এবং আকবরের অন্যতম দরবারী কবি নরহরি রুক্মিণী-হরণ লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যদ্বয় অপেক্ষা বেলি নিঃসন্দেহ উৎকৃষ্টতর। ঝুলা চারণ নামক এক কবি ডিঙ্গল ভাষায় রুক্মিণী-মঙ্গল মহাকাব্য ঐ সময়ে লিখিয়াছিলেন। দোহা সম্বন্ধে কিংবদন্তীর ন্যায় আকবর কর্তৃক ঝুলা চারণের কাব্য প্রশংসারও অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, বেলি ও রুক্মিণী-মঙ্গলের কাব্য-বিচারে সম্রাট প্রথমে বেলি শ্রবণ করিয়া পরে দ্বিতীয় কাব্য শুনিয়াছিলেন। চারণের কবিতায় মুগ্ধ হইয়া আকবর নাকি বলিয়াছিলেন, "কুমাবজী! চারণ বাবার হরিণ আপনার বেলি খাইয়া গিয়াছে।" হিন্দী আলঙ্কারিক ও কাব্য-সমালোচকগণ এই কিংবদন্তীদ্বয়কে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; যেহেতু দোহা কিংবা রুক্মিণী-স্বয়ংবর তাঁহাদের প্রাচীনপন্থী কাব্যাদর্শে বেলির সহিত তুলনার যোগ্যই নহে। বেলির সর্বাপেক্ষা আধুনিক টীকাকার* অধ্যাপক আনন্দপ্রকাশ দীক্ষিত উহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিদেশী সমালোচক টেসিটোরী কবি পৃথ্বীরাজকে ডিঙ্গল কবিতার Horace এবং এতদ্দেশীয় অর্বাচীন পণ্ডিত মোতিলাল মেনারিয়া বলিয়াছেন Homer; পণ্ডিত সূর্যপ্রকাশ পারীখ বলিয়াছেন "ভবভূতি"।

দীক্ষিতজীর পূর্ববর্তী বেলি সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথ্বীরাজ আকবর-শাহী আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি এবং বেলি ডিঙ্গল সাহিত্যের তাজমহল, নিষ্কলঙ্ক কাব্যশিল্পে সযত্নরক্ষিত রস এবং ভাবের অপূর্ব বৈচিত্র্য ও মাধুর্য! এ হেন বেলিকে বাদশাহ কেমন করিয়া ঢোলার উট কিংবা চারণ বাবার হরিণের মুখে তুলিয়া দিলেন? ইহা কি পরিহাস-জল্পিত না কাব্যের যথার্থ মূল্য-নিরূপণ? বেলির প্রতি আকবরের এই আপাতঃদৃষ্ট অবিচার কি তবে কবির দুর্ভাগ্য—"অরসিকে রসস্য নিবেদনম্?"

আকবর বাদশাহ অপাঠিত হইলেও অপণ্ডিত ছিলেন না। বহুবিধ কাব্য, দর্শন

"বেলি" বাংলা ও মারাঠী সাহিত্যের রুক্মিণী-হরণ রুক্মিণী-মঙ্গল শ্রেণীর কাব্য। নাগরী প্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত "ঢোলা-মারু রা দুহা" গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত। এই দুই কাব্য সংক্ষেপে যথাক্রমে "বেলি" এবং "দোহা" নামে উল্লেখ করা হইবে। "বেলি" সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন সুদবুদ-সালংগা আদৌ পৃথ্বীরাজের রচনা নহে। দ্রষ্টব্য—"প্রাক্কথন" (ঢোলা-মারু) পৃঃ ৫-৬ পাদটীকা।

* দ্রষ্টব্য—বেলি কিসন রুকমণীরি, গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ভূমিকা পৃঃ ১৩-১৭৩।

ও ব্যবহারিক বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ কানে শুনিয়া অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি বহুশ্রুত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। কবি পৃথ্বীরাজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিচারের বিদ্যা ও রসবোধ আকবরের ছিল বলিয়াই তিনি কবিকে দরবারে এবং অন্তরঙ্গ সমাজে উচ্চাসন দিয়াছিলেন, এবং কবির মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিতর্পণে শোকের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। সম্রাটের শেষ জীবনে প্রাণের নিঃসঙ্গতার হাহাকার আমরা তাঁহার স্বরচিত দোহায় আজও শুনিতে পাই—

"পীথল সুঁ মজলিস গই, তানসেন সুঁ রাগ।
রীঝ বোল হঁসি খেলবো, গয়ো বীরবল সাথ॥"

(পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মজলিসের আনন্দ, তানসেনের সহিত সঙ্গীত, বীরবলের সাথে সাথে হাসি-কৌতুক চলিয়া গিয়াছে।)

ঐতিহাসিকের পক্ষে কাব্যের উৎকর্ষতা বিচার "অব্যাপারেষু ব্যাপারং",— বিপদের সম্ভাবনা বিলক্ষণ। অথচ, হিন্দী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা মোহিতলাল মজুমদারের সমগোত্রীয় কোন কাব্য-সমালোচক নাই যাঁহাদের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস মিশ্রবন্ধু-বিনোদ গ্রন্থে শ্রীযুত শ্যামবিহারী মিশ্র বেলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত না হইলেও অহিন্দী ভাষী আমাদের কাছে মনে হয় বেলির স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর নয়; কিন্তু দোহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা নহে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ অনুসারে দোহা আদৌ কাব্যই নহে, লোক-গীতি মাত্র; কাব্যের শ্রেণী-বিভাগের বাহিরে, যাহার স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বেলি কবিতার তাজমহল নহে, আকবরশাহী আমলে মথুরার গোবিন্দজীর মন্দির। বেলির রূপ আছে, কল্পনার বিলাস-সজ্জা আছে, মিলনের মাধুর্য আছে, কিন্তু বিরহের ব্যথা নাই। "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া"র ছিন্নকণ্ঠ কোকিলের শেষ নিবেদনের বেদনা বেলি আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না। মানব হৃদয়ের এই শাশ্বত বেদনার বাণী নারবার দুর্গের রাজপ্রাসাদে নায়ক ঢোলার দীর্ঘশ্বাসের সহিত ধূ ধূ মরুর দক্ষিণ-পবন-সঞ্চালিত হইয়া প্রতি বর্ষা-সমাগমে প্রোষিত-ভর্তৃকাকে আজও আকুল করিয়া তোলে। মরুবাসী সরল যাযাবর পশুচারক, কৃষক এবং বিরহিণী পথিক বধূর প্রাণে মুসলমান যুগের পূর্ব হইতে দোহার ছন্দ এই বেদনার প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে। বেলি শাহীবাগের চামেলী; "বনজ্যোৎস্না" নহে। বেলি কুলীন; দোহা গ্রামীণ। বেলি কৌবাম্বীর মোহিনী বীণা "ঘোষবতী"; দোহা রাখালের বাঁশি কিংবা বাঁশবনে বাতাসের শানাই।

"ঢোলা মারু"র প্রেমগাথা কে কিংবা কাহারা কোন্ যুগে রচনা করিয়াছিলেন কেহ নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন না। এই কাব্যের কবি অজ্ঞাত এবং সম্ভবতঃ একাধিক সংগ্রহকর্তাগণ বহু শতাব্দী পরে এই লোকগীতিকে কাব্যের রূপ প্রদান করিয়াছেন। এই লোকগীতির নায়ক-নায়িকা গতানুগতিক ভাবে রাজা-রাণী হইলেও ইহা নিতান্তই গরীবের কবিতা, রাজস্থান মরুর স্বতঃস্ফূর্ত করুণ হাহাকার। রাজপুতানার নিরক্ষর "ডোম" ও "ঢাটী" জাতীয় যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় সর্বপ্রথম "ঢোলা-মারু"র লোকপ্রিয় কথাবস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে গীত রচনা করিয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ, ইহার অধুনা-আবিষ্কৃত পুঁথি সমূহের পাঠ স্থানে স্থানে বিভিন্ন। "ঢোলা-মারু"র কথা এখনও রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রাম্য কথক ও কবিগণের মুখে মুখে মূল আখ্যান কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে[৩] অন্ততঃ ৪০০-৫০০ বৎসর পর্যন্ত উক্তরূপ পাঠান্তর, প্রক্ষেপ (interpolation) এবং যোগ-বিয়োগ চলিয়া আসিতেছিল। সংগ্রহকর্তাগণ উহাদের স্বরচিত দোহা এই "কথা"র মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কথকতা এবং গ্রাম্য আসরের "গীত" রূপে ইহা হয়ত প্রথমে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের বাহিরে, অন্ততঃ উত্তরপ্রদেশে, ছন্দোবদ্ধ পুঁথি একটানা পাঠ করা হয় না; পুঁথির খানিকটা পড়িয়া পাঠক উহাকে পল্লবিত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে—"ঢোলা-মারু"র দোহাও শ্রোতাগণকে পল্লী-কথক "ডোম" ও "ঢাঁটী" এই ভাবে শুনাইত। এই জন্য কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "দোহা"র মাঝে মাঝে ডিঙ্গল-গদ্যে "কথা" অংশ পাওয়া যায়। কোন কোন সংগ্রহকর্তা "কথা"র গদ্যাংশ বাদ দিয়াছেন। এইজন্য যাহা এককালে "বার্তা" রূপে প্রচলিত ছিল, উহা "দোহা" বা কবিতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

৩ জয়সলমীর অধিপতি হররায আকবরের অন্যতম শ্বশুর। রাবল হররায়ের আদেশে জৈন পণ্ডিত কুশল-লাভ বা কুশল-চাঁদ দ্বারা ১৬১৮ বিক্রমাব্দে (খৃঃ ১৫৬২) "দোহা"র সংগ্রহ ও সঙ্কলন কায শেষ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের বেলিব রচনাকাল বিঃ ১৬৩৮ অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ। রাবল হররায় মোগল দরবারে রাঠোর-কবির খ্যাতি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে দোহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে উহা সত্য না হইলেও ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে দোহা সর্বপ্রথম আকবরের দরবারে উপস্থাপিত হইযাছিল—জনশ্রুতির এই অংশ সম্ভবতঃ মিথ্যা নয়।

দ্রষ্টব্য—দোহা প্রাক্কথন পৃঃ ৮-৯ ও পাদটীকা।

"ঢোলা-মারু"র কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা—এই মীমাংসা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। এই লোকগীতির রচনাকাল নির্ধারিত করিবার কোন বহিঃ-প্রমাণ কিংবা অন্তঃপ্রমাণ নাই। এই লোকগীতি হয়ত কল্পনা-কুসুম নহে। এই লোকগীতির নায়ক ঢোলা নারবার (গোয়ালিয়র রাজ্যে ধ্বংসাবশিষ্ট Narwar) রাজ্যের রাজা, নায়িকা মারবনী বা মারুণী বর্তমান বিকানীর রাজ্যের ২৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে জয়সল্মীর সীমান্তে অবস্থিত পূগলের অধিস্বামী পিঙ্গল রায়ের কন্যা। পূগল ও নারবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। কোন "পাথুরে প্রমাণ" (inscription) দ্বারা সমর্থিত না হইলেও রাজপুতানার "খ্যাত" (কাহিনী) অনুসারে ঢোলা রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি, নারবার তাঁহার পিতৃ-রাজ্য। ঐতিহাসিক টডের মতে নারবার রাজ্য স্থাপয়িতা নলের তেত্রিশ পুরুষে ঢোলার পিতা সোড়দেব রাজা হইয়াছিলেন। সোড়দেবের মৃত্যুকালে ঢোলা রায় নাবালক ছিলেন। রাজ্যাপহারক পিতৃব্যের ভয়ে শিশুপুত্রকে লইয়া তাঁহার মাতা মীনা জাতির পূর্বতন রাজ্য বর্তমান জয়পুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক সর্পস্বভাব রাজপুত সন্তান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মীনা জাতির প্রধানগণকে বধ করিলেন এবং উহাদিগকে পদানত করিয়া কচ্ছবাহ বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজপুতকে আশ্রয় দেওয়ার দুর্বুদ্ধির দরুন ভাগ্যবিপর্যয়ে মীনা তদবধি তস্কর, মীনা দস্যু, রাজপুত গর্বিত শাসক। ঢোলা রায় একদিন সস্ত্রীক দেবীদর্শনে গিয়াছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে পথিমধ্যে মীনাগণ ঢোলা রায়কে হত্যা করিল। তাঁহার গর্ভবতী রাণী মারবনী কোনক্রমে রক্ষা পাইলেন।

বলা বাহুল্য, টড এইস্থানে কচ্ছবাহ বংশের সঠিক ইতিহাস বিবৃত করেন নাই বংশাবলী ইহা অপেক্ষাও অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নৈন্‌সী জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, নারবার রাজ্য সংস্থাপক নলের পুত্র ঢোলা মারবনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, টড সাহেব জনশ্রুতিমূলক এই ঢোলার সহিত বর্তমান জয়পুর রাজ্যের স্থাপয়িতা দুল্‌হা রায়ের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। টডের হিসাবে ঢোলা রায়ের সময়কাল ১০২৩ বিক্রম সংবত (আনুমানিক ৯৬৭ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু শিলালিপির প্রমাণে দুল্‌হা রায়ের পূর্বজ কীর্তিবর্মা ১০৭৮ সংবতের পূর্বে (১০২২ খৃঃ) রাজত্ব করেন নাই। সুতরাং কীর্তিবর্মার অধস্তন সপ্তম পুরুষ দুল্‌হা রায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। ঢোলার কনিষ্ঠা রাণী মালব রাজ দুহিতা মালবনী (সংস্কৃত মালবিকা) উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজা ভীমের কন্যা। পৃথ্বীরাজ-রাসো মহাকাব্যে রাজা ভীমকে পৃথ্বীরাজের শ্বশুর বলা হইয়াছে। সুতরাং

রাজা ভীমের ঐতিহাসিকত্ব সন্দেহমূলক হইলেও রাজপুতানার জনশ্রুতি অনুসারে তাঁহার সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ—অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কাল।

৩

এই লোকগীতির নায়িকা মারবনী বা মারুকে বলা হইয়াছে পুগল-রাজ পিঙ্গল রায়ের কন্যা। পুগল রাজপুতানার ইতিহাসে বীররক্তাপ্লুত প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বে ইহা জয়সলমীরের অধিকারে ছিল; বর্তমানে বিকানীর শহরের প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি ধ্বংসাবশেষ থানা। পিঙ্গল রায় আমাদের মতে কিন্তু একটি মনগড়া ধ্বনি-সামঞ্জস্য মূলক নাম। পিঙ্গল রায়কে কোন কোন পুঁথিতে সিংঘল রায় বলা হইয়াছে। হিন্দী কাব্য সম্পাদকগণ নিতান্ত আশাবাদী। "দোহা"র সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুত সূর্যকান্ত পারীথ এই কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে বলিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক গবেষণায় পিঙ্গল রায়ের অস্তিত্ব হয়ত আবিষ্কার হইবে। যে কোন মরু বালিকার নাম "মারু" হইতে পারে, রাজকন্যা হইবে এমন কোন কথা নাই। এক মেষপালকের মুখে "মারু" তাহার সহিত ঘরকন্না করিতেছে শুনিয়া নায়ক ঢোলা প্রায় অজ্ঞান হইয়াছিলেন। ঢোলার উট অনেক কষ্টে এই "মারু" যে রাজকন্যা "মারু" নহে উহা বুঝাইয়া প্রভুকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিল।

নায়িকা "মারুর" পিতৃকুল পরমার রাজপুত বলিয়া প্রাচীনতম পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, পরবর্তী পুঁথিতে বলা হইয়াছে, যদুবংশী ভট্টি। এই মতান্তরের কারণ কি? ঢোলাকে লইয়া টানাহিচড়া করিলে "ঢোলা-মারু"র সম্ভাব্য রচনাকাল পাওয়া যাইবে না; এই মতান্তরের কারণ বিশ্লেষণ করিলে হয়ত সত্যের কাছাকাছি আমরা পৌঁছিতে পারি। পরাক্রান্ত পরমার কুল মুসলমান আক্রমণের পূর্বে সর্বাপেক্ষা বহু-বিস্তৃত ছিল। এইজন্যই "সারা ভূঁ পমার-কা" জনশ্রুতির উদ্ভব। এক সময়ে পরমার কুল সমস্ত মালব, রাজপুতানা এবং সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে ভট্টিকুল বিক্ষিপ্ত ভাবে পঞ্জাব এবং সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরে আফগানিস্থানে গজনী পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সুলতান মামুদের উদীয়মান সাম্রাজ্যের চাপে ভট্টিকুল ক্রমশঃ সিন্ধুর পূর্বতীরে পশ্চাদপসরণ করিয়া তুর্কী আক্রমণের গতিরোধ করিয়াছিল। ভট্টি রাজপুত কয়েক শতাব্দী পরে পরমারগণকে স্থানচ্যুত করিয়া সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়সলমীর রাজ্য স্থাপন করেন এবং ভট্টিপ্রাধান্য ক্রমশঃ বর্তমান জয়পুরের অন্তর্গত শেখাবটী

পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। "ঢোলা-মারু"র রচনাকালের শেষ সীমা সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে পারে না। পরবর্তী কালে পরমার কুলের স্মৃতি যখন ভট্টিকুলের প্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তখনই পূগল রাজকুমারী মারুর পিতৃকুল জনশ্রুতিতে ভট্টি হইয়া গেল। এইজন্যই ষোড়শ শতকের পরে লিখিত কোন কোন পুঁথিতে ভাটি পাঠ পাওয়া যায়। গোত্রান্তর ঘটিলেও মরু-কন্যার রূপখ্যাতি আজিও অমলিন।

রাজপুতানায় কথাই প্রচলিত আছে:

মারবাড নর নিপজে নারী জয়সলমীর।
সিন্ধা তুরাহী সান্ত্রা করহল বিকানীর॥

অর্থাৎ মারবাডের পুরুষ, জয়সলমীরের নারী, সিন্ধুদেশের ঘোড়া এবং বিকানীরের উট স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে তুলনা-রহিত।

পরমার নন্দিনী নায়িকা মারুকে এই জন্যই পরবর্তী ভাট চারণগণ পূগলের ভাটিবংশী করিয়া ফেলিয়াছে।

৪

ঢোলা-মারুর "বার্তা" ও গীত রাজস্থানে অতি প্রাচীন (ঘণা পুরাণা); কিন্তু কত প্রাচীন নির্ণয় করিতে গেলে ঐতিহাসিকদের অবস্থা সাপে ছুঁচো ধরার মত হইয়া পড়ে। বাংলায় "কানু", ব্রজবুলিতে "কনহৈয়া" ছাড়া যেমন গীত নাই, রাজস্থানী ডিঙ্গল ভাষায় তেমনই ঢোলা ব্যতীত গীত কিংবা "গাথা" হয় না। একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রণেতা হেমচন্দ্র "ঢোলা", "ঢোল্ল" (সংস্কৃত "দুর্লভ") নায়ক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রাজস্থানী ভাষায় গ্রাম্য কবিতা ও গীতে "ঢোলা" শব্দের নায়ক, পতি কিংবা বীর অর্থে প্রয়োগ প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও পাওয়া যায়। "ঢোলা" শব্দের ন্যায় গীত ইত্যাদিতে নায়িকা সাধারণ অর্থে "মারু"-র বহুল প্রয়োগও দেখা যায়। বর্তমানে "মারু" শব্দের লিঙ্গান্তর ঘটিয়া যাওয়াতে উহা নায়িকা অর্থে প্রযুক্ত হয় না, মেড়ো (মরুবাসী) নায়ক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৪]

---

৪ রাজস্থানী ভাষায় "মারু-র রূপান্তর "মারুবী', "মারবণ" এবং "মারবী।" "মারু" পুংলিঙ্গ হওয়ার পর বাঙ্গলা দেশের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে এবং কলিকাতাবাসীদের মুখে বিকৃত "মেরো" বা "মেড়ো" হইয়া গিয়াছে। "ঢোলা"র টিপ্পনী, দ্রষ্টব্য দোঁহা, সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট পৃঃ ১৬৭-৯।

ঢোলা এবং মারু যদি বাস্তবিক রাজারাণীর নাম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এই নামদ্বয় যোগরূঢ় হইতে অন্ততঃ হেমচন্দ্রের পূর্বে একশত বৎসর নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল ; সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ঢোলা-র সময়কাল খৃঃ দশম শতাব্দী হইয়া পড়ে। কোন সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাম এইরূপ যোগরূঢ়ত্ব লাভ করিবার উদাহরণ অতি বিরল। ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াও অসম্ভব নয়।

ঢোলা-মারুর নায়ক-নায়িকাকে ইতিহাসে বেআইনী চালান দেওয়া হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে? জনশ্রুতিরক্ষিত ইতিহাসে ইহা প্রায়ই রাজপুতানায় ঘটিয়াছে যথা—পদ্মিনী উপাখ্যান।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় প্রাচীন ঢোলা মারু প্রেম-গাথায় ব্যক্তিবাচক নামদ্বয় ও অন্যান্য গীতের ন্যায় নায়ক নায়িকা অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা, ঢোলা-মারু র লোকগীতির কাঠামোর মধ্যে যেন নিতান্ত হালকা ভাবে রাজারাণী রাজকুমারী লাগিয়া রহিয়াছেন। সনাতন কাল হইতে রাজতন্ত্র শাসিত ভারতভূমিতে রাজারাণীর প্রতি জনসাধারণের অহেতুকী ভক্তি ও অজানা মোহ ছিল, আছে এবং আরও কিছুকাল গুপ্তরূপে থাকিবে। এইজন্য রাজারাণী ব্যতীত কোন গল্প গ্রাম্য আসরে কিংবা অবোধ শিশুর কাছেও জমিয়া উঠে না, লবণ ছাড়া তরকারির মত বিরস লাগে, সুদূর অতীতের যাদু শ্রোতাকে সম্মোহিত করে না। পূগল রাজকন্যার কিংবা তাঁহার সপত্নী মালব রাজকুমারীর বিরহবেদনায় গরীবের দরদীপ্রাণ যেমন উতলা হইয়া উঠে, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা শেঠানীর মৌন-বিরহ ভাষা পাইলেও সেরূপ সাড়া পাইবে কি? কেহ কেহ আপত্তি করিবেন ঢোলা এবং মারুকে বিধাতার সৃষ্টি হইতে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। যদি দোহা-র নায়ক-নায়িকা নিছক কল্পনাই হয় তবে পরবর্তী কালে রাজপুতানায় লোকের ঘরে উঁহাদের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হইয়া মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইত কেন? হোলির শোভাযাত্রার ন্যায় আজ পর্যন্ত ঢোলা-মারুর শোভাযাত্রা বাহির হয় কেন?[৫] ঢোলা-মারু মরুস্থলীর সাত্ত্বিক প্রেমের দেবতা, ব্রজভূমির কৃষ্ণ-রাধার সমতুল্য। সুতরাং ইহারা কি মিথ্যা হইতে পারেন? আজমীর ও পুষ্করে ঢোলা-র শোভা-

---

৫ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা আলোয়ার রাজ্যের এক গ্রামে এইরূপ মূর্তি দেখিয়াছিলেন—যাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসর প্রাচীন বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। আজমীর ওঝা মহোদয়ের শেষ নিবাস। এইখানেই তিনি ঢোলা-মারুর শোভাযাত্রা চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন। "ঢোলা-মারু" গাথার ১২১ চিত্র সম্বলিত এক চিত্র-মালা যোধপুরের সর্দার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। দ্রষ্টব্য : দোহা প্রাক্কথন, পৃঃ ৭ এবং পাদটীকা।

যাত্রায় ঘাতসহ রসিক গ্রামীণ মাত্রই নায়কের অনুকল্প। এইজন্য উৎসব-মত্তা নারীগণ ঢোলা-মারু-র গীত সহযোগে মহিষচর্ম-পাদুকার অবিরাম আঘাতে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন। ঢোলা ছিলেন ঢিলাঢালা কাছাখোলা প্রেমিক। কি দোষে বর্তমান কালে তাঁহার এই দুর্দশা কেহ বলিতে পারে না। কুব্জা-ভজা বংশীধারী যদি মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিতেন তাহা হইলে কুপিতা গোপিনীগণ তাঁহার মাথায় ঘোলের হাঁড়ি ভাঙিয়া মনের সাধ মিটাইত কিনা কে শপথ করিয়া বলিতে পারে?

মোট কথা, দোহার ঐতিহাসিকতা বিচারে আমাদের "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা! এই নীরস ভণিতায় রসজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর আমরা কথাবস্তুর অবতারণা করিব।

৫

গোয়ালিয়র দুর্গের নিকটবর্তী অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত নারবার নগরী একসময় সুবিস্তৃত কচ্ছবাহ রাজপুতকুলের আদি রাজধানী ছিল। সেখানে নল নামক পরাক্রান্ত নৃপতি বর্তমানকাল হইতে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সালহ্‌কুমার (ডাক নাম ঢোলা) তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবার পর সপরিজন রাজা নল তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে আজমীঢ়ের অদূরে পুষ্কর তীর্থে আসিয়াছিলেন। পুষ্কর তীর্থ পশ্চিম-ভারতের কাশী, মরুকবলিত পশ্চিম রাজস্থানের জীবন-বাপী। বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর একবার হইয়াছিল, মারবাড় বিকানীর জয়সলমীরে সুদূর অতীত হইতে অদ্যাবধি প্রতিদশকে ছোট মন্বন্তর একবার প্রায়ই হইয়া আসিতেছে। অন্নের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অনাবৃষ্টিজনিত জলের দুর্ভিক্ষ মরুস্থলীতে অতি ভয়ানক। অকরুণ প্রকৃতি এই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে এখনও অর্ধ যাযাবর করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ দুর্দিনে জমিদার, রায়ত, গৃহস্থ, সাধু, চোর, ডাকাত, পালিত ও বন্যপশু শুধু বাঁচিবার আশায় সুদীর্ঘ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পুষ্করের দিকে ছুটিয়া আসে, হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান তৃষ্ণার্ত দ্বিপদ চতুষ্পদের অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরে পরিণত হয়। পরবর্তী বর্ষায় সুবৃষ্টি হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায়, মরুর পাংশুমুখে সুদিনের হাসি ফুটিয়া উঠে।

এমন এক দু'কাল-র (সংস্কৃত দুষ্কাল) তাড়নায় পুগলের অধিস্বামী পিঙ্গল রায়

স্ত্রী ও শিশুকন্যা মারু-কে সঙ্গে লইয়া পুষ্করে আসিয়াছিলেন।[৬] রাজা নলের রাণীর সহিত মারু-র মাতার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, রাণী অনিন্দ্যসুন্দরী মারু-কে বধূরূপে প্রার্থনা করিলেন। দুরবস্থায় পড়িলে রাজপুতের আত্মাভিমান তীব্রতর হয়, সুতরাং এই সম্বন্ধ পিঙ্গল রায়ের মনঃপূত হইল না। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, দুঃসময়ে ধনীর ঘরে মেয়ের বিবাহ দিলে লোকে হাসিবে। গৃহিণী ধমক দিয়া কহিলেন, পাগলামি করিও না, বিবাহ আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছি, বর-বধূ বিধাতা অপূর্ব মিলাইয়াছেন। মহা ধুমধামে বিবাহ হইয়া গেল। বরের বয়স তিন বৎসর, কন্যার দেড় বৎসর।[৭]

বিবাহের পর বর বধূ পিতামাতার সঙ্গে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ঢোলা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে রাজা নল পুত্রের প্রথম বিবাহের কথা সম্পূর্ণ গোপন করিয়া মালবের অন্যতম নৃপতি রাজা ভীমের পরম রূপবতী এবং অশেষ গুণশালিনী কন্যা মালবনীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। পূর্ব বিবাহের কথা ঢোলা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না, কিন্তু সুচতুরা মালবকুমারী পতিগৃহে আসিয়া এই রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আশঙ্কায় বিচলিত না হইয়া তিনি অজ্ঞাত সপত্নীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঢোলা নারবার সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর মালবকুমারী রাজা ও রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। সরল প্রাণ, অকপট ঢোলা রাণীর রূপ, গুণ ও একনিষ্ঠ প্রেমে গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় সরোবরে মালবনন্দিনী কোজাগরী পূর্ণিমার লীলাচঞ্চল কুমুদ, তিনি

---

৬ নাগরী প্রচারিণী সভা প্রকাশিত দোহার সম্পাদকত্রয় বিচক্ষণ পণ্ডিত। তাহারা পরিশিষ্টে পুঁথির বিভিন্ন পাঠ যোগ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদসহ মূল যে পাঠ তাঁহারা দিয়াছেন (মূল পৃ ১) উহাতে লেখা আছে পিঙ্গল রায় নারবার গিয়াছিলেন এবং রাজা নল তাঁহাকে ঘোড়া চাকর নোকর উপহার দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। অপর একটি পাঠ তাহারা "অত্যন্ত শুদ্ধ" বলিয়াছেন। অথচ উহাতে লেখা আছে পিঙ্গল রায় পুষ্করে আসিয়াছিলেন। (আবি পুরি পুষ্করি উতরিয়া)। পিঙ্গল রায়ের ভাট কন্যার সম্বন্ধ প্রস্তাব লইয়া নারবার গিয়াছিল এবং তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রাজা নল পুষ্করে আসিয়াছিলেন (পৃঃ ২৮৬ ৮৭) মূল পাঠে ভাটের কথা বাদ দেওয়া উচিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ লেখক যুক্তিসঙ্গত কারণে মূল পাঠ স্থানে স্থানে অগ্রাহ্য করিয়া পরিশিষ্ট হইতে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসু হইলে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হইবে।

৭ মায়ের পেটে সন্তান থাকিতেই সেকালে উত্তর ভারতের যে কোনো প্রদেশে বিবাহের বাগদান আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। এই যুগেও আইন উপেক্ষা করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ স্বচক্ষে দেখা যায়, সুতরাং ঢোলা-মারুর ব্যাপার কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য নহে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে "পেটে পেটে" বাগদান প্রথা ছিল।

"কুমুদ্বতী-রেণু-পিষঙ্গ-বিগ্রহ" ভৃঙ্গ। ঢোলা নিরুদ্বেগে ঘুমায়, মালবনী ঘুমেও যেন কিছু হারাইবার ভয়ে সজাগ থাকেন।

পিঙ্গলের মরুস্থানে বালিকা মরু বধূ কৈশোর অতিক্রম করিয়া উদ্ভিন্ন-যৌবনা হইয়াছেন। রাজা বারংবার নারবারে দূত প্রেরণ করিতেছেন; কিন্তু নারবারে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। আশালুব্ধা মুগ্ধা মারু প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া তৃষ্ণার্ত চাতকীর ন্যায় আকুল মনে পথপানে চাহিয়া থাকে। নিশীথে বিরহ-শয্যায় অদৃষ্টপূর্ব প্রিয়তম মারু-কে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রভাতের আলোকে অন্তর্হিত হয়, দ্বিগুণ দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া মারু কাঁদিয়া উঠে। আষাঢের প্রথম বর্ষণে উন্মাথমুখর পাপিয়ার "পিউ পিউ" (পী আব) ডাক শুনিয়া সুদূর হইতে প্রিয়তমের আহ্বান-ভ্রমে মরু-বধূ উতলা হইয়া উঠে। শ্রাবণের ঘন বরষায় ময়ূরের কেকারব, কামাতুরা দাদুরীর প্রেমনিবেদন যেন মারু-র প্রতি নিষ্করুণ উপহাস। নব-পল্লবিত করীর গুল্মের পত্রান্তরালে বসিয়া বিরহিনী ক্রৌঞ্চ বধূ নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া করুণ বিলাপে মরু-বধূকে আশ্বাসিত করে। পাখীর প্রভাত আছে, কিন্তু মারু-র সুপ্রভাত কোথায়? ঋতুচক্র বহু বৎসর ঘুরিয়াছে, মারুর অদৃষ্টচক্র যেন আর ঘুরিবার নহে, কে ইহার গতি স্তব্ধ করিল?

৬

এক সওদাগর ঢোলার রাজ্যে ঘোড়া বেচিয়া ফিরিবার পথে পূগলে আসিয়াছিল। পিঙ্গল রায় তাহার কাছে শুনিলেন মালবকুমারী গোপনে এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, পূগল হইতে কেহ নারবার রাজ্যে গেলেই তাঁহার চরেরা উহাদিগকে বেমালুম গুম্ করিয়া ফেলে। তিনি স্থির করিলেন রাজপুরোহিতকে পাঠাইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিবেন। রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, এই কাজ পুরোহিতের দ্বারা হইবে না। "ঢাঢী"-কে[৮] পাঠাইতে হইবে। ঢাঢী একশ্রেণীর ভিক্ষাজীবী গায়ক, দেশে দেশে গান করিয়া বেড়ায়, ছোট বড সকল লোকের সদরে অন্দরে সর্বত্র তাহাদের অব্যাহত গতি। তাহারা ছদ্মবেশ ধারণে নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ ও বাক্পটু। যাত্রার পূর্বে মরু-নন্দিনী প্রিয়তমের নিকট তাঁহার বিনয়পত্রিকা "মারু"-রাগে[৯] গাহিয়া ঢাঢী-দিগকে শুনাইলেন। একবার শুনাইয়া মুগ্ধা মরু-বধূর তৃপ্তি হয় না, বার বার গাইয়া শুনায়।

৮ ঢাঢী জাতির পরিচয়, দ্রষ্টব্য "দোহা', টিপ্পনী পৃঃ ১৪

৯ ইহা রাজস্থান মারুর নিজস্ব রাগ, ইহাকে মাঁন, কোথাও মাঁড় বলে।

গীতচ্ছন্দে এই বিনয় পত্রিকায় "মরু" নিবাসিনী দাসী নামে রাজপদে রাজেন্দ্র-র মতো ভাষার ঝঙ্কার নাই, শ্লেষ বক্রোক্তি নাই। নায়িকার মুখে কবি যাহা শুনাইয়াছেন উহা সরলা পল্লী-বধূর প্রাণের কথা, আকুল কাকুতি, অভিমান ও আত্মনিবেদন। নায়ক-নায়িকা স্বামী-স্ত্রী হইলেও ইহা গতানুগতিক গার্হস্থ্য প্রেম নহে। দেড বৎসর বয়সে তিন বৎসরের বরের চেহারা মারু-র নিশ্চয়ই মনে ছিল না, স্বামীগৃহে সে পদার্পণও করে নাই। বয়স্থা অবস্থায় মারু স্বামীর নাম শুনিয়াছিল, মা, বাপ ও সখিদের মুখে স্বামী বডই সুন্দর, এই কথা ছাডা সে আর কিছুই শুনে নাই, পতির দোষ-গুণ স্বভাব-চরিত্র এবং সপত্নী সম্বন্ধে পূগলে কেহ কিছু শুনে নাই। কৈশোরের প্রারম্ভে নায়িকার কল্পনায় নায়কের কাল্পনিক মূর্তি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, যৌবনে একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় এই "নিরাকার" তাঁহার কাছে স্বপ্নেই সাকার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে তাহাকে নিরাশার আঁধারে ডুবাইয়া লুকাইয়া গেল। বাস্তব দৃষ্টিতে যাহাকে জীবনে দেখে নাই তাহার সহিত প্রেমে পড়া কি সম্ভব? এই কথার উত্তরে মারু সখীগণকে বলিয়াছিল—যিনি যাহার জীবন তিনি তাহার দেহভাণ্ডেই থাকেন (তন হি মাঁহি বসন্ত)। প্রকৃত প্রেমিক সমুদ্রপারে থাকিলেও হৃদয়ে বিরাজ করেন, পরন্তু কুস্নেহী কপট প্রেমিক উঠানে বসিয়া থাকিলেও মনে হয় চোখের আডালে সমুদ্রের পরপারেই গিয়াছে।

দূত বিদায়ের ক্ষণে মারু যে অর্ঘ্য প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিল উহার ভাষা-কলি আগাছার আড়ালে স্বচ্ছন্দ-জাত কুর্চী ফুল কিংবা গৃহস্থের উঠানে ভূঁই চাপা, সৌরভ-গর্বিত স্বর্ণ-চম্পক নহে। এই অর্ঘ্যের মন্ত্র বাঁধা-ধরা শাস্ত্রের বুলি নয়, নিষ্পাপ অবোধ মনের বিলাপ, আশার আবদার। মারু বলিয়া পাঠাইলেন, আচ্ছা ভাল মানুষ তুমি। তুমি চিঠি লিখ না কেন? যদি তুমি এই বসন্তে ফাল্গুন মাসে না আস আমি চর্চরী[১০] নাচের ভান করিয়া হোলীর আগুনে লাফাইয়া পড়িব। ফাল্গুন চৈত্রের মধ্যে তুমি না আসিলে আগামী কার্তিকের ফসল কাটা হইলেই আমি যাত্রার জন্য ঘোড়ায় জিন কষিব। যৌবনের ফসল পাকিয়া গিয়াছে; বাড়ী আসিয়া তুমি তোমার প্রাপ্য অংশ (রাজস্থানী ভোগ) লইয়া যাও। প্রিয়তম! শ্রাবণ আসিয়াছে, বিরহ বায়ু-তাড়িত যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ রোধিবে কে? যদি তুমি শ্রাবণের শুক্ল তৃতীয়ায় (প্রথম তীজ) না আস তাহা হইলে এই মুগ্ধা মেঘের

১০ হিন্দুস্থানী হোলির উৎসবে গীতসহকারে উদ্দাম নৃত্য।

ক্ষণপ্রভাকে আলিঙ্গন করিবে। যদি তুমি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়ার (কাজলিয়ারী তীজ) কাজরী পর্বে না আস তাহা হইলে আমার মাথায় বাজ পড়িবে। ভরা প্রেমের ভাষা নাই। ইহা বোবার স্বপ্ন, কাহাকেও বলিবার উপায় নাই, কেবল বার বার মনে করিয়া মনস্তাপ। শেষ কথা; যদি এইখানে আসিবার অবকাশ তোমার না হয়, তবে যেন তুমি বহুদিন রাজ্য সুখ ভোগ কর। প্রণাম! প্রণাম! অসংখ্য প্রণাম!

৮

ঢাটী যাচকগণ পূগল হইতে পুষ্কর পৌঁছিয়া ছদ্মবেশে মালবকুমারীর চরের দলে ভিড়িয়া পড়িল। সেখান হইতে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিয়া নারবার দুর্গে উপস্থিত হইল। দুর্গরক্ষীদিগকে নানা রাগে গান শুনাইয়া ঢাটী-র দল পরদেশী যাচক হিসাবে রাজপ্রাসাদের নিকটেই আড্ডা করিয়া লইল। রাত্রিকালে চার প্রহর পর্যন্ত বাদলের ঘনঘটা, বর্ষণ; গর্জনের ঘোর আরাবে ধরিত্রী সন্ত্রস্তা ও উন্মনা। সুযোগ বুঝিয়া ছদ্মবেশী গায়কগণ মালবের প্রাণ মাতোয়ারা মল্‌হার রাগে ঢোলা-মারু-র বিরহের গান গাহিতে লাগিল। ঢোলা উপর মহলে সেই করুণ-গম্ভীর গীতি শুনিয়া পূর্ব রাগের চাঞ্চল্যে অভিভূত হইলেন। রাত্রি প্রভাতে তিনি গায়কদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের গানের ঢোলা কোন্ ব্যক্তি, মারুই বা কে? অতঃপর নূতন প্রেমের বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। পতির উদাস ভাব দেখিয়া রাণী শঙ্কিতা হইলেন, বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর পাইলেন না। আসল কথা গোপন করিয়া ঢোলা বলিলেন, তুমি যদি হাসিমুখে বিদায় দাও তাহা হইলে একবার বিদেশে ঘুরিয়া আসি। মালবকুমারী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, কিসের জন্য তোমার দেশযাত্রা? যাহার ঘরে বীণার ঝঙ্কার, রসাল পান, সুগন্ধির সৌরভ, সওয়ারে ঘোড়া এবং ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহার আবার দেশাটন কি?[১১]

ঢোলার স্নেহপ্রবণ মন। মালবকুমারীর রূপগুণ তাঁহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া আছে। নায়ক হঠাৎ দোটানা স্রোতে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া চালাকি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নায়িকা অধিক চতুরা। ইডর রাজ্য হইতে নামকরা অলঙ্কার, মূলতান হইতে সস্তায় ভাল ঘোড়া, কচ্ছদেশ হইতে অতি বেগ-গামী উট, গুজরাট

১১ মূল—উঁতী নাদ তঁবোল রস, সুরহি সুগঁধ জাঁহ।
আসন তুবি যরি গোবড়ী, কিসউ দিসাউর ত্যাঁহ॥ পৃঃ ৪১

হইতে দক্ষিণী শাড়ী, সমুদ্র পার হইতে এক লাখ একশ এক মুক্তার দানা আনিবার লোভ দেখাইয়া স্ত্রীর সম্মতি চাহিলেন। মালবকুমারী বুঝাইয়া দিলেন, ঘরে বসিয়াই তিনি ঐ সমস্ত অনায়াসে কিনিতে পারেন, কিন্তু কচ্ছদেশে উট কিনিতে গিয়া সে দেশের "হরিণাক্ষী" নারীর রূপের হাটে খরিদ্দার নীলামে উঠিবার ভয় আছে! ঢোলা কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে দেখিয়া মালবকুমারী অভিমান ভরে বলিলেন, হয়ত আমার কোন অপরাধ হইয়াছে, না হয় অন্য কোন নারী তোমার চিন্তা সর্বস্ব হইয়াছে। তোমার লক্ষণ ভাল দেখিতেছি না, উদাস চাহনি মাটিতে নখের আনমনা আঁচড়, ব্যাপার কি? স্ত্রীর জেরায় হার মানিয়া ঢোলা হঠাৎ মনের কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। "মারু" নাম শুনিতেই "মালবনী" ধরাম করিয়া মাটিতে পড়িয়াই অজ্ঞান, অনেক কষ্টে ঢোলা গোলাপ জল ছিটাইয়া পাখার বাতাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

৯

ঢোলা কোন্ শ্রেণীর নায়ক, "ধীরোদাত্ত" না আর কিছু, উহার বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে রাজা বাদশাহ ঠাকুর আমীর এবং সম্প্রদায় বিশেষ বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধক যেমন "ঘরকা মুর্গী দাল বরাবর" জ্ঞান করেন, ঢোলা-র নূতন প্রেম সে পর্যায়ের ছিল না। পিতার দোষে এবং নিজের অজ্ঞানকৃত অপরাধে পিতৃগৃহে নির্বাসিতা মরু-বধূকে তাঁহার নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা স্বামীর মহান কর্তব্য মনে করিয়া তিনি পূগল যাত্রার জন্য মালব-কুমারীর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। মালবকুমারী রাণী হইলেও নিতান্তই প্রাকৃত নারী, কালিদাসের নায়িকা ধারিণী কিংবা মৃচ্ছকটিক নাটকের ধূতা নহেন। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া নবীন প্রেম যে অঙ্কুর ঢোলার হৃদয়ে উপ্ত করিয়াছে উহাতে মিলন-বারিসেক বিলম্বায়িত করিলে হয়ত আপনিই শুকাইয়া যাইবে,—এই আশায় মালবনী নানা ছলে ঢোলা র বিদেশযাত্রা স্থগিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন।

যাহা হউক, মূর্ছান্তে অভিমানের অশ্রুর বেগ সামলাইতেই ঢোলা ফাঁপরে পড়িলেন, মন দোলায়মান হইল। কবি এই সুযোগে মরুস্থলীর "ঋতু-সংহার" শুনাইয়া পাঠককে আশ্বস্ত করিয়াছেন। বেলির কবি ঋতু বর্ণনায় হিন্দী সাহিত্যের কালিদাস; যে রস তিনি পরিবেশন করিয়াছেন উহা অতি সুপরিশ্রুত, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও পাণ্ডিত্যের সৌরভে সুরভিত; অর্থাৎ শরাবে শীরাজী, গন্ধে গোলাপ, রূপে

চন্দ্রমল্লিকা, স্নিগ্ধতায় শরৎ কৌমুদী। ভোজন-রসিকের নিকট বেলি ও কালিদাসের কবিতা দিল্লীর সোহন্-হালুয়া কিংবা কলিকাতার সন্দেশ। ইহাদের কবিতার তুলনায় দোহার রচনা মাদকতায় কাঞ্জিক (কাঞ্জি); পাঞ্জাবী সিধ্ (সং সিধু) গন্ধে মরুস্থলীর অযত্নবর্ধিত বর্ষায় বিকানীরের বাজ্‌রার আড়ালে, কাঁটাবনে স্বচ্ছন্দজাত বিরল বেলফুল (বেলা বা বেলী),—রূপে অকুলীন, ঠাণ্ডায় মিচরির শরবত। মোদক মধ্যে ইহার গণনা মথুরার পেঁড়া কিংবা সাণ্ডিলার লাড্ডুর শ্রেণীতেও নহে। ইহা পশ্চিম রাজস্থানের অবিমিশ্র মিছরির লাড্ডু, যাহা অতিথিবৎসল সম্পন্ন গৃহস্থ হাঁড়ি ভরিয়া রাখে, তৃষ্ণার্ত পথিক অমৃতজ্ঞানে যাহা চিবাইয়া জল খায়। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত, মাটির গন্ধের সহিত অপরিচিত, মাঠের হাওয়া যাঁহাদের সখের জিনিস, মরুপ্রকৃতি যাঁহাদের ভয় স্থান, মরুর রূপে-রসে-গন্ধে ভরা "দোহা"র কবিতা তাঁহাদের জন্য নহে।

বাংলা দেশের বাহিরে ষড়ঋতু শুধু পুঁথিতেই আছে, জড়প্রকৃতিতে কেবল গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। দোহার ঋতু পরিচর্যায় পতির প্রবাসযাত্রার আশঙ্কায় আকুলিতা গৃহস্থবধূর আত্মপক্ষ সমর্থন, জড়প্রকৃতির আলোকচিত্র, এবং নায়ক-নায়িকার মনের উপর প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাই।

এক বর্ষার ঘনঘটায় ঢাঢ়ী-গায়কের মহ্লার-রাগে মরু বধূর প্রেম নিবেদন শুনিয়া ঢোলা-র মন মালবকুমারীর পোষা টিয়াপাখীর ন্যায় উড়িবার জন্য ছটফট করিতেছিল। বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের দশ মাস কাটিয়া গেল। পুরুষের বারমাসার স্থান কাব্যরীতিতে নাই; কবি কিন্তু কৌশলে উহাও আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। গ্রীষ্ম আসিল। প্রেমে পড়িলে ঠাণ্ডা গরম জ্ঞান থাকে না। ঢোলা প্রেয়সীকে বলিলেন, এইবার অনুমতি দাও; কিন্তু তর্কে স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষ কোন দিন পারিয়া উঠিয়াছে? তিনি উল্টা ধমক খাইয়া দুই মাসের জন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। ধমকে যুক্তি ছিল, দরদও কম ছিল না। মালবনী বলিলেন, মরুভূমির বালু তাতিয়া আগুন হইয়াছে, লু সামনে চলিতেছে (থল তত্তা, লু সামুহা)। পথের মধ্যে পুড়িয়া মরিবে নাকি? আমার কথা শুন, দুই মাস ঘরে বসিয়া থাক।

আবার বর্ষা আসিল। ঢোলা ও মালবনী ঝরোকায় বসিয়া বর্ষার শোভা দেখিতেছিলেন। আকাশে কুণ্ডলীকৃত আসন্ন বর্ষণ কাল মেঘের ঘটা দেখিয়া ঢোলা-র মনে পড়িল, গৃহিণীর কথার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। প্রেয়সীর কণ্ঠলগ্ন হইয়াও তাঁহার দৃষ্টি উদাস, মন বহুদূরে মরুর মাঝে পথ হারাইয়াছে। ঢোলা মালবনীকে বলিলেন, পথঘাট জলে ভরিয়া গিয়াছে, পুকুরে পদ্ম ফুটিয়াছে, বর্ষা আসিয়াছে, বিদায়

দাও। মালবনী বলিয়া উঠিলেন, বৃষ্টিবাদলের যে দুর্যোগে বকও মাটিতে পা ফেলে না উহার মধ্যে তুমি ঘরের বাহির হইবে? এই ঋতুতে পরনের কাপড়, ঘোড়ার জীন, ধনুকের ছিলা জলে না ভিজিয়াও নরম হয়। কোন প্রেমিক এই ঋতুতে স্ত্রীকে একা ঘরে ফেলিয়া যায় না। নদী নালা ঝরণা জলে ভরপুর। উটের পা কাদায় পিছলাইয়া যাইবে। পথিক! পূগল দূর, বহুদূর! এমন দিনে যে প্রবাসে যায় সে নাগর নহে, উজবুক গোঁয়ার!

ইহা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ঢোলা তবুও বলিতে লাগিলেন:

বাজরিয়াঁ হরিয়ালিয়াঁ, বিচি বিচি বেলাঁ ফুল।
জউ ভরি বুঠউ ভাদ্রবউ, মারু-দেস অমূল॥
ধর নীলী ধন পুণ্ডরী, ধরি গহগহই গমার।
মারু-দেস সুহামনউ সাঁবণি সাঁঝী বার॥

অর্থাৎ বাজরার ক্ষেত হরিত বর্ণ হইয়াছে, মাঝে মাঝে বেলা ফুল।

ভাদ্র মাসে যদি ভরা বর্ষা হয় তবে মরুদেশের শোভার তুলনা নাই। ধরণী (দিনে দিনে পরিবর্ধমানা শ্যাম-শস্যরাজি) নীলা, ধনিনী (বিরহ) পাণ্ডুরা। গ্রামে কৃষক গৃহস্থের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল, আসর গম্ গম্।

মালবনী কিন্তু নিজের কথা বলিয়া চলিতেছিলেন।

পাপিয়ার "পিউ পিউ", কোকিলের কুহু কুহু, শ্যামায়মান বনানীর অন্তরালে ময়ূরের ষড়জ-সংবাদিনী কেকা-মুখরিত বর্ষায় ভিখারী, চোর এবং পরের চাকর এই তিন শ্রেণীর জীব ব্যতীত কে ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়? বর্ষণ-বধির নিশীথে কান্ত বিনা কামিনীর রাত্রি কেমন করিয়া প্রভাত হইবে? আমার মিনতি, বর্ষা ঋতুতে যাত্রা করিও না; কপালের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না। যখন নিতান্তই যাইবে, দশহরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

দশহরা (দীপালী ও পৌষ পার্বণ) পার হইয়া মাঘ মাসের শীত পড়িল। এই বার ঢোলা মরীয়া হইয়া মালবনীকে সাফ্ জবাব দিল, হাসিমুখে বিদায় দাও ভালই, না হয় আধারাতে আমি বাহির হইয়া পড়িব!

মালবনী হাল ছাড়িবার মেয়ে নয়। এইবার তিনি শীতের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যে শীতে পালা পড়িয়া গাছপালা ঠাণ্ডায় আধ-পোড়া হয়, মোটা কম্বলের গাত্রবাস "ঠাপর" ছাড়া ঘোড়াও যে শীত সহ্য করিতে পারে না, যে শীতে প্রোষিতভর্তৃকা প্রৌঢ়াও কাহিল হইয়া পড়ে, তেমন শীতে বিরহিণী নবযুবতীর কি দশা হইবে? এমন দিনে সাপও গর্তের বাহির হয় না। আজ উত্তরের বাতাস জোর চলিতেছে, এই

হাওয়ায় পাকা তিলের কলি ফাটিবে, মনের আগুনে প্রিয়-বিরহিত প্রেমিকের গায়ে ফোস্‌কা পড়িবে, বিরহিণী পুড়িয়া ছাই হইবে, নিঃসঙ্গ বিরহী পথিকের কলিজা ফাটিবে।

মাঘ গেল, ফাল্গুন আসিল। ঢোলা-র মন পূগলে হোলি খেলিবার জন্য উতলা হইয়া উঠিল, ঢোলা ঘোড়ার জীন কষে, মালবনী খোলে। ঢোলা রেকাবে পা দিলে মালবনী লাগাম ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে, সুন্দর চোখে ফোয়ারা ছুটে। এইভাবে উভয় পক্ষই ধৈর্যহারা হইল। একদিন মালবনী মনের দুঃখে বলিয়া ফেলিল, সর্বদা "গেলাম, গেলাম" করিও না, যদি সত্য সত্যই যাইতে চাও, তবে আমি ঘুমাইয়া পড়িলে উটের সাজ কষিবে—ইহাই শেষ নিবেদন।

ঢোলা "তথাস্তু" বলিয়া যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিল। একদিনেই নারবার হইতে পূগল পৌঁছাইতে পারে তাঁহার এমন একটি উট চাই। অবশেষে আস্তাবলের একটা কচ্ছদেশীয় উট রাজাকে বলিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সে এই কাজ সমাধা করিতে না পারে কচ্ছী কালি উটনীর পেটে তাহার জন্মই বৃথা। এই উট যদৃচ্ছ বিহারী; মাঙ্গালোরের (দাক্ষিণাত্যের Mangalore ?) বাগানে চড়ে, নাগর বেলি (লতা বিশেষ, টীকাকারের "কদম্ব" অর্থ সম্ভাব্যের অতীত। নাগর বেলির প্রকৃত অর্থ বরজের মিঠা পান।) ছাড়া বাজে লতা পাতা মুখেই তোলে না, এক ঘড়ীর (২৪ মিনিটে) মধ্যে যোজন পথ চলে, মোগল সম্রাটগণের ন্যায় "গঙ্গাম্বু ভিন্নমম্বু ন পিবন্তি", পঞ্চাশ দিন বরং নিরম্বু একাদশী করিবে। এইদিকে মালবনীর চোখে ঘুমের কোন লক্ষণ নাই। আয়োজন পাকা হওয়ার পর তিনি উষ্ট্রপ্রবরের শরণাপন্না হইলেন। মেজাজী উট প্রথমে বিরস মুখ আরও বিকট করিয়া রাণীকে ধমক দিয়া বলিল, থাম, থাম সুন্দরী, ঐ সব চলিবে না। খোঁড়াইবার ভান করিলে রাজা পায়ে গরম লোহার ছেঁক্ দিবে, তুমি দিবে সেক ? আমি মারা যাই আর কি ? মালবনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিল, দরদী উটের মন ভিজিয়া গেল, পশু দ্বিধায় পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, যায় কো'ন্ পথে ? সে সবে মাত্র উটনীকে একলা (রাজস্থানী-হেকলী, পৃঃ ৭৫) ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রেয়সীর চোখে জল দেখিয়াছে, মানুষের ঘরেও এই ব্যাপার। অথচ মনিবের কাছে ফাঁকি দিলে শাপ লাগিবে। মালবনীর জিত হইল, ঢোলা-র যাত্রা পিছাইয়া গেল। রাণীর ইশারায় এক দাসী রাজাকে বুঝাইল তাহার বাপের দেশে উট খোঁড়াইলে গাধার পায়ে ছেঁকা দিয়া উটকে সারাইতে সে দেখিয়াছে। যে যাহা বলে রাজা বিবেচনা না করিয়া উহাই ঠিক মনে করেন, না হয় তিনি "দুর্লভ" (ঢোলা) হইবেন কেন ?

উটের চালাকি শাশুড়ীর কাছে ধরা পড়িবার পর মালবনী আবার উটের কাছে

গেলেন। উট তাঁহাকে ভরসা দিয়া একটি কাজ করিতে রাজী হইল;—যথা রাজা রেকাবে পা দিতেই উট উৎকট চীৎকার করিয়া মালবনীকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দিবে। ইহার পর:

"পনরহ দিনহু জাগতী প্রীস্থ প্রেম করন্ত।
এক দিবস নিদ্রা সবল সুতী জানি নিচন্ত॥

*　　　　*　　　　*

সজি কসণা, কবি লাজ গ্রহি, চঢ়িয়উ সাল্হ কুমার।
করহ কর কউ শ্রবণ সুনি, নিদ্রা জাগি নার।" (পৃঃ ৮০-৮১)

মালবনী পনের দিন দিনরাত জাগিয়া রহিল, প্রিয়তমাকে প্রেম-সাগরের মাঝ-তরঙ্গে ভাসাইয়া রাখিল। একদিন প্রবল ঘুমের ঘোরে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন। সাল্হকুমার (ঢোলা) উটের পিঠে, পেটে বন্ধন-রজ্জু কষিয়া লাগাম হাতে লইতেই উটের (সাঙ্কেতিক) শব্দে নারী জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু ঢোলা তখন দৃষ্টির বাহিরে।

১০

কাব্যরসিকগণের বিচারে "মালবনীর বিলাপ" দোহার সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী অংশ। পরবর্তী কালেও হিন্দী সাহিত্যে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সীর পদ্মাবত কাব্যে "নাগমতীর বিরহ-বর্ণনা" ব্যতীত ইহার সহিত তুলনার যোগ্য অন্য কিছু নাই। মারুর দুঃখের সহিত মালবনীর দুঃখের তুলনা হয় না। যাহার স্বামী-সন্দর্শন মনেই ছিল না, ধ্যানে পতির মানসমূর্তি কল্পনা করিয়া যে নায়িকা বাস্তবের উপাসনা করিতেছিল, তাহার দুঃখ তীব্র হইলেও মালবনী-র দুঃখের তুলনায় উহা ভাব-বিহ্বলতা মাত্র; রুক্মিণীর হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিয়া রোদন,—সত্য-ভামার প্রাণে ষোড়শ কিংবা ষোল শত সপত্নী শল্যের ব্যথা উহাতে কোথায়? দুঃখান্তে মারুর সুখের মাধুর্য ঘোরান্ধকারে দীপ দর্শন—যে দীপ অবশিষ্ট জীবনের অখণ্ড-প্রদীপ। দুঃখের সহিত মালবনীর পূর্ব পরিচয় নাই; স্বামীগৃহে তিনি অধিশ্বরী, স্বামীর যৌবন-সঙ্গিনী, স্বামীর প্রেম তাঁহার সঞ্জীবনী-সুধা। মারুর বিলাপ মনোজ-বিরহের অস্থিরতা; উহাতে মিলনে ছেদ-ঘটিত বাস্তব বিরহের তীব্রতা এবং সহস্র সুখ-স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন কোথায়? মালবনীর বিলাপে কামনা নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষও নাই। ইহাতে আছে স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস, এবং স্বামীর মঙ্গল

কামনা। স্বামীর স্পর্শ গৃহসজ্জার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন, তিলক কাজল তাম্বূল ত্যাগ, অর্ধোন্মত্ততার অসংলগ্ন প্রলাপ—অতি সাধারণ, অথচ অনন্য-সাধারণ সহৃদয়তা ও করুণ অনুভূতির বস্তু।

ঢোলা-র সঙ্গে সঙ্গে মালবনীর শ্বাসবায়ু ছাড়া সবই গিয়াছে, মায়াবিনী আশা তবুও তাঁহাকে মাথায় বুদ্ধি ও কর্মে প্রেরণা যোগাইতেছে। ভ্রাতৃকল্প আদরে প্রতিপালিত তাঁহার এক তোতাপাখী ছিল। নারবার দুর্গ হইতে অরুণোদয়ে মুক্ত হইয়া সুচতুর শুক চন্দেরী ও বুন্দীর মধ্যবর্তী কোনস্থানে রাজার কাছে পৌঁছিল। তখন তিনি গাছের কচি ডাল ভাঙিয়া দাঁতন করিতেছিলেন। শুক ব্যস্ত হইয়া বলিল, রাণী মালবনী আপনার যাত্রার পর গতাসু হইয়াছেন, আপনি ফিরিয়া চলুন।

প্রিয়ার মুমূর্ষু অবস্থা শুনিলে ঢোলা হয়ত বাড়ী ফিরিতেন, কিন্তু মৃতের জন্য শোক ও প্রারব্ধ কার্য হইতে বিরতি তিনি অনুচিত মনে করিলেন। তাঁহার শেষ কর্তব্যের ভার তিনি শুককে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, নয় মণ চন্দন এবং এক মণ অগুরুর চিতা সাজাইয়া মালবনী-র দাহকার্য সম্পন্ন করিবে; আমার স্থলবর্তী হইয়া তুমিই যথারীতি মৃতার জন্য সাই (শ্মশানে বুক চাপড়াইয়া মারোয়াড়ী শোককৃত্য) করিবে।

চাল বানচাল হইল দেখিয়া শুক সত্য গোপন করিল না। রাজাকে আশীর্বাদ দিল, আপনার সিদ্ধিলাভ হৌক। মালবনী আপনার দাসী; হতভাগিনীকে ভুলিবেন না। "দোহা"-র টিয়াপাখী পদ্মাবত কাব্যের "হীরামন" তোতার পূর্বপুরুষ; তবে ঘর-ভাঙ্গানী প্রেমের মন্ত্রদাতা রাজ-গুরু নহে, পাখী ঢোলা ও মালবনী উভয়ের সমান হিতাকাঙ্ক্ষী। শুক রাজার কথাগুলি গোপন রাখিয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া মালবনীকে শুনাইয়া দিল, যাহার রেকাবে পা, হাতে লাগাম্ তাহার মর্জি না হইলে কে তাহাকে ফিরাইবে? মালবনী-র আশার আলো নিবিল, পুরুষের প্রেমের উপর তাঁহার আর আস্থা রহিল না। তিনি শোকের আবেগে একবার ঢোলাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, তুমি ঠগ, তুমি কপট প্রেমিক। দুর্জনের ভালবাসা এবং পাহাড়ী নালার স্রোত,—দুইটাই প্রথমে কূল ভাসাইয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসে, পরক্ষণে শুধু বালু ও পাথর। তোমার প্রেম সুরাভাণ্ডের[১২] সহিত শরাবীর সোহাগ, মাল ফুরাইলেই ঘাড় মটকায়। জলের

১২। রাজপুতানায় সেকালে মদের বোতল ছিল না। ঐ দেশে হাঁসের আকৃতি মাটির সুরাই সুরাদেবীর বাহন ছিল। এই জন্য রাজস্থানে ইহার প্রচলিত নাম বতক (হিঃ বত্তক্)। মূলে আছে —...মতবালা যো বতক জ্যউ প্রিয় নইঁ পরহরিয়াহ। (পৃঃ ৯৭)

মাছকে ডাঙায় তুলিলেই ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে, জল মনের আনন্দে তর্‌ তর্‌ করিয়া বহিয়া যায়।

মালবনী আবার গলিয়া জল হয়, আকাশে কালো মেঘ হইতে চায়; কেননা সে মেঘ হইলে ঢোলা-র মাথায় রোদ পড়িতে দিত না। তাহার স্থূলদেহ শূন্য পতিগৃহে, মন সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া প্রিয়তমের অনুসরণ করিতেছে, মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছে যেন যে পথে ঢোলার উট চলিয়াছে সে পথের ধারে ধারে বৃক্ষলতা অনাবৃষ্টিতেও সবুজ হইয়াছে। এক সতেজ "জাল"-গুল্মকে মালবনী (মোহ অবস্থায়) জিজ্ঞাসা করিল, তোমার গোড়ায় কেহ কি জল ঢালিয়াছে? বায়ু তাড়িত পত্রহীন "জাল" জানাইয়া দিল—কেহ জল ঢালে নাই; তবে ঢোলা আমার ছায়ায় উট বাঁধিয়াছিল।

১১

সেইদিন "কলেবা"-র (প্রাতরাশ, ছোটা হাজিরী, নাস্‌তা) সময় ঢোলার উট পুষ্কর পৌঁছিয়া গেল। পুষ্করের কিছুদূর হইতেই রাজপুতনার থল বা মরুস্থলী। ঢোলা এইখানে বিশ্রাম করিয়া উটকে কাঁটা ঘাস উট-কাটরা ও করীল গাছের ডালপালা খাইতে দিলেন। অখাদ্য দেখিয়াই রাজার উটের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া উট সাফ জবাব দিল, পঞ্চাশ দিন উপবাস করিলেও এই জিনিস সে কিছুতেই খাইবে না। ঢোলা অনেক সাধাসাধি করিয়া বলিল, যে তোকে নিত্য কিশমিশ খাইতে দিত সে এখন বহুদূরে। এইখানে নাগর-বেলি কোথায়? উট জবাব দিল, কপালে দুঃখ আছে। এই দেশ অতি বিরংগা [বাজে জায়গা]। শ্বশুর-বাড়ীর নিন্দা নূতন জামাতা বাবাজীর প্রাণে লাগিল:

করহা দেস সুহামনউ, জে মূঁ সাসরবাড়ি।
আব্‌ সরীখউ আক্‌ গিনি, জালি করীরাঁ ঝাড়ি॥ (পৃঃ ১০০)

(আরে উট! এই দেশ বড় সুন্দর, বড়ই মধুর। ইহা আমার শ্বশুরবাড়ী। এই দেশের আকন্দ? আহা! অন্য জায়গার আম। এই দেশের করীরের ঝাড় যেন (ছায়া-ঘন) জালবৃক্ষ!)

কথায় উটের পেট ভরিল না, যেহেতু সে জামাই নহে; ঢোলা-র চোখে মনে "রং" ধরিয়াছে, ধূ ধূ বালু সে রাঙ্গা দেখিবেই।

ঢোলার উট ঝড়ের বেগে আরাবল্লী পর্বতের সানুদেশ পার হইয়া চলিয়াছে।

ঐখানে একটা টিলার উপর বিশ-বাইশটা ছাগল লইয়া এক গডরিয়া পশুচারক বসিয়াছিল। সে পথিক-কে লইয়া রসিকতা করিবার মতলবে হাঁক দিয়া বলিল, সাবাস্ জোয়ান্! ঘরে কি কোন মুগ্ধা তোমার পথ চাহিয়া আছে, যাহার আশায় দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়ার মুখে উট হাঁকাইয়া চলিয়াছ? গ্রামীণের সহিত কবিত্ব করিতে গিয়া ঢোলা ভাষা পাইল না।[১৩]

"মারু" শব্দটা শুনিয়া গাডলের বুদ্ধি ঠাওরাইল পরদেশী মারু ছোকড়ীর তালাশে আসিয়াছে, হালের খবর জানে না। সে বলিল, "মারু এখন আমার ঘরকন্না করিতেছে, কালই ছাগল চড়াইতে আসিয়াছিল।" প্রেমে পড়িলে মানুষ কি কার্য না করে, অজা-র অভক্ষ্য উদ্ভিদ কি আছে? এই জন্য প্রেম-গাথার কবিগণ নায়ক-দিগের জন্য একটা "গুরু" খাড়া করিয়া সঙ্কট-মোচন করেন। জ্যায়সীর নায়ক রতন সেনের "গুরু" ছিল সুবিজ্ঞ "হীরামন" তোতা। দোহা-র মরুবাসী কবি উটকেই সর্বাপেক্ষা ভালরকম জানেন, সুতরাং ঢোলা-র উট প্রভুর নিভৃত সুহৃদ, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক।

পশুচারকের কথা শুনিয়া ঢোলা বজ্রাহতের মত নিশ্চল ও অসাড় হইয়া পড়িলেন। উট ধমক দিয়া বলিল, "চল চল, রাস্তা ধর। এই বেটা উজবুক্ (গঁমার, পাড়াগেঁয়ে) মিছা কথা বলিতেছে, তাহার স্ত্রী অন্য কোন মারু হইবে।" একটা ফাঁড়া না কাটিতেই অন্য একটা উপস্থিত। নিকটে একজন চারণ ঢোলা-র জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। চারণবাবা নিতান্ত হিতৈষীর ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ জমাইল। চারণের মুখে শুনা গেল, যে "মারু"-র জন্য তিনি চলিয়াছেন, সে মারু এখন অথর্ব বুড়ী হইয়া গিয়াছে। ঢোলা দিশাহারা হইয়া উটের কাছে বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! হায়! ফিরিয়া গিয়া দেশে কি বলিব? উট প্রভুকে অনেক বুঝাইল। চারণ যে ঠগ, মিথ্যাবাদী—এই কথা ঢোলার প্রত্যয় হইল না। ঐ ব্যক্তি আসলে উমরাসুমরা নামক লম্পট রাজপুত দস্যু সর্দারের গুপ্তচর ছিল।

দোলায়মান চিত্তে ঢোলা আরও কিছুদূর চলিলেন। পথে আর একজন চারণ "মহারাজের জয় হোক" (শুভরাজ) বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিল। চারণের নাম বিশু, বোধ হয় পূগল হইতে আসিতেছিল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া

১৩। "জই রুঁখা মারু হুই ছবডউ পড়িয়উ তাস।
তই হুন্তী চন্দউ কিয়ই, লই রচিয়উ আকাস॥ (পৃঃ ১০২)

[যে গাছ হইতে মারু উৎপন্ন হইয়াছিল (?) উহার এক টুক্‌রা ছাল মাটিতে খুলিয়া পড়িয়াছিল। বিধাতা উহাকে চন্দ্রমা করিয়া আকাশে স্থাপন করিয়াছেন]

বিশু চারণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইল; কিন্তু ঢোলার সন্দেহ ঘুচিল না। অবশেষে বিশু চারণ বলিল, রাজকন্যা মারু-র বয়স যখন মাত্র দেড় বৎসর এবং আপনার তিন বৎসর তখন আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মরু যদি বিগতযৌবনা শুক্লকুন্তলা হইয়া গিয়া থাকেন তবে আপনার এই নবীন যৌবন কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এইবার ঢোলার ভ্রম ঘুচিল। তিনি বিশু চারণকে পাইয়া বসিলেন এবং মারুর রূপগুণের যথাযথ বর্ণনা তাঁহার মুখে শুনিতে চাহিলেন।

১২

পূর্বেই বলা হইয়াছে দোহা-রচয়িতা গ্রাম্য আসরের কথক; গ্রামের আসরে মরুবাসী সাধারণ লোকের রসতৃপ্তির জন্যই তাঁহার উদ্যম। কবি-র কিছু পুঁথিগত বিদ্যা থাকিলেও উহার দৌড় বেশীদূর নহে। তাঁহার চিত্তহারী কল্পনাশক্তি নাই, ভাষায় শব্দসম্পদ নাই; সৃজনী-প্রতিভার অন্তরালে নিপুণ ললিতকলা অপরিস্ফুট। মারু-র রূপবর্ণনার উপমায় গতানুগতিক খঞ্জন, কোকিল, হরিণ, সিংহ, হাতী ইত্যাদি ব্যতীত মৌলিক কিছুও পাওয়া যায়। উপমার দ্বারা বুঝাইতে অপারগ হইয়া কবি সোজা বলিয়াছেন সিংহিনীর ন্যায় সুমধ্যমা মারু-র কোমর দুই আঙুল মোটা![১৪] উপমার মধ্যে উদ্ভটতা ও নূতনত্ব দুইটারই সমাবেশ হইয়াছে। যথা—মারু আম্র মুকুলের ন্যায় স্পর্শ-কাতর, ছুঁইলেই শুকাইয়া যায়। এমন সুকুমারী, যেন হাওয়া লাগিলে পাকা আমের মত টুপ করিয়া মাটিতে পড়িবে। নায়িকার নাক সরু শলাকার মত সরল তীক্ষ্ণাগ্র। মারু "কর্ণিকার" স্তবকের ন্যায় দীর্ঘাঙ্গী (সোঁদাল ফুলের থোকা? কণয়র-কম্বু)। তাঁহার শুঠাম দেহ ঋজু, বিশেষতঃ দীর্ঘ পদদ্বয় তীরের মত সোজা। তিনি গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় গৌরাঙ্গিনী এবং উজ্জ্বল হীরক-দশনা, তাঁহার মুখ-মণ্ডল আদিত্য-মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল কিংবা উজ্জ্বলতর (আদীতাহঁ উজ্জলী); হরিণী নয়না হইলেও কবুতরের চোখের মত লালিমাযুক্ত, ঠোঁট এবং চোখ দুইটি মধুভরা,"মারু" মাধুর্যে যেন কিশমিশ (দাখ)! মারু-র রূপের উপমাস্থল নাই, বিশু চারণ তাদৃশ দেখে নাই;—তবে সূর্যোদয়ে প্রভাত-রবির প্রথম কিরণচ্ছটা মারু-র রূপের ঝলক বলিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রম জন্মাইতে পারে—

থোড়ো সো ভোলে পড়ই দণয়র উগহন্তাই।

১৪। মূল—মারু-লঁক দুই আংগুল' (পৃঃ ১০৯)। বেলির নায়িকা রুক্মিণীর কটিও মুষ্টিগ্রাহ্য।

প্রেমগাথার অপরিহার্য অঙ্গ শৃঙ্গার (নখশিখ-নিরূপণ, রূপ-সজ্জা) এই অংশ দোহার কবি বিশু চারণের মুখে এবং অন্যত্র বাসরসজ্জায় শুনাইয়াছেন। এই বর্ণনায় চমৎকারিতা আছে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং উপমায় কিঞ্চিৎ হাসির খোরাকও আছে। রূপসজ্জায় বেলি-কাব্যের রুক্মিণী যেন "যোধপুরী" বেগম—রূপসজ্জায় মারোয়াড়ী পদ্ধতির সহিত মোগলাই ভেজাল। দোহার নায়িকা মারুর রূপসজ্জায় কোন বিজাতীয় ভেজাল নাই; ইহা আদি এবং অকৃত্রিম; মরুস্থলীতে যে রূপসজ্জা মরুকন্যারা সে যুগে করিত, এ যুগেও করে, এবং যাহা জয়সলমীর রাজ্যের "ঠাকুরাণী"-র (সামন্ত-গৃহিণী) কিংবা কলিকাতায় নবাগতা শেঠানীদের পায়ে সোনার নূপুর ব্যতীত অঙ্গে অন্য অলঙ্কার অন্দরমহলে দেখা যায়। যথা—মাথায় সিসফুল (অলকে "নব-কুরবক" নহে); সিঁথির ঝাঁপা (?)। ভুরুর উপরে কপালে সোহিলী[১৫]; কানে কুণ্ডল; নাকে নকফুলি (বাংলা নাক-ফুল)[১৬]; গলায় টকাবল[১৭] হার। দুই বাহুতে বাউটি (বহরখা; বেলি-র বাজুবন্ধ); কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতীর দাঁতের পেঁচদার এবং আঁটাআঁটি চুড়া বা চুড়ি (প্রোচি; পইছাঁর বিকল্প)। মণিবন্ধে 'স্রস্তং স্রস্তং" কনক-বলয়ের স্থানেও মামুলী ঢিলা চুড়ির গোছা। কটিবন্ধে মেখলা (রাজস্থানী করধনী), পায়ে ঝনক্ ঝনক্ "ঝাঁঝর" [নূপুর], পরিধেয় বস্ত্র শাড়ী কি ঘাঘরা বুঝা যায় না, তবে কাঁচুলি আছে। উহা কোন মাপের জানা যায় না; যেহেতু প্রকাণ্ড কিছু না হইলে মারোয়াড়ীর মন উঠে না। বিদ্যাপতি যে প্রত্যঙ্গের "কনক-কচৌরা" উপমা দিয়াছেন মারোয়াড়ী কবি সেস্থলে কল্পনা করিয়াছেন করী-কুম্ভ! বেলির নায়িকা রুক্মিণীর কাঁচুলি যেন মত্ত হস্তীর দৃষ্টিসঙ্কোচক সচঞ্চল প্রাবরণ!

১৫। দোহা ভুমুঁহা উপরি সোহলো পরিঠিউ জাণি কা চংগ। (পৃ: ১১০)

মারু ভুরুর উপর সোহলী ধারণ করিলে মনে হয় যেন আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে।

বেলির কবি লিখিয়াছেন—মুখ ও মাথার সন্ধিস্থলে রত্নমণ্ডিত "তিলক"। (পৃঃ ১২)

১৬। দোহা পৃঃ ১৩৮। নথ, বেসর, আংটা ইত্যাদি উল্লেখ নাই। এইগুলি দোহার রচনাকালের পরেই সম্ভবতঃ প্রচলিত হইয়াছিল। বেলির কবি লিখিয়াছেন, রুক্মিণীর নাসাগ্র হইতে মুক্তাফল দুলিতেছিল, যেন শুকদেব ভাগবত পাঠ করিতেছেন। (পৃঃ ২১)

১৭। দোহা পৃঃ ১১৪। দোহার শ্রোতাগণের চিরপরিচিত টঁকাবল, আজও প্রচলিত। ইহা রূপার আধুলি ও পুরানো টাকার সূতায় গাঁথা ছড়া। মারু-র পিতা নামে মাত্র রাজা। তাঁহার কন্যার গায়ে মামুলী রূপার গহনা; তবে কন্যার বর্ণের আভায় রূপাও সোনা বলিয়া মনে হইত। [সোই ঝঁাখউ সোবস্ত জো গলি পহিরউ রূপকউ]

বেলির নায়িকার গলায় মুক্তার বহু-লহরী মালা; কোথাও রূপার স্থান নাই (পৃঃ ২০)।

কিন্তু চারণের কথা শুনিতে শুনিতে দেশ-ছাড়া প্রেমের পাগল ঢোলা আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, উটের অসহিষ্ণুতা, অস্তাচলগামী সূর্য, পূগলের অফুরন্ত পথ যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। চারণ আবার শুনাইল :

"গতি গঙ্গা মতি সরসতী সীতা সীল সুভাহ।
মহিলা-সরহর-মারুই অবর ন দুজী কাহ॥
নমনী, খমনী, বহুগুণী, সুকোমলী, জু সুকচ্ছ।
গোরী গংগা-নীর জ্যু, মন গরবী, তন অচ্ছ॥

*　　　　*　　　　*

মৃগনয়নী, মৃগপতি-মুখী, মৃগমদ তিলক নিলাট।
মৃগরিপু-কটি, সুন্দর বাণী, মারু অইহই ঘাট॥

*　　　　*　　　　*

থল ভূরা, বন ঝংখরা, নহী সুচম্প উপজাই।
গুণে সুগন্ধী মারবী, মহকী সহু বনরাই।

*　　　　*　　　　*

তেতা মারু মাহি গুণ, জেতা তারা অন্ত।
উচ্চল-চিত্তা সাজণা, কহি ক্যউ দাখউ সন্ত॥

অর্থাৎ—(মারুর) গতিভঙ্গী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় ধীর-গম্ভীর। তিনি জ্ঞানে সরস্বতী, সীতার ন্যায় সুশীলা। মহিলামণ্ডলে তিনি অদ্বিতীয়া। তিনি বিনয়শীলা, ক্ষমাশালিনী, সুকুমারী, "সুকক্ষা" (of handsome bust), বহুগুণসম্পন্না, গঙ্গানীর-গৌরী, মানিনী, তন্বী। (মারু) মৃগনয়নী, মৃগপতি-মুখী,[১৮] ললাটে মৃগমদ-তিলক-ধারিণী ক্ষীণকটি, সুমধুরভাষিণী, দেহসৌষ্ঠবশালিনী।

মরুস্থলী (থল) বালুকাধূসর, অরণ্যানী শ্যামশ্রীবিহিনা (হিন্দী ঝংখাড়) ; ঐখানে

১৮। প্রথম সংস্করণে মৃগপতি-মুখী অর্থাৎ চন্দ্রমুখী এবং কবির পূর্বোক্ত সূর্যমুখী পরস্পর-বিরোধী উপমা বলিয়াছি এবং কবিও সাহিত্যিকগণের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্রোক্তিও করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলাম—contradiction ইতিহাসে দোষাবহ হইলেও কাব্যে ও সাহিত্যে দোষণীয় নহে; যেহেতু মনুষ্যচরিত্রই পরস্পরবিরোধী দোষগুণের সমষ্টি। অধিকন্তু দেখা যায়, কোন কোন ঐতিহাসিক কৃত্রিম সামঞ্জস্যের খাতিরে ইতিহাসে বাস্তবকে অবাস্তব করিয়া ফেলেন। পূর্বের পাদটীকা এই সংস্করণে বাতিল করা হইল।

চাঁপাফুল ফুটে না; কিন্তু মরুদুহিতার গুণসৌরভে মরুদেশ সুরভিত। আকাশে যত তারা মারুর তত গুণ। হে উচ্ছল-চিত্ত ভালমানুষ, উহার সমস্ত গুণ বর্ণনা করা কেমন করিয়া সম্ভব?

এইবার ঢোলার চৈতন্য হইল, বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। তিনি বিপ্র চারণকে এক মোহর বকশিশ দিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার আগমন সংবাদ পুগলে পৌছাইবার জন্য বিদায় দিলেন। নায়কের "ঘড়ী" অর্থাৎ ২৪ মিনিটে যোজনগামী উষ্ট্রংত্ব অপেক্ষা দ্রুততর-গতি কোন্ বাহনে চড়িয়া চারণ পুগলে গেল কবি আমাদিগকে বলেন নাই। এই দিকে ঢোলা উটে চড়িয়া এক এক বারে দশ দশ ছড়ি মারিয়া, গালাগালি করিয়া বেচারা উটকে অস্থির করিলেন। গালাগালি ও প্রহারে উট উড়িল না দেখিয়া তিনি তোষামোদ আরম্ভ করিলেন:

করহা, বামন রূপ করি চিহু চলণে পগ পূরি।
তু থাকাউ উসনউ ভুঁই ভারী, ঘর দূরি॥

[হে করভ, তুমি ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করিয়া চরণ চতুষ্টয় দ্বারা পথ অতিবাহিত কর। তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, আমিও অবসন্ন; বিলম্ব অসহ্য হইয়াছে। পথ সুদীর্ঘ, গৃহ বহুদূর]

গৃহমুখী পথশ্রান্ত পথিক তথা প্রেমসাধনায় সিদ্ধির সমীপবর্তী সাধকের এই মর্মবাণী, (ভুঁই ভারী, ঘর দূরী) ঢোলার দীর্ঘশ্বাসের সহিত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানবের জীবন-মরুর বুকে প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে।

ঢোলার উট ক্ষণজন্মা পশু। সে কথা দিয়াছিল মরু-বধূ ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বেই যাত্রার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মালিককে পুগল পৌছাইয়া দিবে। উট ঢোলাকে আগতপ্রায় সন্ধ্যায় আশ্বাস দিয়া বলিল, ছড়ি মারিও না, লাগাম ছাড়িয়া দাও, পাগাড়ী ঠিক রকম করিয়া বাঁধ। মধ্যরাত্রিতে নারবার পশ্চাতে রাখিয়া পরের দিন সন্ধ্যা-বাতির সময় অর্থাৎ বিশ ঘণ্টার কম সময়ে উট পুগলের কাছে পৌছিয়া গেল।[১৯] নিকটে একজন চাষা প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া "থল" দেশের "ষাট-পুরুষ"

১৯। "দোহা" সম্পাদক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন নারবার দুর্গ হইতে পুগলের দূরত্ব প্রায় ১২৫ ক্রোশ (২৫৫ মাইল আনুমানিক) এবং এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে, ঢোলার উটের পক্ষে কুড়ি-একুশ ঘণ্টায় এই রাস্তা অতিক্রম কঠিন হইলেও অসম্ভব নয় (ভূমিকা পৃঃ ১০৪)। এইরূপ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় বঙ্গ সন্তানের সমালোচনায় আমরা অদ্যাবধি পাই নাই। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কাঞ্চীপুর বর্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥"

(প্রায় ৩৬০ ফুট) গভীর কূপ হইতে জল টানিতেছিল। ঢোলা চাবার দুঃখে গলিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ভাল কথা বলিলেন। জল-টানা গোঁয়ার ইহাতে রাগ করিয়া ধমক্ দিল—ঘরে যাও, আমার জন্য তোমার কি দুশ্চিন্তা? মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জল টানিয়া আমি জলাধার ভরাইয়া থাকি! গায়ে পড়িয়া নীচের প্রতি দরদ দেখাইতে যাওয়া মানব-প্রেম নহে; আকাট মূর্খতা।

১৪

শুভসংবাদ বিশু চারণ পূর্বেই আনিয়াছিল। গরীবের দেশে জামাতার অভ্যর্থনা এবং ভোজন ব্যাপার অত্যন্ত গদ্যময়; এই জন্য কবি নীরব। যাঁহার পথ চাহিয়া চাহিয়া এতদিন মরু-বধূর চোখ জলে ভাসিয়াছিল—তিনিই আসিয়াছেন। প্রিয়তমের আগমনে কবি-পরম্পরাগত নায়িকার হর্ষ, পুলক, স্বেদ রোমাঞ্চ ইত্যাদি ভাব-বিলাস মরুবাসী গ্রামীণ শ্রোতার অনুভূতি ও কল্পনা বিভ্রান্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় দোহার কবি কিছু মোটা অথচ অতি মৌলিক উৎপ্রেক্ষার দ্বারা প্রিয়সমাগমে মারুর আনন্দের আতিশয্য আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; উহার কবিত্ব ভোঁতা মনের উপরও দাগ কাটে। আনন্দে অর্ধোন্মাদিনী মারু সখীকে বলিতেছেন :

> সোই সজ্জন আবিয়া জঁহিকী জোতী বাট।
> থাঁভা নাচই, ঘর হঁসই, খেলন লাগী খাট॥

অর্থাৎ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুজন বঁধূ আসিয়াছেন। (দেখ, দেখ, দালানের) থাম নাচিতেছে, ঘর হাসিতেছে, খাট (চার-পাই) খেলা জুড়িয়া দিয়াছে!

ঢোলা শ্বশুরবাড়ীতে পনের দিন ছিলেন, তিনি মারুর জন্য মুক্তার মালা আনিয়াছিলেন। বাসরঘরে মারু উহা হাতে লইয়া হাসিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন। অজুহাত, তাঁহার হাতের মেহেদীর রং ও চোখের কাজল নির্মল (??) মুক্তার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া গুঞ্জাফল (কুঁচের বীচ) ভ্রম জন্মাইয়াছিল। দিন-রাত্রির অষ্ট-প্রহরের দাম্পত্যক্রীড়া কবি উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা মরুদেশের অমৃততুল্য অজা-দুগ্ধপক্ক পায়সান্ন, যাহা দেবতার ভোগে লাগে না, পাঠক-পঙ্‌ক্তিতে পরিবেশন করা যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ম্যাপে পথ মাপিয়া ঘড়ি ঘণ্টা হিসাব করিয়া ছয় দিনে নায়ক সুন্দরের ঘোড়ার পক্ষে বর্ধমান পৌছানো সম্ভব কিনা কোন বাঙালী প্রমাণ করিলেন না!

কবি এরূপ বিবেকপরায়ণ সমালোচককে কি পুরস্কার দিতেন অনুমান করা কঠিন নয়।

বহুমূল্য যৌতুক, বিস্তর উট-ঘোড়া, দাস-দাসী লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়া পিঙ্গল রায় কন্যাকে পতিগৃহে বিদায় দিলেন। পূগল হইতে যাত্রা করিবার পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বে এক জায়গায় ঢোলা তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। রাত্রিতে নিদ্রিতা মারুর মুখে কস্তুরীর গন্ধে আকৃষ্ট মরুভূমির এক পীহনা সাপ মোহনলতা ভ্রমে সুন্দরীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রভাতে তাঁহার প্রাণবায়ু নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ঢোলার তখন ইন্দুমতী-হারা অজ রাজের অবস্থা, তবে দোহা দূরের কথা, ভূভারতে অন্য কেহ কবি কালিদাসের অজবিলাপের সহিত তুলনীয় বিলাপ লিখেন নাই। শ্বশুরবাড়ীর শোকার্ত লোকজন ঢোলাকে গ্রামীণ শ্মশানবন্ধুর ন্যায় প্রবোধ দিয়া বলিল, বাড়ীতে ফিরিয়া গেলে তাহারা মারু অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় এবং তিন গুণ অধিক সুন্দরী আর এক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়াইবে। ঢোলা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; অল্পমাত্র কয়েকজন লোক ব্যতীত অধিকাংশ লোকজন পাগলের সঙ্গ ত্যাগ সুবুদ্ধির কাজ বিবেচনা করিয়া পূগলে ফিরিয়া গেল। ঢোলা প্রিয়ার সহিত সহমৃত হইবেন স্থিরনিশ্চয় করিয়া চিতা সাজাইতেছিলেন এবং প্রায় অগ্নিপ্রবেশ করিবেন এমন সময় এক যোগী ও যোগিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঢোলাকে বাধা দিয়া যোগী বলিলেন:

নর নারীস্যূঁ ক্যঁা জলই, নরস্যূঁ নারি জলন্ত।
সাল্হকুঁবর, জোগী কহই, অহলউ কেম মরন্ত॥

[যোগী বলিলেন, পুরুষ নারীর সহিত কেন পুড়িয়া মরিবে? নারীই পুরুষের সঙ্গে জ্বলিয়া মরে। সাল্-হ্ কুমার, প্রাণটা বৃথা বিসর্জন দিও না।]

শুদ্ধ প্রেমে পতঙ্গ-বৃত্তি প্রেমিক ঢোলা যোগীকে ধমক্ দিয়া বলিল, ওহে যোগী! আমি পুড়িয়া মরিব, তাতে তোমার দুঃখ কি? পথিক তুমি, নিজের রাস্তা দেখ, পরের কথা লইয়া মাথা ঘামাইও না। যোগী বিমনা হইলেন; কিন্তু যোগিনী তাঁহাকে শাসাইলেন, হয় মৃতা নারীকে বাঁচাইয়া দাও, না হয় আমি ইহাদের সহিত চিতায় ঝাঁপ দিব। যোগী ফাঁপড়ে পড়িলেন; যেহেতু যোগিনী সুন্দরী, তাঁহার কাছে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। তিনি কমণ্ডলুর জল মন্ত্রপূত করিয়া মৃতা মারুর মুখে ছিটাইয়া দিলেন, অমানিশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া সহসা শরৎচন্দ্রমা হাসিয়া উঠিল; যোগী-দম্পতী (হর-পার্বতী) লীলা শেষ করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ঢোলা নিজের উটে মারুকে উঠাইয়া অনুচরবর্গকে লটবহর লইয়া পশ্চাতে আসিবার হুকুম দিলেন। পথ চলিতে চলিতে মনের আনন্দে তাঁহার হুঁশ রহিল না।

রক্ষীদিগকে ছাড়িয়া তিনি বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। মারুর নাকে ধূলার গন্ধ লাগিল, কানে ধাবমান অশ্বপদধ্বনি ভাসিয়া আসিল। ইহা দুর্লক্ষণ অনুমান করিয়া মারু উটকে সাবধান করিয়া বলিলেন, হয় কাহারা প্রাণভয়ে পলাইতেছে, না হয় আমাদের অচিন্ত্য হানি আছে (কাঁই অচন্তী হাঁন)। এমন সময় পথিমধ্যে এক অশ্বারোহী পিছন হইতে ডাকিল : ঠাকুর হো, একাকী এইভাবে কোথায় চলিয়াছ ? আমরা নারবার যাইতেছি। একটু বিশ্রাম করিয়া অমল-পানি (আফিম্ জলযোগ) করা হোক !

নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে অসন্দিগ্ধচিত্ত ঢোলা উটকে বসাইয়া দুইজনেই নামিয়া পড়িলেন। উটের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, লাগাম ও ছড়ি মারুর হাতে দিয়া ঢোলা আতিথেয়তা গ্রহণ করিতে গেলেন। মজলিসে আফিম শরাব গীতবাদ্য চলিতেছিল, ঢোলার মন উহাতে ডুবিয়া রহিল। ঐখানে মারুর পরিচিতা পুগলের এক ডোমনী (নীচজাতিয়া গীতবাদ্যনিপুণা পেশাদার নর্তকী) সারেঙ্গী বাজাইতেছিল। আসল ব্যাপারের আঁচ সে পূর্বেই পাইয়াছিল। মারুকে সাবধান করিবার জন্য তাহার তন্ত্রীর তানে ঝঙ্কার উঠিল :

তত তণক্কই, পিউ পিয়ই, করহউ উগালেহ।
ভল বউলাবো দীহড়া, দই বলাবণ দেহ ॥
থল মথ্থই উজ্জাসড়উ, থে ইন কেহই রংগ।
ধন লীজই, প্রী মারিজই, ছাঁড়ি বিউনউ সংগ ॥[২০]

[তন্ত্রী ঝন্ ঝন্ বাজিতেছে, প্রিয়তম শরাবের পেয়ালায় চুমুক বসাইয়াছে, উট বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে। দৈব যদি প্রতিকূল না হয় দিন ভালই কাটাও।

২০। দোহা, মূল পৃঃ ১৪২-৩। কবি অজ্ঞাতসারে মরুভূমির প্রায় দৈনন্দিন দুর্ঘটনা এবং মারোয়াড়ী চরিত্রের একটা দিক ইঙ্গিতে এই স্থলে জানাইয়াছেন। বরযাত্রীর উপর হাম্লা করিয়া নূতন বৌকে ছিনাইয়া লওয়া ঐ দেশে প্রায় শুনা যায়। এমন কি জয়পুরের বাহিরেও বড় বড় শেঠজীর ছেলের বিবাহে একটি রাজপুত বালককে বরের বহুমূল্য জমকাল পোশাক পরাইয়া ঘোড়ায় চড়ানো হয়। বেচারা আসল বর সাধারণ পোশাকে ঘোড়ার পাশে পাশে চলে। দশ বিশ জন রাজপুত রক্ষী ব্যতীত দূরের জায়গায় কোন "বরাত" যায় না। "গোহ্নী"র (দ্বিরাগমন) দীর্ঘ ঘোম্টা-পরা বৌকে লইয়া স্বামী যাইতেছে; পথে বাহ্যে করিবার জন্য বোচ্‌কা ও বৌ বাখিযা জঙ্গলে গেল; ইতিমধ্যে নিঃশব্দে দু-ই গায়েব! রেলে দেখা যায় কাছা খুলিয়া শেঠজী প্ল্যাটফরমের বাহিরে লঘুশংকা করিতেছেন, ট্রেন ছাড়িয়া গেল। একবার মধ্যরাত্রে গন্তব্যস্থানে নামিয়া এক শেঠজী দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকের গাড়ীতে তাঁহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকে ঠাহর করিতে পারিলেন না; একজন হিতৈষী বন্ধু বলিল, "আরে! একঠো লেহি লে।"

থলের মধ্যে ইহা জনশূন্য উজার জায়গা। তোমার এই কেমন রঙ্গ (ঢংগ)? এখনই স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, স্বামীকে মারিয়া ফেলিবে; (ধূর্ত লম্পট) বিটলের (বিউ নউ) সঙ্গ ত্যাগ কর···(অবশিষ্টাংশে) আরে পাড়াগেঁয়ে আনাড়ী মারুণী! স্বামীকে বাঁচাইতে চাস্ তো উটকে ছড়ি মার্]

আশঙ্কা ভারাক্রান্তা মারুর কান অতি সজাগ ছিল। ছড়ির ঘা খাইয়া দুই পা বাঁধা উট হুড়মুড় করিয়া দৌড়িল; মারু লাগাম ছাড়িল না। উট পলাইল দেখিয়া ঢোলাও দৌড় দিল, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না। কিছু দূরে চোখের আড়াল হইবার পর মারু ঢোলাকে বলিলেন, উম্‌রাসুম্‌রা (সুমরাহ্ রাজপুত, নাম উম্‌রা) আমাদের পাছ লইয়াছে, লড়াই করিবে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ঢোলার মনে হইল স্ত্রী বাস্তবিক ঠিক কথাই বলিতেছে। উটকে বসাইয়া দুইজনে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু ভোলামন ঢোলা রায় উটের দুই পায়ের দড়ি খুলিতে ভুলিয়া গেলেন। শিকার হাতছাড়া হইল ভাবিয়া দুর্ধর্ষ উম্‌রা ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটাইল। পা-বাঁধা বাহাদুর উঠ দস্যুদলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আরাবল্লী পর্বতের দিকে অগ্রসর হইল।

১৫

পথিমধ্যে আর একজন চারণ ঢোলাকে "শুভরাজ" (ব্রাহ্মণের "জয়োস্তু") জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উপরে দুইজন সওয়ার, অথচ উটের দুই পা বাঁধা, ব্যাপার কি? ঢোলা এইবার অতিরিক্ত সাবধানী; উট হইতে না নামিয়া চারণকে একখানা ছুরি আগাইয়া দিয়া দড়ি কাটিয়া দিতে বলিলেন। পরের দিন ভোরবেলা উম্‌রার সহিত চারণের দেখা হইল। চারণ বলিল, ঢোলার পা-বাঁধা উটকে তুফানের বেগে "আরাবলা"র টিলা-টক্কর অতিক্রম করিয়া বড় "ঘাট" (গিরিবর্ত্ম) পার হইতে আমি দেখিয়াছি, এবং এই হাতে ঢোলার ছুরি দিয়া উটের পায়ের দড়ি কাটিয়াছি। তিনি এতক্ষণে নারবারের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়া থাকিবেন। উহার পিছনে ঘোড়া দৌড়াইয়া মিছামিছি ঘোড়া খুন করিও না।

ঢোলা নিরাপদে নারবার দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলগীত গাইয়া বর বধূর সংবর্ধনা করিল, নগরী উৎসবে মাতিয়া গেল।[২১]

২১। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই দোহার সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। কোন তৃতীয় শ্রেণীর কথাশিল্পীও আজকাল এই রকম কাহিনীর উপসংহার লিখিতে সাহসী হইবেন না। ইহার পরবর্তী অংশে কাব্য

কবি বলিয়াছেন, এক মহলে দুই রাণী লইয়া ঢোলা রায় সুখেই ছিলেন। অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; যেহেতু সে যুগ ছিল স্ত্রী-পক্ষে পুরুষের যুগ—নিতান্ত পুরুষ, কঠোর, স্বার্থকলুষিত ও নির্মম। সে যুগে দাম্পত্য-সুখের সংজ্ঞাই ছিল একতরফা; নারীর মনের বেদনা পুরুষকে বিচলিত করিত না। নূতনের মোহে পুরাতনের প্রতি সর্বত্র নিত্য এই অবিচার আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যাহা হৌক, মারোয়াড়ী হিসাব বড় পাকাপোক্ত। কবি বলিয়াছেন, ঢোলা নিয়ম করিয়াছিলেন প্রতি তিন রাত্রির এক রাত্রি মালবনীর, দুই রাত্রি মারুর। যিনি বিবাহ-জীবনের প্রারম্ভ হইতে এতদিন ঢোলার উপর ষোল আনা ভোগদখলের সত্ত্ব জারী করিয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি পাইলেন পতির সোহাগ ও সাহচর্যের পাঁচ আনা চার পাই অংশ। তাঁহার মনের আগুন কিছুদিন ধূমায়িত ছিল। একদিন তিনজন একত্র বসিয়াছেন; হঠাৎ দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়া গেল। ঢোলাকে উপলক্ষ করিয়া মালবনী মারুর বাপের দেশের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িলেন। তাঁহার বক্তব্য:

বাবা! (ভগবান অর্থে) আমি এমন দেশের মুখে আগুন দিই যে দেশের লোক আধা-রাতে উঠিয়া (কূয়ার জল টানিতে টানিতে) এমন "কুহ্ক্কড়া" (শ্রমলাঘব ধ্বনি) আওয়াজ দেয় যেন কেহ মরিয়া গিয়াছে! সে দেশের মুখে আগুন, যে দেশে জলের কষ্ট; যে দেশে স্ত্রীকে আধা-রাতে বিছানায় ফেলিয়া পুরুষ জল তুলিবার জন্য দৌড়ায়। বাবা! আমাকে মোটা-বুদ্ধি মারুয়া গড়রিয়ার (মেষ ছাগল যাহারা চড়ায়) হাতে দিও না, যেখানে মাথায় জলের ঘড়া ও কাঁধে কুডালি (জ্বালানী জঙ্গল কাটিবার জন্য টাঙ্গি) লইয়া ঘুরিতে হয়, থলের উজার বালুর মধ্যে বাস করিতে হয়...বরং কুমারী থাকিব তবুও মারুয়ার দেশে বিবাহ দিও না; মাথায় জলের ঘড়া, হাতে কাটোরা (রাজস্থানী "কচোলা", মৈথিলী কচৌরা অর্থাৎ গোষ্পদ হইতে জল কাটিয়া ঘড়া ভরিবার বাটি) লইয়া জল সিঁচিতে সিঁচিতে মরিয়াই যাইব।

"কেচ্ছা"র দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সুপণ্ডিত সম্পাদকগণ যাহা তুচ্ছ মনে করিয়াছেন অর্বাচীন অহিন্দীভাষী সমালোচক উহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পর তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণের বাকী জীবনে কি হইল ভাবিয়া ভাবিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্কিম-ভক্তগণের সুনিদ্রা হয় নাই, তখন তাঁহার অন্ততঃ ছয় শতাব্দী পূর্বে দোহার কবি আধুনিক সাহিত্য-শিল্পের অগ্রদূত হইবেন এমন আশা করাও অন্যায়।

পরে মারুকে সোজা শুনাইলেন :

"মারু, থাকই দেসড়ই এক ন ভাজই রিড্ড।
উচালউ ক অবরসনউ, কই কাকউ কই তিড্ড।
জিন ভূ ই পন্নগ পীয়না, কয়র-কঁটালা রূখ।
আকে-ফোগে ছাঁহড়ী, হুছাঁ ভাজই ভুখ॥
পহিরণ-ওড়ণ কম্বলা, সাঠে পুরিসে নীর।
আপনা লোক উভাখরা, গাড়র-ছালী থীর॥

অর্থাৎ ওহে মারুণী, তোমাদের দেশে লোকের বড় কষ্ট। কখনও উচালা (অন্নজলের দুর্ভিক্ষে দেশত্যাগ), কখনও বা অনাবৃষ্টি, না হয় পঙ্গপালের উপদ্রব, যেখানে পীহুনা সাপের বাস, দেশে করীলের ঝোপ ও উট-কাঁটরা ঘাস গাছের সামিল (এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে!), যেখানে লোক আকন্দের ঝোপ কিংবা ফোগের (কুলজাতীয় কাঁটা ঝাড়) নীচে ছায়া তালাশ করে, ভুরট ঘাসের কাঁটা ফল খাইয়া ক্ষুধার জ্বালা মিটাইয়া থাকে। যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মোটা কম্বল পরিয়া থাকে এবং ওড়নার জন্যও মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছু পায় না, যে দেশে "ষাঠ পুরুষ" (প্রায় ৪২৫ ফুট) জমির নীচে জল, যে দেশের লোকেরা ভিটামাটি ছাড়া যাযাবর বেদে, যে দেশের লোক ছাগল ভেড়ার দুধকে ক্ষীর (ঘন দুধের পায়েস) জ্ঞান করে —এমনই তোমাদের দেশ![২২]

২২। ইহাই মরুস্থলীর জীবনযাত্রার আলোকচিত্রতুল্য অতি বাস্তব বর্ণনা—যাহা এখনও অবাস্তব নহে। মারবাড়ের নিম্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য ও মোটা চালচলন সে যুগে রাজপুতানায় হাসির খোরাক যোগাইত। মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে অন্য রাজারা বলিতেন—

আক্‌রী ঝোপড়া ফোগ্‌রী বাড়
রাজরারী রোটি মোট্‌রা দাড় [ল]
দেখো হো রাজা তেরী মারবাড়।

ঘরে আকন্দ পাতার ছানি, চারিদিকে ফোগের (জঙ্গলী কুলকাঁটার) বেড়া। বাজরার রুটি "মট" নামক নিকৃষ্টতম ডাল—ইহাই মারবাউ।

ভুরট এক রকম বন্য ঘাস বা আগাছা, এক হাত দেড় হাত উঁচু। উহাতে একরকম কাঁটা ফল ধরে। উহার ভিতরের শাঁস কুরিয়া গরীবেরা রুটি তৈয়ার করে। ফোগ বা ফোক্ একপ্রকার জঙ্গলী কুল, ঝোপ তিন হাতের বেশী উঁচু হয় না, উহাতে আঁটিসর্বস্ব ছোট ছোট ফল হয়। দিল্লীতেও আমরা উহা শখ করিয়া খাইয়াছি, কোঁচা ভরিয়া গরীব মেয়েদের কুড়াইতে দেখিয়াছি। দিল্লীর পাহাড়ী এলাকা হইতে বেলুচিস্থান পর্যন্ত ফোগের ঝোপ ছাড়া প্রায় অন্য কিছু দেখা যায় না। উষর ভূমিতে পাহাড়ের গায়ে বনে-জঙ্গলে উহাই মানুষ ও পশুর আহার।

মারু ইহার জবাবে মালব দেশের নিন্দা ও মরু দেশের প্রশংসা শুনাইয়া দিলেন, যথা :

"বাবা! এমন দেশের মুখে আগুন যে দেশের জলের উপর শেওলা (সেবার) ভাসে, যেখানে গৃহস্থ বধূগণ দল বাঁধিয়া জল আনিতে যায় না, যেখানে (গভীর কূপ হইতে) জল টানিবার সময় পুরুষদের লয়তান-মধুর "কুয় কুয়" ধ্বনি শুনা যায় না; যে দেশের পুরুষের রস্‌কষ নাই (ফীকরিয়া), স্ত্রীলোকেরা সব "কালী", এবং যেখানে স্ত্রীলোকের পরনে কালো ('নীলার্থে') শাড়ী দেখিয়া মনে হয় সর্বদা ঘরে ঘরে শোক-প্রকাশ যেন লাগিয়াই আছে (ঘরি ঘরি দীসই সোগ)।...হরির নিতান্ত কৃপা হইলেই দক্ষিণ দেশের (রাজপুতানার দক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য নহে) লোকের ঘরে মরুকামিনী পা বাড়ায় (মারু কাঁমিনী দিখনি ঘর হরি দীয়ই তউ হোই)।

ঢোলা মধ্যস্থ হিসাবে বিবাদ মিটাইতে গিয়া মরু-দেশের প্রশংসা এবং নিজের দেশ মালবের নিন্দা করিয়া নাকি মারুর কাছে প্রেমের পরীক্ষায় পাস হইয়া গেলেন।[২৩]

দোহার অজ্ঞাতনামা কবির অধিক বিদ্যা ছিল না, এবং তাহার কল্পনাশক্তি সমকালীন সামাজিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া নূতন কিছু নির্মাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। সুপণ্ডিত কবি এবং নিপুণ সাহিত্যশিল্পী অপেক্ষা এই

মহাভারতের যুগে মদ্র (পশ্চিম পঞ্চনদ প্রদেশ) দেশে "স্থূলশংখান্বিতা কম্বল পরিবৃতা" নারীর নমুনা পশ্চিম রাজস্থানে এবং হরায়ার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়।

জয়পুরিয়ারা বলে মারবাড়ের লোকেরা শাক খাইয়া ঘিয়ের ঢেকুর তোলে, ঘরে শুকনা রুটি খাইয়া বাহিরে যাওয়ার সময় গোঁফে ঠোঁটে প্রচুর ঘি মাখায়, নিজের দেশের সব কিছুর অতিরিক্ত বড়াই করে। জয়পুর রাজ্যের আশ্রিত কবি সুরসিক বিহারী মাড়োয়ারবাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

মরুধর পায়ো মতীরহু মারুকহত পয়োধি।

মারবাড় নৃপতি একটা মতীরা (তরবুজ জাতীয় বিখ্যাত ফল) পাইয়াছেন। মরুবাসী বলাবলি করে, গোটা সাগর পাইয়াছেন।

ইহার মধ্যে ইতিহাস আছে। মতীরা শব্দের দ্বারা মারবাড় রাজ্য বুঝিতে হইবে—যাহা মোগল সম্রাট Watn জায়গীর হিসাবে যোধপুরের মহারাজকে দিয়াছিলেন। রাঠোর বড়াই করিতেন যেন তিনি সসাগরা পৃথিবীই ইনাম্ পাইয়াছেন।

২৩। এই প্রবন্ধের কথাবস্তু মূল কাব্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। ডিঙ্গল কবিতা বহুভাষিণী, জ্বালাময়ী, উহার গতি ধীর-সমীর নহে, মরুর বাতাসের মত চঞ্চল, ঝড়ের মত উহার বেগ অপ্রতিহত। বাংলা ভাষায় মূলের সৌন্দর্য বজায় রাখিয়া আক্ষরিক অনুবাদ অর্বাচীন লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

জন্যই দোহার কবি ইতিহাসের দিক হইতে অতীতের অধিকতর নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। কুমার পৃথ্বীরাজের "বেলি কাব্য" পরিপাটি নারায়ণের ভোগ। ইহার রূপ রস গন্ধ শাস্ত্রভাণ্ডারের পবিত্র বস্তু হইতে আহৃত; কোনটির মধ্যে মাটির গন্ধ নাই, মাটির সহিত স্পর্শ নাই, যেহেতু ঐ ভোগ রাজরাজেশ্বরের মর্যাদার উপযুক্ত কল্পনাদীপ্ত রত্নাধারে স্বর্ণ বেদিকার উপর স্থাপিত হইয়াছে। "দোহা" মরুভূমির বুকে বালুকাগহ্বরে প্রযত্ন বর্ধিত রাজস্থানের মতীরা ফল, গন্ধে রসে অনুপম, রূপে আভিজাত্যহীন। রাজস্থানের দরিদ্রনারায়ণের উপহাররূপে দিল্লীশ্বর উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরুস্থলীর মাটির গন্ধ ও স্পর্শ রসগ্রাহী সম্রাট দোহার কথাবস্তুর মধ্যে হয়ত পাইয়াছিলেন। দোহার গ্রাম্যকণ্ঠে মরুর মহাগীত ভাষা পাইয়াছে, মরু-প্রকৃতি ইহার মধ্যে দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় ধরা পড়িয়াছে।

১৬

উপসংহার

দোহার প্রতি সম্রাট আকবরের পক্ষপাতিত্ব-সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার মনের পরিচয় পাইবার দুরাশায় বিভ্রান্ত হইয়া আমরা রাজস্থান-মরুর চোরা-বালিতে পড়িয়া গিয়াছি, অথচ দিল্লীশ্বরের মন পাশ কাটাইয়া গেল, কেন এই সরল নিসর্গ-সুন্দর পল্লীগীতিকা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল, বুঝা গেল না। কবিতা রসের ব্যাপার, কাব্যের রসস্থান নির্ণয় ঐতিহাসিক কর্ম নয়। যিনি যথার্থ "রস-বেত্তা" তিনি বলিবেন রসই ব্রহ্ম, সুতরাং উভয়ই বাক্য এবং মনেরও গোচরীভূত নহে; জগৎ রসময়; শুষ্ক কাষ্ঠেও নিশ্চয়ই রস আছে না হয় আজীবন কুট্‌কুট্‌ করিয়া মূষিক দন্তক্ষয় করে কেন? মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ ইঁদুরকে গালাগালি করে। রস ও রুচির ব্যাপার অতি জটিল। দোহা সম্বন্ধে স্বয়ং আকবরকে এই প্রশ্ন করিলে তিনিও হয়ত ইহার জবাব খুঁজিয়া পাইতেন না, বিরত হইয়া ধমক দিতেন, "শাহান্‌শাহের মর্জি"!

ইতিহাসের কিন্তু কঠোর নির্দেশ, কেন" (Why) এবং "কিরূপে"র (How) উত্তর ঐতিহাসিককে দিতেই হইবে। জাহাঙ্গীর বাদ্‌শার মুখে বিকানীরের বাজরার খিচুড়ি অপূর্ব লাগিয়াছিল কেন? নবাব হায়দার আলী মোগলাই খানা ফেলিয়া মাঝে মাঝে দিন দুদিন ছোলাভাজা চিবাইতেন কেন? লক্ষ্ণৌর শাহী বাবুর্চীখানার

ব্যঞ্জনাদি, বিশেষতঃ মাসকলাইয়ের দাল নিত্য নূতন মাটির খুরিতে কেন পরিবেশন করা হইত? ঐতিহাসিক ইহার কি সদুত্তর দিবে?

সম্রাট আকবরের রাজসত্তা (Akbar as a king) এবং লোকসত্তা (Akbar as a man), উভয়ই দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সঙ্কুল এই জন্যে তাঁহার ইতিহাসে "কেন"-র বহর অফুরন্ত, মাঝে মাঝে সাংঘাতিক "কেন"র চোরা কবাটে মাথা ঠুকিয়া ঐতিহাসিকের প্রাণান্ত হইলেও উত্তর সহজে মিলিবার নহে। যথা:

তিনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? যদিই বা প্রহ্লাদ হইলেন, আধখানা হিরণ্যকশিপু উঁহার মধ্যে কেমন করিয়া রহিয়া গেল? "চণ্ডাশোক" এবং প্রিয়দর্শী "ধর্মাশোক", রাক্ষস তৈমুর-চেঙ্গিজ ও রাজর্ষি জনকের "সহাবস্থান" একই চরিত্রের মধ্যে কিরূপে সম্ভব হইল? রাজা তথা মানুষ হিসাবে ভালমন্দ উভয় দিকেই আকবর অপমেয়, ভোগ এবং ত্যাগে তুল্যরূপ অপরাজেয়। বন্ধুবৎসলো তিনি বালক, জিঘাংসায় দানব। ইবাদত খানার ধর্মসভায় তিনি সংস্কারমুক্ত, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ় যুক্তিবাদী, কিন্তু নিজ ধর্মসংঘ (Din-i-Ilahi) স্থাপনায় তিনিই আবার বিশ্বাসপ্রবণ, অন্ধসংস্কারপূর্ণ "সৌর", জ্যোতিঃ ব্রহ্মের উপাসক, কখনও বা গ্রাম্য মেয়েদের মত রোগ নিরাময়ের জন্য "জলপড়া" দিতেও দ্বিধাহীন। তিনি বাহিরে ভোগী, ভিতরে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসী, দীন-দুনিয়ার মালিক হইয়াও তাঁহার মন মুসাফিরের মত চঞ্চল ও উদাস, জ্ঞানে প্রবীণ হইয়াও তিনি নূতনত্বের মোহে বালকের ন্যায় কৌতূহলী। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণে দিল্লীশ্বর দেশ ধর্ম জাতি ও কাল নিরপেক্ষ নিষ্ঠাবান মধুমক্ষিকা, রসের অনুশীলনে তিনি আরণ্য মধুকর। তিনি ধর্মের ব্যাপারে সব ঘাটের জল খাইয়াছেন, সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারিয়াছেন, সকল ফাঁদকে ফাঁকি দিয়া অবশেষে স্বখাদসলিলে ডুবিলেন। নেশার ব্যাপারে আমীরী শিরাজী, পাঁজি ফিরিঙ্গী (শরাব) এবং গরীবের তাড়ি তাঁহার কাছে সমান উপাদেয় ছিল, ফিরিঙ্গী তামাক তাঁহার কাছেই হিন্দুস্থানে কলকে পাইয়াছে।

এ হেন ব্যক্তির কার্য "কেন"-র অপেক্ষা করে না, অথচ ঐরূপ কার্য নিছক খেয়াল কিংবা বাতিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। "কার্যের" সম্ভাব্য "কারণের" মধ্যে "কর্তার" ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন থাকে। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সহিত স্রষ্টার স্বরূপ মানস-দৃষ্টির গোচরীভূত করিতে না পারিলে ইতিহাসের সার্থকতা কোথায়? ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কোন্ ঝোপে বাঘ লুকাইয়া আছে ঐতিহাসিক সঠিক বলিতে পারে না; এই জন্য সব ঝোপ ঠেঙাইতে হয়, যাঁহারা

বাঘ দেখিবার আশায় মাচানের উপর বসিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ ল্যাজ কেহ ডোরার বেশী দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। নর-শার্দূল সম্রাট আকবরের পক্ষেও উহার অধিক ঐতিহাসিকগণও আজ পর্যন্ত কিছু দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হৌক, দোহার মামলা মীমাংসার জন্য আকবর চরিত্রের "কেন?"-র জঙ্গলে না ঢুকিয়া উপায় নাই। "দোহা" কেন আকবর-কে মোহিত করিল?—ইহার উত্তরের আভাস পাল্টা প্রশ্নে পাওয়া যাইবে। গরীব চাষীর খোলার ঘরের উপর স্থপতি-সৌন্দর্য-পিপাসু সম্রাটের শুভদৃষ্টি পড়িল কেন? ফতেপুর সিক্রীর যোধবাই-মহলের দ্বিতলে বারান্দায় ঢালু ছাদে পাথর খোদাই করিয়া সামান্য বস্তুকে তিনি অসামান্য অনুকরণের অর্ঘ্য কেন নিবেদন করিয়াছেন? সিক্রীর রাজান্তঃপুরে জগন্নাথের রথ কিংবা বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে তিনি পাঁচ-মহল প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন কেন? তাঁহার চোখে মুসলমানী মেহ্‌রাব (Arch) অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের খিলান (Lintel) অধিক সুন্দর লাগিয়াছিল কেন? লোকবিশ্রুত ইরান-তুরানের চিত্রশিল্পের সহিত যাহার শৈশবেই পরিচয় হইয়াছিল, পরিণত বয়সে তিনি পালকি-বাহক কাহার জাতীয় দসবন্তের আঁকা-পটে তাহার অশিক্ষিত পটুত্ব আবিষ্কার করিয়া মোগল দরবারে চিত্রশিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিলেন কেন? তিনি ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে ইসলামের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়া দারুণ বিপদের ঝুঁকি লইয়াছিলেন কেন?

এই সমস্তের পশ্চাতে যে বিরাট সত্তার প্রেরণা রহিয়াছে, কাব্যবিচারেও আমরা আকবরের সেই লোক-সত্তার মধ্যে সহজাত অনন্যসাধারণ রসবোধের ক্ষমতার পরিচয় পাইতে পারি। বেলির প্রতিস্পর্ধী দোহার চমৎকারিতা সম্বন্ধে সম্রাটের প্রশংসা নিতান্তই প্রাণের কথা। "দোহা-"র ঝঙ্কারে মরুর করুণ গীতি আবহমান কাল পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, যাহার কান আছে সে বর্ষানিশীথে আজও সেই গীত শুনিতে পাইবে।

চারণ ও ক্ষত্রিয়

[চারণ ভাই ক্ষত্রিয়াঁ, জাঁধব খাগ তিয়াগ।
খাগ তিয়াগা বাহরা, জাঁসু লাগ ন ভাগ]
(দোহা, মহারাজ মানসিংহ রাঠোর)

রাজস্থান ডিঙ্গল সাহিত্যে এবং রসিক সমাজে ব্রাহ্মণ, চারণ, সন্ন্যাসী, যতি (জৈন সাধু), ফকির এবং শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরের পূজারী ক্ষত্রিয়--এই ছয় সম্প্রদায়কে সংক্ষেপে সম্মানার্থে "ষড়দর্শন" এবং ব্যঙ্গার্থে ষট্‌ব্রণ বলা হয়। ইঁহারা পুণ্যার্থীর দর্শনীয় জীব, কিন্তু ধর্মভীরু গৃহস্থের পক্ষে পীড়াদায়ক ব্রণও বটেন, পীড়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। ইঁহাদের মধ্যে চারণ সর্বাপেক্ষা আশঙ্কাজনক ব্রণ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুতানা, মালব, গুজরাট, কাঠিয়াবাড় এলাকায় বিশ লক্ষ টাকা আয়ের নিষ্কর জমি মৌরসীসত্বে একাধিক শতাব্দী হইতে চারণ সম্প্রদায় ভোগ করিয়া আসিতেছে। সেকালে ক্ষত্রিয় মনে করিতেন চারণেরা তাঁহাদের নিতান্ত আপন জন, লেন-দেন এক ঘরের ব্যাপার। ক্ষত্রিয়ের সহধর্মিণীর ন্যায় ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টলক্ষ্মীও দ্বিভুজা; এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে দান-কমণ্ডলু। ক্ষত্রিয় চারণের প্রতি "ত্যাগ" বিমুখ হইলে ক্ষত্রিয়ের হাত হইতে তরবারি, এবং অধিকার হইতে ভূমি খসিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না।

এই চারণ জাতি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের একটি বড় সমস্যা। উক্ত সমস্যার বিচার ইতিবৃত্তের অধিকারের বাহিরে। চারণ জাতির উৎপত্তি ও বৃত্তি সম্বন্ধে চারণের অভিমত না জানিয়া শুধু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া কোন নূতন কুলপঞ্জিকা উহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। সেকালে চারণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর অনন্যনির্ভরতা এই প্রবন্ধে মুখ্যতঃ আলোচনা করা হইবে।

২

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে একদিন মহামহোপাধ্যায় চারণ-কুলতিলক মুরারিদানজী (মৃত বিঃ ১৯৭১=খৃঃ ১৯১৪) এবং মুন্‌শী মহম্মদ মখদুম্‌ যোধপুর

রাজপুতানার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং যোধপুরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মুন্সী দেবী-প্রসাদজীর ঘরে বসিয়া মহারাজার কাছে আর্জি লিখিতেছিলেন। দরখাস্তের নীচে মথছুম্জী "তাবেদার" (বশংবদ) লিখিয়া নাম দস্তখত করিলেন। লেখক চতুর্ভুজ পঞ্চোলী[১] উহা দেখিয়া মুরারিদানজীর দরখাস্তের নীচেও "তাবেদার" শব্দ লিখিলেন। দরখাস্ত পড়িয়া শুনাইবার সময় মুরারিদানজী বলিলেন, "দবাগীর"[২] শব্দ লিখ। সুযোগ পাইয়া সুরসিক দেবীপ্রসাদজী পঞ্চোলীকে ধমক দিয়া বলিলেন, কি সর্বনাশ। মহামহোপাধ্যায় দেবতা হইয়া গিয়াছেন, তুমি লিখিলে "তাবেদার"? মুরারিদানজী হাসিয়া বলিলেন, হাঁ ঠিক! এই সময় মুরারিদানজী চারণ জাতিকে দেবযোনি সপ্রমাণ করিয়া চারণোৎপত্তি বিষয়ক এক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মীসন শাখার চারণ সূরজমল বুন্দী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় "বংশভাস্কর" নামক ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ভারতবর্ষের দ্বিতীয় "মহাভারত"; ইহার বিষয়বস্তু রাজপুত জাতির মধ্যযুগের ইতিবৃত্ত। ভাট চারণের খ্যাত ও গীত এবং ডিঙ্গল ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ রাজপুত-গণের ছন্দোবদ্ধ জীবনী বংশভাস্কর মহাকাব্যের মূল উপাদান। চারণ জাতির উৎপত্তি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সূরজমল প্রাচীনকালের সূত (স্তুতিপাঠক) হইতে চারণ জাতির উৎপত্তি অনুমান করিয়াছেন এবং চারণ জাতির যাচক মোতীসর, রাবল, ঢোলী, ভাট ইত্যাদির চারণ-স্তুতির উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। কশ্যপ ঋষির অভিশাপে সুমিত্রক নামক সূতের বংশ নষ্ট হইয়াছিল। এই বংশের আর্যমিত্র নামক সূত মহাদেবের বৃষ নন্দিকেশ্বরের সেবা করিয়া বর পাইয়া-ছিলেন যে, নাগকন্যা অবরীর গর্ভজাত সন্তানগণ তাঁহার কুলবৃদ্ধি করিবে। কথিত আছে, ঐ সময় হইতে আর্যমিত্রের বংশ সূত উপাধি ত্যাগ করিয়া চারণ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই অবরী সমুদ্রের পৌত্র বাসুকী নাগের কন্যা।

১। পঞ্চোলী রাজপুতানায় কায়স্থ রাজকর্মচারী সাধারণ উপাধি ব্রাহ্মণ, মহাজন, গুর্জর ইত্যাদি সকল জাতির মধ্যে পঞ্চোলী পদবী প্রচলিত আছে, সুতরাং পঞ্চোলী পদবাচক শব্দ, জাতিবাচক নয়। (দ্রঃ 'গুলেরী' প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৬১ পাদটীকা)। এই "পঞ্চকুল" শব্দের প্রকৃত অর্থ হিন্দী পঞ্চ বা পঞ্চায়েত। বাংলা "পাঁচজন" সিন্ধুনদীর অপর পারে "পাঞ্চলি" পদবী হইয়া গিয়াছে, পাঞ্চালি (পঞ্চশালী) জাতিতে 'ক্ষত্রী'। আমার এক ছাত্রের এই উপাধি ছিল, তাহার আদি নিবাস সীমান্তপ্রদেশ।

২। "দবাগীর" ডিঙ্গল ভাষায় আশীর্বাদক" অর্থে ব্যবহার হয়। ইহা ঠিক শুদ্ধ নয়। এই ফার্সি শব্দের অর্থ "আশীর্বাদকী", "দবাগো" লিখিলেই আশীর্বাদক বুঝায়।

বংশভাস্কর মহাকাব্যের সুযোগ্য টীকাকার সোদা বারহঠ্ শ্রীকৃষ্ণসিংজী এবং মহামহোপাধ্যায় চারণ মুরারিদানজী চারণোৎপত্তি সম্বন্ধে বংশভাস্কর প্রণেতার সহিত একমত নহেন ; যেহেতু এই বিষয়ে মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি হইতে কোন শাস্ত্রীয় আর্য প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া সুরজমল কেবল মোতীসর ইত্যাদি যাচক-গণের মন-গড়া শ্লোকবাক্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পণ্ডিতদ্বয়ের শাস্ত্রমূলক যুক্তির আলোচনা মানববুদ্ধির বিদ্রোহের যুগে প্রীতিকর হইবে না। যাহা হৌক, বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসজ্ঞ এবং ইংরেজী শিক্ষিত কোন প্রাচীনপন্থী চারণের সহিত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সাজিয়া যদি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার করেন তাহা হইলে যাহা তথ্য পাওয়া সম্ভব উহা নিম্নে প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হইল—

(১) ' চারণ জাতি ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় ?

চারণ "জাতি" নহে, একটি কুল। চারণগণকে "কুল" বলা হয়। চারণ ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয়ও নহে। চারণ কোন বর্ণেরই অন্তর্গত নহে, চারণকুল বর্ণব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে আর্যাবর্ত্তে আসিয়াছিল, চারণ "আর্য" অর্থাৎ দেবতা। সে যুগে আর্য এবং এবং অনার্য দস্যু এই দুই জাতিই ছিল।

(২) চারণকুলের আদি নিবাস কোথায় এবং চারণকুলের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

আদি নিবাস স্বর্গ। কুলের প্রতিষ্ঠাতা কেহ নাই, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং, (মতান্তরে বিষ্ণু ভগবান্), যিনি প্রজাপতি মনু, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, অসুর ও গুহ্যকগণকে পৃথক পৃথক সৃষ্টি করিয়াছিলেন [শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ, দশম অধ্যায়]; তাঁহাকে চারণকুলের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মনে করিতে পার।

(৩) স্বর্গে আপনাদের কার্য কি ছিল ?

মর্ত্তে যাহা করিতেছি স্বর্গেও উহা করিতাম, অর্থাৎ দেবতার উপাসনা। স্তুতি দ্বারাই আমাদের উপাসনা, ক্ষত্রিয়েরা আমাদের মত আর্য অর্থাৎ দেবতা। এখন যেমন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যাদি কাজ ব্রাহ্মণ করিয়া থাকে তেমন আর্য বা দেবতার কার্য স্বর্গে দেবতাই করিত। চারয়ন্তি কীর্ত্তিং ইতি চারণাঃ। স্বর্গে দেবতার যশ, মর্ত্ত্যে ক্ষত্রিয়ের যশ প্রচার চারণের কার্য। ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গেই চারণ মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিল।

(৪) স্বর্গ হইতে চারণ ও ক্ষত্রিয় চলিয়া আসিলেন কেন ? আসিবার পর স্বর্গের দেবতাগণের সঙ্গে উঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল ?

প্রজাবৃদ্ধিই আগমনের কারণ। আগমনের পরেও স্বর্গে ক্ষত্রিয়গণের যাতায়াত

ছিল। যাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহারা যাইতে পারিত না। ক্ষত্রিয় ও দেবতার গোত্র একই ছিল, যথা, রাজা শর্যাতি ও ইন্দ্র শর্যাতি (ইন্দ্রের অপর নাম)[৩] উভয়ের গোত্রের নাম শর্যা। মান্ধাতা, মুচুকুন্দ, দশরথ, অর্জুন ইত্যাদি অনেকে স্বর্গে দেবকার্য সমাধা করিয়া মর্ত্যে ফিরিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় না হইলে দেবতারা উপবাসী থাকিতেন, দৈত্যের উৎপীড়নে স্বর্গেই টি'কিতে পারিতেন না। অন্যপক্ষে দেবতার বর ও শক্তি না পাইলে ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করিয়া রাজত্ব করিতে পারিত না।

(৫) আপনাদের স্বর্গটা কোথায় ছিল?

জ্যোতিষশাস্ত্র যেখানে নির্দেশ করিয়াছে সেইখানেই আছে। সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায়ের ভুবনকোষ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে স্বর্গ শূন্যে নয়, পৃথিবী-পৃষ্ঠেই একটা স্থান। হিমালয় পর্বতের ঊর্ধ্বভাগ দেবভূমি স্বর্গ। এই তো সেদিন হার্ণেলী সাহেব আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে লিখিত ভূর্জপত্রের পুঁথি তিব্বত হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে নাকি লেখা আছে তিব্বত দেশের নাম ছিল ত্রিবিষ্টপ (স্বর্গ)।

হিমাচল প্রদেশে কিন্নর জাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নেপালে নাকি গন্ধর্ব ও যক্ষ আছে। সকলেই আচারভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যুধিষ্ঠির হিমালয়ের পরে বালুকাভূমি অতিক্রম করিয়া স্বর্গে পৌঁছিয়াছিলেন, সুতরাং স্বর্গ আলতাই কিংবা উরাল পর্বত হইতেও পারে। ঐস্থানের কাছাকাছি আর্যের পিতৃভূমি উত্তরকুরু, যেখানে অশ্বমুখ জাতির বাসস্থান, যে দেশ অর্জুন অস্ত্রবলে জয় করিতে পারেন নাই। স্নেহপরবশ হইয়া জাতিগণ তাঁহাকে কিছু চাঁদা দিয়াছিল মাত্র।

(৬) দেবতাগণের দুইটা স্বর্গ কেমন করিয়া বর্তমানে অনার্য জাতি জয় করিল?

যাহারা জয় করিয়াছে তাহারা সকলেই অনার্য নহে। অসুর-দৈত্য আর্য দেবতার শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতি ভাই, কশ্যপ ঋষির পত্নী দিতির গর্ভজাত দৈত্য, দেবতারা অদিতির সন্তান আদিত্য। দেবতারা দৈত্যের কাছে অনেকবার পরাজিত হইয়া স্বর্গ হারাইয়াছে। দৈত্যের বাহুবল অধিক, বুদ্ধির জোরে দেবতা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে, দেবতারা সমুদ্রমন্থনে দৈত্যকে ফাঁকি দিয়াছিলেন, অসুরদিগকে পাতালে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। দেবতাদের মধ্যে মহাদেবের ব্যবহারিক জ্ঞান কিছু কম। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অসুরকে বর

৩। দ্রষ্টব্য, ভগোরী গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯।

দিয়াই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। ভগবতী শক্তিমাতা আবার চারণের ঘরে আসিবেন। যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের লোপ হওয়ায় দেবতারা ক্ষীণবল হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জাতি মোহগ্রস্ত হইয়াছে। শক্তিমাতার কৃপায় ক্ষত্রিয় আবার জাগিবে, দেবতারা ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে স্বর্গ ফিরিয়া পাইবেন।

(৭) ক্ষত্রিয় জাতির সহিত চারণকুলের ঐতিহাসিক সম্পর্ক কত পুরাতন?

পাণ্ডুরাজার স্ত্রী ও পুত্রগণকে হস্তিনাপুরে কাহারা আনিয়াছিল? চারণেরা সে যুগে হিমালয়ে তপস্যা করিতেন, পাণ্ডুরাজা তাঁহাদের আশ্রয়ে বাস করিতেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভীষ্ম পাণ্ডবগণকে পৌত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাপার কিছু অসম্ভব নয়। বালক উদয়সিংহ শিশোদিয়া, রাঠোর চুণ্ডা এবং অজিতসিংহ রাঠোর চারণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, চারণের কথায় জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে রাজা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

মহাভারতে আছে:

"তং চারণসহস্রাণাং মুণিনামাগমং তদা।
শ্রুত্বা নাগপুরে নৃণাং বিস্ময় সমপদ্যত॥

নাগকুলের রাজধানী প্রথমে হস্তিনাপুরে ছিল। নাগেরা সাপ নহে, আর্য ক্ষত্রিয়। সর্পের মত খল ও কোপণ স্বভাব বলিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয়কুল ইহাদিগকে নাগ বলিত। তাহারা বাসুকির পূজক ছিল এবং সমস্ত উত্তর ভারতে নাগকুলের রাজত্ব ছিল। মিবাড়ের আদি রাজধানী ছিল নাগদা বা নাগহ্রদ। মথুরামণ্ডল ও খাণ্ডব-প্রস্থ হইতে যদু ও কুরুবংশ নাগকুলকে বিতাড়িত করিয়াছিল। নাগ-দুহিতা উলুপী সর্পিণী ছিলেন না। এক ক্ষত্রিয়কুল প্রবল হইয়া অন্য ক্ষত্রিয়কুলের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। বিজিতকুল ক্ষত্রিয় গৌরব হারাইয়া কৃষিকর্মাদি অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছে। রাজস্থানে এই শ্রেণীর বহু রাজপুত আছে। উত্তর প্রদেশে নাগবংশী বৈশ্যজাতি আছে; মীরাটের তাগা ব্রাহ্মণ তক্ষক নাগের বংশ। অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা এখন অন্য কুলজী খাড়া করিয়াছে।

(৮) চারণ জাতিকে প্রশংসাসূচক "অবরী কা কেড়ু" বলে কেন? এই জনশ্রুতির মূল কি?

নাস্তিমূলাঃ জনশ্রুতিঃ। সুতরাং ইহার মূলে কিছু আছে। মাতুলবংশ কীর্তিমান ও শক্তিশালী হইলে আর্যগণ মাতার সন্তান বলিয়া গৌরব বোধ করিত। না হয় সিদ্ধবীপুত্র, মাদ্রীপুত্র শব্দ কোথা হইতে আসিল? চারণকুল হয়ত প্রাচীন কালে আবরী-পুত্র নামে আত্মপরিচয় দিত। আবরী বাসুকিনাগের কন্যা। বাসুকিকে

সমুদ্রের পৌত্র বলা হয়। লবণ-সমুদ্রের আবার পুত্র-পৌত্র হয় নাকি? বরুণ সমুদ্রের দেবতা, নাগেরা বরুণ-পূজা করিত। আর্যজাতি বেদোক্ত সমস্ত দেবতার পূজক হইলেও উহাদের মধ্যে এক এক কুলে এক এক বিশিষ্ট দেবতার উপাসনা হইত, যাহাকে ইষ্ট (ইষ্টদেবতা) বলা হয়। এই কালেও শিশোদিয়ার ইষ্টদেবতা শিব (একলিঙ্গজী), চৌহানের আশপুরী, রাঠোরের চামুণ্ডা, কচ্ছবাহকুলের সীতারামজী। বরুণের প্রতীক সমুদ্র, সমুদ্রের প্রতীক মহাসর্প। নাগরাজ বাসুকি বরুণের উপাসক ছিলেন, উপাসক পুত্রস্থানীয়। রূপক বহুরূপী হইয়া স্বয়ং বাসুকিকে সহস্রশীর্ষ সর্প করিয়াছে, হৈহয় অর্জুনকে সহস্রবাহু করিয়াছে, রাবণকে দশমুণ্ড করিয়াছে, এবং রামচন্দ্রের দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড় মিত্রগণের পশ্চাতে লাঙ্গুল জুড়িয়া দিয়াছে। মানুষের বুদ্ধির দৌড় অপেক্ষা কল্পনার দৌড় বেশী; এবং মূর্খের কাছে কল্পনা অতিবাস্তব, অপ্রাকৃত কিছু আমদানি না করিলে মূর্খকে বুঝাইতে পারা যায় না। অজ্ঞকে মূর্খ বানাইতে গিয়া ব্রাহ্মণ ততোধিক মূর্খ হইয়াছে।

(৯) যদি এই জনশ্রুতির ব্যাখ্যা এরূপ হয়, তাহা হইলে সূত মাগধ ইত্যাদি সঙ্করবর্ণ হইতে চারণের উৎপত্তি—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আপত্তি কি?

প্রথম কথা, স্তাবক কিংবা সারথী অর্থে সূত সঙ্করবর্ণ নহে। সঙ্করবর্ণ খাড়া করিয়া জাতিনির্দেশ শাস্ত্রের হেঁয়ালি, ব্রাহ্মণের ধাপ্পাবাজি। দরিদ্র ক্ষত্রিয় পুরুষানুক্রমে রথচালনার দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া পতিত হইলে সূত হয়। স্তুতিপাঠে বিদ্যা ও কবিত্বশক্তির প্রয়োজন হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পক্ষে সূত-মাগধের বৃত্তি অবলম্বন করা সম্ভব নয়। ভৃতিভুক সেবক হইয়া ব্রাহ্মণ অপাঙক্তেয় সূত-মাগধ হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা, সূত আর্যমিত্রের বংশজগণ সূত উপাধি পরিত্যাগ করিয়া চারণ উপাধি গ্রহণ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না, তাঁহারা প্রবলতর মাতুলকুলে বিলীন হইয়া নাগ উপাধি গ্রহণ করিতে পারিতেন। "সূত" ঋষির নাম কিংবা উপাধিও হইতে পারে। সাধারণ স্তাবককে বাসুকি নাগকন্যা দিবেন কেন? ক্ষত্রিয় রাজগণ ভক্তিপরবশ হইয়া মহর্ষিগণকেই কন্যাদান করিতেন; সুতরাং আর্যমিত্র চারণ ঋষি ছিলেন অনুমান করাই সঙ্গত। তাঁহার চারণ বংশধরগণ তপস্বী না হইয়া সংসারী হইয়াছিলেন। বর্তমানে যাঁহাদের পদবী গিরি, পুরী তাঁহারা আসলে শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ত্যাগী গিরি-পুরীর বংশধর, তাঁহারা পূর্বাশ্রমের জাতিত্ব হারাইয়াছে। চারণকুল সম্ভবতঃ প্রথমে নাগ ক্ষত্রিয়-গণের আশ্রিত ছিল, পরে অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশের আশ্রিত যাচক হইয়া শাস্ত্র ও কাব্যচর্চা করিত, যজমানের বংশ-কীর্তি রক্ষা করিত।

(১০) চারণকুল দেবভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তে অপভ্রংশ ভাষার চর্চা করিবার হেতু কি?

বুদ্ধদেব সুপণ্ডিত হইয়াও অবজ্ঞাত পালি ভাষায় ধর্মপ্রচার করিবার হেতু কি ছিল? শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয় বিদ্যাচর্চা সাধারণতঃ করিত না; সুতরাং যাহা দেশের কথিত ভাষা উহা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া চারণেরা ক্ষত্রিয়ের চিত্তবিনোদন করিত।

চারণকুল সংস্কৃত কাব্যও লিখিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে চারণের দান সামান্য নয়। নবম শতাব্দীর কবি এবং "কাব্য-মীমাংসা" প্রণেতা যাযাবরীয় রাজশেখর কে ছিলেন?[৪] লোকে যাযাবরীয়" শব্দের অর্থ করিয়াছে যাযাবর ঋষির পুত্র। ঋষি কেবল ব্রাহ্মণ হয় না, চারণেরাও তপস্যা করিত, তাঁহাদের আশ্রম ছিল, তাঁহাদিগকে মুনি বলা হইত,—যদিও মুনি শব্দ বর্তমানে জৈনপণ্ডিতেরা একচেটিয়া করিয়াছে। রাজশেখরের পিতা যদি কোন বানপ্রস্থী ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে তিনি সুষ্ঠু "পরিব্রাজকীয়" শব্দ লিখিতেন, যাযাবর বা "বেদে" বলিতেন না। চারণেরা আদিকাল হইতেই যাযাবর, যেখানে ক্ষত্রিয় সেখানেই তাহাদের গতি। চারণকুলের যাযাবর স্বভাব সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে গুর্জরাধীশ জয়সিংহ দেব সোলাঙ্কী (সোনাংখী) চারণ কুলপতি মহাবদান্যকে আনর্ত দেশ (বর্তমান

৪। কবিরাজ রাজশেখর যাযাবরীয় কবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে বংশে তাহার পূর্বে 'অকালজলদ', 'সুরানন্দ', 'তরল', এবং কবিরাজ প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত (কাব্যমীমাংসা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২২৭) রাজশেখর দেবযোনির মধ্যে চারণকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। (মূল পৃঃ ২৯), এবং অন্যত্র কোথায়ও চারণ জাতির উল্লেখ করেন নাই। যাযাবরীয় মতানুসারে ষড়ঙ্গ বেদের সপ্তম অঙ্গ অলঙ্কার শাস্ত্র (উপকারকত্বাদ্ মূল পৃঃ ৩) চতুর্দশ বিদ্যাস্থানের সহিত ("পঞ্চদশং কাব্যম্ বিদ্যাস্থানম্") কাব্য যাযাবরীয় মতে পঞ্চদশ, বিদ্যাস্থানের (মূল পৃঃ ৪) মধ্যে সাহিত্য পঞ্চম বিদ্যা, চতুঃষষ্টিকলা উপবিদ্যা (পৃঃ ৫)। রাজশেখরের মতে কবির দশ অবস্থার (degree of excellence) মধ্যে ষষ্ঠস্থানবর্তীগণ মহাকবি, যিনি মহাকবির এক অবস্থা উপরে উঠিয়াছেন তিনি কবিরাজ (ডিঙ্গল কবিরাজা), অর্থাৎ তিনি স্বয়ং এবং অল্প আর কয়েকজন। (এই কবিরাজা উপাধি এবং আত্মশ্লাঘা ব্যাধি চারণের মধ্যে উৎকট, বর্তমান শতাব্দীর মহামহোপাধ্যায় মুরারিদান-কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ "যশোভূষণম্" এই বিষয়ে রাজশেখরের উপর টেক্কা দিয়াছে।)

রাজশেখর পরবর্তীকালে যাযাবর কবি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তাহার সময়কাল আঃ ৮৮০-৯২০ খৃঃ। তাঁহার পিতা দুর্দুক বা দুহিক মহামন্ত্রী ছিলেন, মাতার নাম শীলা দেবী। তিনি কনৌজের গুর্জর প্রতিহার বংশীয় রাজা মহেন্দ্র পালের উপাধ্যায় ছিলেন। তিনি চৌহান্ বংশীয়া বিদুষী অবন্তী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই কবি এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার অনুরাগী। রাজশেখর ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, নিঃসন্দেহ কিছু পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না।

কাথিয়াবার) রাজ্য দান করিয়াছিলেন।[৫] কিছুকাল ঐ দেশে থাকিয়া যাযাবর চারণকুলের আদিম ভ্রমণ প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ চারণ মরুস্থলীর দিকে চলিয়া আসিল, যাহারা স্থিতিশীল হইয়া ঐ দেশে থাকিয়া গেল উহারা জাতিচ্যুত হইল; উহারা কাছেলা চারণ নামে এখনও পরিচিত। যাযাবর মরুচারণ-ই স্বর্গত্যাগী দেবযোনি চারণগণের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ডিঙ্গল কাব্যে চারণদিগকে এই যাযাবর স্বভাবের জন্যই ইহগ (ইহগঃ) অর্থাৎ যদৃচ্ছাচারী বলা হইয়াছে।

(১১) তাহা হইলে চারণ কি প্রাচীন যাযাবর পশুপালন জাতি? চারয়ন্তি পশূন্ ইতি চারণাঃ—ব্যাকরণ অনুসারে ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে; বিশেষতঃ নন্দিকেশ্বরের সেবা সম্বন্ধে যখন জনশ্রুতি প্রচলিতই আছে।

ইহা সম্ভাবনা ও অনুমানের বাহিরে নয়; হইতেও পারে। ইহাতে অপ্রশংসার কি আছে? আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয়গণ বহিরাগত যাযাবর আর্যজাতিগণের নিকট হইতে সোম ক্রয় করিতেন। আর্যজাতিও আসলে যাযাবর পশুপালক ছাড়া কি ছিলেন? ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত আর্য বা দেবতা স্বর্গ হইতে অস্তাচল পর্বতের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। মর্ত্যভূমিতে আসিয়া তাঁহারা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন "ব্রাত-এ (hordes) বিভক্ত হইয়া যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত ব্রাত পশ্চিম হইতে সিন্ধু নদী অতিক্রম করিয়া এই দেশে স্থিতিশীল ও সুসভ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রকৃত আর্য এবং অন্যান্য "ব্রাত" হইতে স্বতন্ত্র হইলেন। উহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে সমস্ত "ব্রাত" পরে পরে আর্যাবর্তে আসিয়াছিল উহারাও আর্য হইয়া গেল। আর্যাবর্তে আর্যবংশ অনেকদিন যাযাবর পশুপালক ছিলেন। পরে ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ভূমি জয় করিয়া পশুর পরিবর্তে প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহারা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইয়া গেলেন। আর্যদের মধ্যে যাঁহারা শান্তিপ্রিয় তাঁহারা পশুপালন ও কৃষিকার্য বৃত্তিহিসাবে পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করিলেন, এবং এইজন্যই ক্ষত্রিয়ের এক ধাপ নীচে নামিয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়া গেলেন। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ কুলপতি তাঁহাদের বংশধরগণ অগ্নি ও বেদাধ্যয়ন রক্ষা করিয়া এক ধাপ উপরে উঠিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন। গোধন ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কি ধন ছিল? পরস্পরের ভূমি ও গোধন হরণ, এবং নামের জন্য লুটের টাকায় মাঝে মাঝে যজ্ঞ করা ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর কোন্ কাজ ছিল? রাজপুত ক্ষত্রিয় রাজস্থানে মরু ব্যতীত অন্য প্রাচীন

৫। রাসমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৫৬-৫৭।

যারা বজায় রাখিয়াছে। পশুহরণের জন্য সাহসিক কার্যকে ডিঙ্গল ভাষায় 'ধাড়া' বলে।

ক্ষত্রিয়ের যাযাবর জীবনযাত্রার পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, শর্যাৎ বা শর্যাতির পুত্রী সুকন্যার কাহিনী। তিনি "গ্রাম" সমেত একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতেন। "গ্রাম" অর্থাৎ ভূমি সম্পর্ক শূন্য শকট-বাসস্থলী তখন চলমান ছিল, যেমন রাজপুতানার যাযাবর "গ্রাম" এখনও আছে। চারণেরা মনুষ্যযোনি. প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য আর্যজাতির মত যাযাবর পশুপালক ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পশুপালন কিন্তু চারণের বংশানুক্রমিক পেশা নয়। রঘুরাজার পিতা দিলীপ বশিষ্ঠের নন্দিনী ধেনুর সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ আভীর গোপালক ছিল অনুমান করিতে হইবে?

(১২) নট এবং চারণ কি সগোত্র? মনুস্মৃতি এবং অমরকোষে পাওয়া যায়,

"চারণাস্তু কুশীলবাঃ"

দুইটা প্রমাণ এক এবং কোনটাই গ্রহণযোগ্য নহে। অমরসিংহ জাতিতত্ত্ব বিচার করেন নাই, শব্দকোষ লিখিয়াছেন। অমরকোষের পূর্বে সঙ্কলিত মনুসংহিতায় যাহা আছে অমরকোষে উহাই নকল করা হইয়াছে। মনুসংহিতা যাহা বর্তমান রূপ পাইয়াছে উহা সংহিতাই নহে, সংহিতা সূত্রের আকারে লিখিত হইত। মনুস্মৃতি মনুসংহিতা নহে। এই স্মৃতি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি; যেকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লোপ পাইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা, কৃষি, বাণিজ্য ও রাজসেবা ইত্যাদি লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেদবিমুখ হইয়াছিল। চারণ ব্রাহ্মণকে গুরু এবং যাজক রূপে মান্য করিলেও ক্ষত্রিয় সমাজে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চারণের প্রভাব-প্রতিপত্তি চতুর্গুণ ছিল। চারণের গীত ও খ্যাত ব্রাহ্মণের সংস্কৃত প্রশস্তি অপেক্ষা ক্ষত্রিয় সমাজে অধিক জনপ্রিয় ছিল, যদিও সর্বভারতীয় আর্য ভাষা বলিয়া সংস্কৃতের চর্চা চারণ জাতির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। চারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী দান পাইয়াছিল। মনুস্মৃতির এই উক্তি ব্রাহ্মণের স্বার্থসংঘাতজনিত ঈর্ষাপ্রসূত। স্মৃতি অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রমাণ নিশ্চয়ই অধিক গ্রহণীয়। চারণ জাতির মধ্যে নৃত্য, গীত, অভিনয় কোনদিন ছিল না, এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। চারণের গীত কণ্ঠ-সঙ্গীত নহে, এবং চারণ-কবিতা ঠিক গানের উপযোগী নহে, চারণ স্বরচিত ডিঙ্গল গীত-প্রশস্তি সামবেদের ন্যায় আবৃত্তি করিত। ব্রাহ্মণ প্রতিযোগিতায় হারিয়া বলিত,

"ব্রাহ্মণকা কবিত কুছ ভাট লেগেসে, কুছ চারণ।"

মুরারি কবি (আঃ অষ্টম শতাব্দী) রাজাদের গীত ও খ্যাতের প্রতি পক্ষপাতিত্বে আশঙ্কান্বিত হইয়া ক্ষত্রিয় সমাজকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন,

চর্চ্চাভিশ্চারণানাং ক্ষিতিরমণ ! পরাং প্রাপ্য সংমোদলীলাং ।

* * *

গীতং খ্যাতং ন নাম্না কিমপি রঘুপতেরদ্য যাবৎ প্রসাদা ।

বাল্মীকেধাত্রীং ধবলয়তি যশোমুদ্রয়া রামভদ্রঃ ॥

রঘুবংশীয় রাজগণের কীর্তি গীত কিংবা খ্যাতের দ্বারা ধরিত্রীকে ধবলিত করে নাই ; বাল্মীকির রামায়ণই করিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের ঐতিহাসিক উপাদান কোথায় পাইয়াছিলেন ? ইহা সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, কথিত ভাষায় গীত ও খ্যাতের মধ্যে উপাদান ছিল, বাল্মীকি ঐগুলিকেই সংস্কৃত করিয়া কাব্যের রূপ দিয়াছেন। চারণের গীত ও খ্যাত মুসলমান রাজত্বে বহু নষ্ট হইয়াছে, অনাদৃত অবস্থায় এখনও নষ্ট হইতেছে। রাজস্থানের সূর্যচন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ের কীর্তি ডিঙ্গল ভাষায় কিংবা চারণের অকর্মণ্যতায় লুপ্ত হইয়াছে কি ?

উষ্মাবশতঃ কিঞ্চিৎ অবান্তর কথা আসিয়া পড়িল। মোট কথা, মনুস্মৃতি কিংবা অমরকোষ গ্রন্থ পাণিনি ব্যাকরণ কিংবা বৃহৎ-সংহিতার মত জাতি ও দেশ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। দ্বিতীয় কথা এক গোত্র হইলেই জাতি হয় না। রাজস্থানে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। রাঠোর এবং চারণ এই উভয় কুলের মধ্যে শাতাবত, খুহর, চান্দাবত গোত্র আছে বলিয়া তাহারা এক জাতি।* প্রাচীন নট, কুশীলব, রাজস্থানের অন্ত্যজ জাতির মধ্যে গণ্য "ডোম" জাতি। তাহাদের স্ত্রীলোক বাজায়, নাচে, গান গায়।

(১৩) চারণ জাতির উৎপত্তি কি কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রের ব্রাত্যস্তোম বর্ণিত মগধদেশীয় ব্রাত্য "ব্রহ্মবন্ধু" কিংবা "ক্ষত্রবন্ধু" হইতে সিদ্ধ করা যায় না ?

এতক্ষণ কি শুনিয়াছ ? তুমি ব্রাত্যস্তোম পড়িয়াছ না কেবল নামই জানা আছে ? ব্রাত্যধন যাহা যজ্ঞান্তে মগধদেশীয় ব্রহ্মবন্ধুগণ গ্রহণ করিত উহার মধ্যে কি কি দ্রব্য থাকিত ? বলদ হাঁকাইবার প্রতোদ ; কালো রং-এর কিংবা কালো পাড়ের ধুতি ; কুমার্গগামী লৌহকীলকাদি বর্জিত, বংশবদ্ধ পাটাতন যুক্ত গ্রামীণ যান অর্থাৎ এই দেশের "গাড়া", গলায় রূপার চাকি, দুইপাশে সেলাই করা লোমযুক্ত ভেড়ার চামড়া, কোমর কিংবা পেটে বাঁধিবার "দামনী", ধনু এবং বক্র ঔষধ ঔষধ উপানহ্—

* । কুলাঁশতাকর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা, পৃঃ ৭৬-৭৭ ।

এইগুলির মধ্যে আমার এই সেলিমশাহী নাগরা জুতা বাদ কোন্‌টা চারণদের ব্যবহার্য?

বর্তমান যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সকলেই আচার-ব্যবহারে ব্রাত্য। লৌকিক অর্থে চারণ ব্রহ্মবন্ধু নয়, সর্বতোভাবে ক্ষত্রবন্ধু, কিন্তু ব্রাত্যস্তোমের ক্ষত্রবন্ধু নয়। "ব্রাত" (যাহাকে ইংরেজীতে বলে horde) হইতে ব্রাত্য হইয়াছে। ব্রাত্যেরা বন্যস্বভাব যাযাবর আর্যগোষ্ঠী অসংস্কৃতভাষী দুর্দান্ত দস্যুজীবী জাতি। ব্রাত্য বৈদিক ঋষি হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াছে, অধিকাংশ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে, চারণ হইতে পারে নাই; কারণ ব্রাত্যের গুণ, কর্ম, স্বভাব চারণের বিপরীত। যাহারা লুট করিত তাহারা যাচক হইবে কেন? এত কথার দরকার কি? তোমার কোন মতলব আছে নাকি?

৩

সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হইল। নাগকন্যা "অবরী" মধ্যএশিয়ার উরালশৃঙ্গের স্বর্গভ্রষ্ট যাযাবর অবরজাতির (The Abars), কিংবা বিশ্বামিত্রের কবলে বশিষ্ঠের কষ্টা কামধেনুর রোমনির্গত যোদ্ধা অনার্য আভীর জাতির দুহিতা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না।

চারণকে আপাততঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তরালে ত্রিশঙ্কুর মত রাখিয়া আমরা চারণজাতির সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করিব।

কাছেলাচারণ এবং মরুচারণের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক নাই। কাছেলা স্ত্রীলোকের পর্দা নাই, পুরুষ হাল চাষ করে, তাহারা আচার-ব্যবহারে শূদ্র। মরুচারণগণকে বিসোত্রা বলা হয় (অর্থাৎ ১২০ শাখায় বিভক্ত)। পিতার নাম, গ্রামের নাম, কিংবা কোন মহৎ কার্যের স্মারক হিসাবে গোত্রের নাম হইয়াছে। যথা: দেবল ঋষির সন্তান দেবল গোত্র[১]। ভগবতী একটি মাটির পুতুলে প্রাণসঞ্চার

১। দেবল ঋষির বংশধর এখনও আছে; এই কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সংস্কৃত "দেবকুল" বাংলা ভাষায় দেউল, ডিঙ্গল ভাষায় দেবল (Dowal) হইয়াছে। দেউল শব্দের মঙ্গল-কাব্যাদিতে দেবমন্দির অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়, কিন্তু দেবকুল কোন কালেই দেবমন্দির ছিল না, উহার মধ্যে দেবতার মূর্তি থাকিত না, এক এক রাজবংশের মৃত রাজাদের প্রতিমূর্তি থাকিত। দেবকুল নগরের বাহিরে কিছুদূরে নির্মিত হইত।

দেবকুলের রক্ষক ব্রাহ্মণকে দেবকুলিক বলা হইত। প্রত্যেক রাজার ইতিবৃত্ত জানা না থাকিলে দেবকুলিক হওয়া যাইত না। এই পদ নিশ্চয়ই পুরুষ-পরম্পরাগত ছিল। ইঁহাদের কার্য মধ্যযুগের

করিয়াছিলেন; এই জন্য ঐ ব্যক্তির বংশের নাম আঢ়া হইয়াছে (ধৃষ্টিকা—ডিঙ্গল আঢ়া)। নরসিংহ নামক ভাছলিয়া শাখার চারণ অনেক সিংহ শিকার করিয়াছিলেন বলিয়া মাহড়রাও (পুরিহর) তাঁহাকে সিংহ চাহক উপাধি দিয়াছিলেন। এইজন্য ডিঙ্গল ভাষায় ইহার গোত্রের নাম সংঢায়চ হইয়াছে। চণ্ডকোটি নামক কবি তাঁহার কবিতায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ছয় ভাষা মিশ্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া মিশ্রণ নাম পাইয়াছিলেন। চণ্ডকোটির বংশজ হইতে মীসন গোত্র হইয়াছে। বংশভাস্কর মহাকাব্যের কবি সূরজমল মীসন এই গোত্রীয়। রাঠোরকুলের বারহট (বারহ) চারণের পূর্বজগণ দলবদ্ধ হইয়া ঘেরা দিয়া পশুচারণ করিতেন। এইজন্য উহাদিগের গোত্রের নাম রোহড়িয়া[৮] হইয়াছে। দধবাড়া নামক গ্রামবাসী চারণের বংশজ দধবাড়িয়া গোত্র। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্যামলদাসজী (মিবাড়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস বীরবিনোদ প্রণেতা) এই গোত্রীয় ছিলেন। নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠীর (বান্ধব, ভ্রাতা অর্থে) মধ্যে বিবাহ হয় না; চারণ ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ। মরুচারণ রাজপুতের মত আভিজাত্যাভিমানী, জীবনযাত্রাও রাজপুতের মত। চারণ স্ত্রীলোকেরা পর্দানশীন, পুরুষেরা বহু বিবাহ করে, মদ্যমাংস খায়, দাসীপুত্রে পরিবার ভারাক্রান্ত করে। উহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা বিদ্যাচর্চা, বিশেষতঃ অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বাড়ীতে ছাত্র রাখিয়া অধ্যাপনা করেন। কবিত্বশক্তি চারণের স্বভাবজ, মুখে মুখে স্থানে-অস্থানে যে চারণ কবিতা শুনাইতে পারেন না সে চারণই নয়। চারণ দেখিলেই রাজপুত বলিবে, "ঘণ্ কমো"। চারণ গো-ব্রাহ্মণের মত অবধ্য, চারণ রাজদ্রোহীর শাস্তি নির্বাসন। চারণদিগের গ্রামকে বিবদমান রাজপুত সেকালে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র জ্ঞান করিত, পলায়িত শত্রু চারণের গ্রামে আশ্রয় লইলে তাহাকে অনুসরণ করা হইত না। ভারত স্বাধীন হওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত ডাকাতেরা চারণের গ্রামে ডাকাতি করিত না, চোর চুরি করিত না বলিয়া শুনা যায়।

চারণের মত। সুতরাং দেবকুলিক-ব্রাহ্মণ চারণকুলে মিশিয়া গিয়াছে অনুমান অসঙ্গত নয়। দেবকুলিক ভাসের প্রতিমা নাটকের একটি চরিত্র। দেবকুলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিত গুলেরীর এক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে (গুলেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১৬-১৩৫)।

৮। দলবদ্ধ হইয়া পশুচারণ করিতে করিতে বিকানীরের দানাজাতি দিল্লীর কাছাকাছি এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত আসিত, ইহা আমি দেখিয়াছি। যাযাবর চারণ জাতির বোধ হয় এককালে এই একটি "চারবৃত্তি" করিত। যাহারা এখনও এই কার্য করে তাহারা গড়রিয়া, যাহারা কৃষিকর্ম চর্চা করিয়াছিল তাহারা হয়ত রোহড়িয়া চারণ হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চারণের সহিত ক্ষত্রিয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল। ক্ষত্রিয়ের জীবনযাত্রায় ব্রাহ্মণ পোশাকী (formal) চারণ আটপৌরে। দেউড়ি দরবারে, আড্ডা-মজলিসে, গুপ্ত-মন্ত্রণায় এবং লড়াই-শিকারে রাজপুতের নিত্যসঙ্গী চারণ; এবং নিতান্ত অভাবেও রাজপুতের অন্নের অর্ধাংশের ভাগী। আদর্শ রাজপুতের মনের অবসাদ এবং নিঃসঙ্গতা স্ত্রী-সান্নিধ্যে দূর করিতে পারিত না; ইহার জন্য আবশ্যক হইত আফিম ও চারণ। গুরু-পুরোহিত সঙ্কটের সহায়, উঁহারা দূর হইতে নমস্য, মনের দুর্বলতা ইঁহাদের নিকট হইতে গোপনীয়। বৈশ্য কারিন্দা বিশ্বস্ত হইলেও উঁহারা প্রজা, বেতনভুক্ ভৃত্য, উঁহাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হইলে রাজপুতের মর্যাদা হানি হয়। এই উভয় সঙ্কট হইতে রাজপুতের ত্রাতা একমাত্র চারণ, যিনি পূজ্য হইয়াও উপদেশক ও বন্ধুর স্থান পূর্ণ করিতে পারিতেন। চারণ মতলবী চাটুকার নহে, মুখের উপর রাজপুতকে কড়া কথা শুনাইবার সাহস চারণ ব্যতীত অন্য জাতির ছিল না।[১] ব্রাহ্মণের মত কথায় কথায় চারণ ক্ষত্রিয়কে অভিশাপ দিত না। রাজপুতের সুসময়ে চারণ যেমন দরাজ হাতে দান পাইয়াছে, তেমনি দুঃসময়ে রাজপুতের হাতে স্ত্রীর অলঙ্কার তুলিয়া দিতে এবং নিজের শরীরকে দায়বদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে গ্রহণীয় চারণের উদারতার অনেক উদাহরণ আছে।

১। শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ শিসোদিয়া (সময়কাল—অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক) অত্যন্ত দাতা, গুণগ্রাহী, পরাক্রান্ত এবং পাপিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করাইয়া পৌত্র-প্রপৌত্র এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন জ্ঞাতিগণকে নির্মূল করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রেয়সীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র জালিম সিংহকে নিষ্কণ্টক উত্তরাধিকার প্রদান। এই রাবণের ভয়ে শাহপুরা যখন সন্ত্রস্ত তখন সরসিয়া গ্রাম নিবাসী মহডু শাখার চারণ কৃপারাম রাজ-দরবারে প্রকাশ্যে শুনাইয়া দিলেন,

……………কৈ আগে খাধা বহুত।
চেলক চীতোড়াহ, অব তো ছোড় উমেদসী॥

অর্থাৎ, দুষ্কার্য অনেক করিয়াছ। তোমার সামনে অনেক খাদ। হে চীতোড়িয়া-পালক উম্মেদ সিংহ! এখন ত নিবৃত্ত হও।

ইহার পর উম্মেদ সিংহ কুলনাশ কার্যে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, জ্ঞাতিমুখ্যগণ রক্ষা পাইল। [বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৭০]।

যোধপুরের মহারাজা ভীমসিংহ (মৃত্যু ১৮০৩ খৃঃ) তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র এবং রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মানসিংহকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। মান-সিংহ পলাতক অবস্থায় সিরোহীর রাও বৈরীশালের নিকট স্ত্রী পুত্রের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ভীমসিংহের ভয়ে বৈরীশাল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অনুচরবর্গের সহিত মানসিংহ জালোর দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া বৎসরাধিক কাল আত্মরক্ষা করিলেন; তাঁহার পক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে অনেকে নিহত হইল, কেহ কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিল; অধিকন্তু দুর্গমধ্যে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। ভীমসিংহের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে জালোর দুর্গে মানসিংহ চরম অবস্থার সম্মুখীন হইলেন; অর্থ ও খাদ্যাভাবে হয় আত্মসমর্পণ না হয় মৃত্যু। বনশূর শাখার চারণ জুগ্‌তা মানসিংহের সহিত অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময় চারণ জুগ্‌তা প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষা করিবার অজুহাতে দুর্গের বাহির হইয়া কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং অবরোধকারী ক্ষত্রিয়গণের নিকটও ভিক্ষা পাইতেন। কিছুদিন পরে ভীমসিংহ ইহা জানিতে পারিয়া হুকুম পাঠাইলেন, চারণকে বাহিরে যাইতে দেওয়া হইবে না, তাহাকে কেহ ভিক্ষাও দিবে না। চারণ জুগ্‌তার পরিবার জালোরেই ছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে গিয়া বলিলেন, যাহা কিছু আছে দাও। জুগ্‌তার স্ত্রী সধবার চিহ্ন ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার ও সঞ্চয় স্বামীর হাতে সমর্পণ করিলেন। জুগ্‌তা মানসিংহকে বলিলেন, এই সম্বলে যতদিন চলে ততদিন যুদ্ধ করিতে পারেন। ইহার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খবর পৌঁছিল, অধার্মিক ভীমসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, সামন্তগণ কুমার মানসিংহকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিয়াছেন।

রাজ্যারোহণের পর মহারাজা মানসিংহ চারণ জুগ্‌তার স্ত্রীর জন্য এক লক্ষ মুদ্রার (দাম ; চল্লিশ দামে তখনকার আকবরশাহী এক টাকা) আভূষণ উপহার রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং জুগ্‌তাকে "লক্ষ-প্রসাদ" দানের সহিত বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের পাড়্লাই নামক গ্রাম দিয়াছিলেন। জুগ্‌তার মৃত্যুর পর মহারাজা মানসিংহ এক শোক-গীতিতে তাঁহার পুত্র ভৈরবদানকে নিজের "ভাইয়ের মত ভাই" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মহারাজা মানসিংহ পূর্ব-কৃত অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ সিরোহীরাজ বৈরীশালের রাজ্য ছারখার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিরোহী ছোট রাজ্য। চৌহানের সাহস, আবুরপাহাড় এবং মিবাড়ের মহারাজার সিরোহী

বহুদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। আওরঙ্গজেব মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে সিরোহী জায়গীর দিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে সিরোহী যোধপুরের অধীনে সামন্ত রাজ্য হইল। মানসিংহ বৈরীশালের উপর এক লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করিলেন; জরিমানা দিতে না পারিলে কারাবাস। বৈরীশালের যুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল না, জরিমানা দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। সিরোহীর চারণেরা অনেক গ্রাম নিষ্কর চারণোত্তর হিসাবে ভোগ করিত। তাহারা একত্র হইয়া এক আপোষের প্রস্তাব করিল; এক বৎসরের মধ্যে বৈরীশাল জরিমানার টাকা শোধ করিবেন এবং সমস্ত চারণ সম্প্রদায় এই টাকার জন্য জামিন থাকিবে। মানসিংহ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সৈন্যদল ফিরাইয়া আনিলেন। বিপদ-মুক্ত হইয়া বৈরীশাল ঐ টাকা দিতে অক্ষম কিংবা অসম্মত হইলেন। চারণ-মুখ্যগণ পণরক্ষার জন্য যোধপুরে গিয়া মানসিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহারা মহারাজাকে বলিলেন, মহারাজা তাহাদের সমস্ত গ্রাম হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া যতদিন জরিমানার টাকা না পাইবেন ততদিন তাহারা অন্য ক্ষত্রিয়ের যাচক হইয়া পরিবার পালন করিবে। মানসিংহ চারণ-মুখ্যগণকে এক এক ঘোড়া ও শিরোপা দিয়া বিদায় করিলেন, জরিমানার টাকা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য হইল না।

বৈরীশালের মৃত্যুর (বিঃ সম্বত ১৮৭৫ খৃঃ ১৮১৮) পর তাঁহার পুত্র উদয়ভাণ সিরোহীর গদিতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তীর্থযাত্রা করিয়া ফিরিবার পথে পালির নিকট মানসিংহের আদেশে উদয়ভাণ বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন। উদয়ভাণ পিতার জরিমানার টাকা শোধ করিয়া কিছুদিন পরে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয় উপকার শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; অপকার দীর্ঘকাল মনে রাখে। চারণের স্বভাব ইহার বিপরীত। অপমান ব্যতীত যজমানের সর্ববিধ অপরাধ চারণ ক্ষমা করিয়া থাকে, এবং অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়াও ভূতপূর্ব প্রভুর দান ও অনুগ্রহ চিরকাল স্মরণ করে এবং উহার প্রতিদানের সুযোগ পাইলে প্রাণ দিয়া ঋণমুক্ত হয়।

শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ শিশোদিয়া ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পৌষ মাসে তাঁহার জ্ঞাতি বনেড়ার জায়গীরদার সর্দারসিংহ শিশোদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। বনেড়া হইতে দুই ক্রোশ দূরে রাজা উম্মেদ সিংহ শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহার পৌত্র

কুমার রণসিংহকে অগ্রগামী সেনাদলের রণাধ্যক্ষরূপে বনেড়া দুর্গ অধিকার করিবার আদেশ দিলেন; এবং রণসিংহের সহিত তিনি তাঁহার প্রীতিপাত্র বিশ্বাসভাজন চারণ দেবকে পাঠাইলেন। চারণ দেবা মিবাড়ের সোদা-বারহঠ বাকর বংশজ। বনেড়ার অধীনস্থ শীহড়থা গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস ছিল। কোন কারণে বনেড়ার জায়গীরদার সর্দার সিংহের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় দেবা কয়েক বৎসর পূর্বে বনেড়া ত্যাগ করিয়া শাহপুরা চলিয়া আসিয়াছিলেন। উম্মেদ সিংহ আশা করিয়াছিলেন চারণ দেবা বনেড়ার উপর শোধ তুলিবার জন্য রণসিংহকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিবেন।

শাহপুরার অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া রাজা ভীমের অযোগ্য বংশধর সর্দার সিংহ দুর্গ এবং অন্তঃপুর অরক্ষিত রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রণসিংহ শহর অধিকার করিবার পর চারণ দেবা দ্রুতগতি রাজান্তঃপুরের রক্ষীশূন্য প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং মৃত্যু কৃতনিশ্চয় করিয়া অসি-চর্ম-হস্তে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় বিজয়ের উল্লাসে মত্ত লুণ্ঠনলোলুপ শাহপুরার সৈন্যদলের গতিরোধ করিলেন। যাহারা নিকটবর্তী হইতেছিল তাহাদিগকে দেবা সাবধান করিয়া গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, আমার মৃতদেহের উপর দিয়া আজ বনেড়ার অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ।

চারণের মারমুখী মূর্তি দেখিয়া আক্রমণকারীগণ ভীতচকিত ভাবে পিছনে ছুটিল, কেহ বলপ্রয়োগে সাহসী হইল না। কুমার রণসিংহ কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া দুই ক্রোশ দূরে রাজা উম্মেদ সিংহের কাছে খবর পাঠাইলেন। উম্মেদ সিংহ অশ্বারোহণে অন্তঃপুরের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেবার কাছে একাকী নিরস্ত্র উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ আপনি অকৃতজ্ঞ সর্দার সিংহের জন্য যাহা করিলেন, আমার বংশজগণের জন্য উহাই করিবেন—এই আমার প্রার্থনা। দেবা রাজার সঙ্গে শাহপুরা চলিলেন, সেনাদল বনেড়া ত্যাগ করিল, সর্দার সিংহের ধনমান রক্ষা পাইল।

অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শাহপুরার রাজা পূর্ণাধিকার সহ (উদক আঘাট) যেই গ্রাম চারণ দেবাকে দান করিয়াছিলেন উহা বর্তমানে খেড়া দেবপুর নামে বংশভাস্কর মহাকাব্যের টীকাকার এবং দেবার বংশজ বারহঠ্ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের অধিকারে রহিয়াছে।[১০]

১০। দ্রঃ বংশভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৬৯।

শাহপুরার রাজা (রাণীর প্ররোচনায়?) কনিষ্ঠ পুত্র জালিম সিংহকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্বৈত সিংহের প্রাণনাশ করাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অদ্বৈত সিংহের জ্যেষ্ঠ,

রাজপুত-গৌরব-গোধূলির মুহূর্তরাগ রঞ্জিত আকাশে যে তিনটি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, উহাদের একটি বিশ্রুতকীর্তি কবি ও যোদ্ধা বারহঠ্ চারণ করণীদানজী; দ্বিতীয় নক্ষত্র ছিলেন নীতিজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ এবং তৃতীয় ছিলেন মহারাজা বখ্‌ত সিংহ রাঠোর। ইহারা প্রত্যেকেই শুধু ইতিহাস নয়, নাটক-উপন্যাসের নায়ক হইবার উপযুক্ত চরিত্র।

যোধপুর রাজ্যের বারহঠ্ চারণ করণীদানজী বাল্যে ও যৌবনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত পুস্তকের তালিকা দেখিলেই পণ্ডিতের চক্ষুস্থির হয়। রাজ-দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে হইলে সেকালের প্রসিদ্ধ চারণগণকে কি রকম একনিষ্ঠ ভাবে দীর্ঘকাল কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ইতিবৃত্ত এবং জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন করিতে হইত,—উহা করণীদানজীর রচিত সূর্যপ্রকাশ মহাকাব্য হইতে অনুমান করা যায়। শস্ত্র এবং শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতে পারদর্শী না হইলে চারণ ক্ষত্রিয় যজমানের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। করণীদানজী অসমসাহসিক যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

সওয়াই জয়সিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় সিংহকে বঞ্চিত করিয়া আম্বের রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কূটনীতি আশ্রয় করিয়া পৈত্রিক রাজ্য চতুর্গুণ করিয়াছিলেন, নিজের রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কলিযুগে শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, মালবের সুবাদারী পাইয়া তিনি সিপ্রা নদীর জলে স্নানপূর্বক মোগল সম্রাটের সুবা মালব চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-পেশোয়া প্রথম বাজীরাওকে উদক দান করিয়াছিলেন। জয়পুর শহর, মান-মন্দির ইত্যাদি জয়সিংহের অন্যান্য কীর্তি সর্বজনবিদিত, তাঁহার অকীর্তির মধ্যে মোগল সম্রাটের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য তিনি এই কার্য করিয়াছিলেন। দানগ্রহীতা

পুত্র রণসিংহকে হত্যা করিবার জন্য কালা মিয়াঁ নামক মুসলমানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন কালা মিয়াঁ রণসিংহের উপর তলোয়ার চালাইতে গিয়া রণসিংহের পুত্র ভীমসিংহের খড়গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাশায়ী হইল।

চারণ সেবার কাহিনী (Modern Review, February, 1957) এবং আমার Studies in Rajput History (Nopani Lecture, C. U., Srichand & Sons. Delhi) পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে Ram Singh, son of Raja Umed Singh, লেখা আছে। বংশভাস্করের ভূমিকায় ৬৯ পৃষ্ঠায় উম্মেদ সিংহ সম্বন্ধে উপরের para-তে বনেড়া অভিযান এবং নীচে উম্মেদ সিংহের দুষ্কৃতির বর্ণনা আছে। টীকাকার উপরে "পুত্র" এবং অন্য কাহিনীতে "পৌত্র" লিখিয়াছেন। আমি এই অসঙ্গতি পূর্বে লক্ষ্য করি নাই। 'পুত্র' শব্দ নিশ্চয়ই ছাপার ভুল, টীকাকারের নহে। এই স্থলে উহা সংশোধন করা গেল। পূর্বকৃত অনবধানতার জন্য বিশেষ লজ্জিত।

ব্রাহ্মণ পেশবা প্রথম বাজীরাও উহার প্রতিদানে জয়পুরের প্রকাণ্ড দরবারে মহা-রাজাধিরাজের মুখে গড়গড়ার ধূঁয়া ছাড়িয়াছিলেন। জয়পুরাধীশ মনকে প্রবোধ দিলেন, হাজার হোক "দখিনী"[১১] ত বটেই! তাঁহার সভাকবি বর্ণিত ১০৯ সংখ্যক মহান্ কার্য-তালিকায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

বালক বখ্‌ত সিংহের মতি-গতিও শার্দূল-পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার মাতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজা অজিত সিংহকে সাবধান করিয়া বলিতেন, তুমিও যখন একাকী থাক, ঘরে এই ছেলেকে আসিতে দিও না। মহারাজা অজিত সিংহ এককালে অসীম শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; বৃদ্ধ বয়সে জোর তত ছিল না, কিন্তু ঝাঁজ ছিল কড়া। তিনি স্ত্রীর কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং বলিতেন, রাখ, রাখ, এই হাতের এক চড়েই তোমার ঐ চ্যাংড়া ছেলে একেবারে ঠাণ্ডা হইবে।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় কৃষ্ণা-দ্বাদশীর রাত্রিতে যখন পিতামাতা গভীর নিদ্রামগ্ন বখ্‌ত সিংহ পিতার শিয়রে রক্ষিত তরবারির দ্বারা এমন হাত-সাফাই করিয়া বাপের গলা কাটিয়া ফেলিলেন যে, বাপ শব্দও করিতে পারেন নাই; রক্তে বিছানা ভিজিয়া গায়ে কাঁটা না দেওয়া পর্যন্ত মাও জাগেন নাই। ইহার পর বখ্‌ত সিংহ রক্তাক্ত তরবারি লইয়া বুরুজের উপরে এক ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রহিলেন। পরের দিন সর্দারগণ তাঁহাকে নীচে আসিতে অনুরোধ করাতে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, আমি এই কাজ করি নাই; দাদা (অভয় সিংহ) আমাকে করিতে বলিয়াছিল; এই দেখুন তাঁহার চিঠি! এই বলিয়া তিনি চিঠি নীচে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নির্ভয়ে নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধা মাতা "সতী" হওয়ার সময় অভিশাপ দিয়াছিলেন, যে এই দুষ্কর্ম করিয়াছে মারবাড়ের ভূমিতে শেষ পর্যন্ত তাহার স্থান হইবে না।

মহারাজা অভয় সিংহ ভ্রাতাকে পিতৃহত্যার প্রতিজ্ঞার পুরস্কার স্বরূপ নাগোরের স্বাধীন রাজত্ব দিয়াছিলেন। বখ্‌ত সিংহ ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যোধপুরের গদী অধিকার করিবার জন্য তিনি সওয়াই জয়সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অভয় সিংহ যখন বিকানীর দুর্গ অবরোধ ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত, তখন বখ্‌ত সিংহের আমন্ত্রণে সওয়াই জয়সিংহ বিরাট বাহিনী ও তোপখানা লইয়া লুনী নদী অতিক্রমপূর্বক যোধপুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাঠোরের ভূমিতে কচ্ছবাহের ধৃষ্টতায় বখ্‌ত সিংহের রাঠোর-রক্ত মাথায় উঠিল। তিনি নাগোর

১১। দখিনী শব্দ হিন্দুস্থানে "বাঙ্গাল" অর্থে ব্যবহার হয়। ঢাকার বাঙ্গাল কিন্তু পূর্ববঙ্গের পাড়াগাঁয়ের লোককে বাঙ্গাল বলে।

হইতে বিকানীরে গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, এবং বিকানীরের অবরোধ না উঠাইয়া যোধপুর রক্ষার ভার তাঁহাকে দেওয়ার জন্ত অনুরোধ করিলেন। অভয় সিংহের সম্মতি পাইয়া বখ্‌ত সিংহ আমন্ত্রিত কচ্ছবাহকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত চলিলেন। ইহা কিন্তু রাঠোরের সমবেত শক্তির পক্ষেও দুষ্কর কার্য ছিল। মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ স্থিরবুদ্ধি বিচক্ষণ যোদ্ধা, সৈন্যবল অনেক বেশী, আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত এবং তোপখানা রক্ষিত। রাঠোর সংখ্যায় অল্প, সম্বল বর্শা ও তরবারি, সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বখ্‌ত সিংহের মাত্র যুদ্ধে হাতখড়ি। কোন অতর্কিত আক্রমণ জয়সিংহের সাবধানতায় সম্ভবপর হইল না। লুনী নদীর উত্তর তীরে রাঠোর দুর্গাদাসের ভূতপূর্ব জায়গীরে অবস্থিত গাংগানী নামক স্থানে বখ্‌ত সিংহ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার সঙ্গে আট হাজার রাঠোর অশ্বারোহী ছিল। ব্যূহবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বখ্‌ত সিংহ তাহাদিগকে বলিলেন, যাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন ফুরায় নাই তাহারা চলিয়া যাইতে পারে। পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর লৌহকীলক-সদৃশ ব্যূহমুখে থাকিয়া ভীমকর্মা বখ্‌ত সিংহ তোপখানার অগ্নিবৃষ্টিতে আগ্নেয়-স্নান করিয়া অসিহস্তে দুই-দুইবার সমগ্র শত্রুবাহিনী বিদীর্ণ করিয়া তৃতীয় আক্রমণের জন্ত স্বস্থানে বিজয়োল্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, কতজন মরিল কেহ হিসাব রাখে না। সকলের মাথায় খুন চাপিয়াছে; পাঁচ হাজারের মধ্যে তখন যাটজন যোদ্ধা জীবিত ছিল। উহাদের মধ্যে বখ্‌ত সিংহের পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে চারণ করণীদান অন্যতম। করণীদান দৃঢ়কণ্ঠে রণোন্মত্ত রাঠোরগণকে বলিলেন, তৃতীয়বার আক্রমণ সুবুদ্ধির কাজ হইবে না, কচ্ছবাহের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। জয়সিংহ এই যাটজন অশ্বারোহীর উপর প্রতিআক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না; তিনি দ্রুত যুদ্ধস্থল হইতে হতাবশিষ্ট সেনা লইয়া পলায়ন করিলেন। বখ্‌ত সিংহ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, যে পাঁচ হাজার যোদ্ধা তাঁহার মরণের সঙ্গী হইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিজের হঠকারিতায় মৃত্যুর কবলে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন, এবং শোকে অধীর হইয়া বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাজধানী নাগোরে ফিরিয়া বখ্‌ত সিংহ আবার গোঁফে চাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগ্‌ত-কে (ভক্ত—জয়সিংহ) আমি আম্বেরের দুর্গ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ছাড়িব। ইতিমধ্যে সওয়াই জয়সিংহ মারবাড় বিজয়ের উৎসব উপলক্ষে বখ্‌ত সিংহের এক দেবমূর্তির সহিত আম্বেরের এক দেবীমূর্তির মহা ধুমধামে বিবাহ দিলেন। ঐ দেবমূর্তি যুদ্ধের সময় কচ্ছবাহগণের হাতে পড়িয়াছিল।

সেবতার বিবাহের পর জয়পুরাধীশ বর-বধূকে নাগোরে যৌতুকসহ পাঠাইয়া দিলেন। বখ্‌ত সিংহ গলিয়া জল হইয়া গেলেন। জয়সিংহের এই চালে বখ্‌ত সিংহ আম্বেরের প্রিয় কুটুম্ব বৈবাহিক হইয়া গেলেন।

বখ্‌ত সিংহ অভয় সিংহের পুত্র রাম সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের গদী অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে পুষ্করতীর্থে বখ্‌ত সিংহ এবং সওয়াই জয়সিংহ পরম বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। পুষ্কর সেকালে রাজস্থানের Geneva—নিরপেক্ষ দেবভূমি যেখানে বিগ্রহ ও রক্তপাত করিতে কোন রাজপুত রাজা সাহসী হইতেন না। উভয় পক্ষে আদর-আপ্যায়ন চলিতে লাগিল। একদিন এক সামাজিক মজলিসে জয়পুর ও যোধপুর নৃপতি একত্রিত হইলেন। বখ্‌ত সিংহ একাধারে বীর পণ্ডিত এবং কবি; সওয়াই জয়সিংহ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁহারা চারণ-কবি করণীদানকে উপস্থিত মত (extempore) কিছু শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। কবির এক দোহা শুনিয়াই নৃপতিদ্বয়ের মুখ লাল হইয়া গেল। তাঁহারা দুইজনেই গাংগানীর রণক্ষেত্রে রণদুর্মদ-চারণের অসির অশনিসম্পাত দেখিয়াছিলেন; পুষ্করক্ষেত্রে উল্লাসমুখর সমাজগোষ্ঠীতে এইবার চারণের কণ্ঠে তাঁহাদের কানে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল।—

> জৈপুর ও জোধাণপত, দোনাঁ থাপ উথাপ।
> কূরম মারয়ো ডীকরো, কমধজ মারয়ো বাপ॥

জয়পুর নৃপতি এবং যোধবংশপতি উভয়ে সৃষ্টি উলট-পালট করিতে পারেন। কূর্ম (কচ্ছবাহ জয়সিংহ) মারিয়াছেন জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং কামধ্বজ (রাঠোর) মারিয়াছেন বাপ্‌!

৬

দিগ্‌বিজয়ী কবি করণীদান যেখানে গিয়াছেন সেখানেই রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। যোধপুর রাজ্যের সুলবাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী, গ্রামের নামই "কবিয়া"। রাঠোর বংশের ইতিহাসমূলক "সূর্যপ্রকাশ" নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া করণীদান মহান্ সৎকার পাইয়াছিলেন। মহারাজা অভয় সিংহ কবি করণীদানকে কবিরাজা উপাধি ভূষিত করিয়া "লক্ষপ্রসাদ" দান দিয়াছিলেন। অধিকন্তু মারবাড় রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মাণ্ডোবরের (মান্দোর) তোরণদ্বারে কবিকে হাতীর উপর চড়াইয়া বিরাট শোভাযাত্রার সহিত দুই ক্রোশ দূরবর্তী

যোধপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং এই শোভাযাত্রায় মহারাজা অশ্বারূঢ় হইয়া হাতীর আগে আগে চলিয়াছিলেন। কবি মহারাজাকে প্রশংসা করিয়া যে দোহা শুনাইয়াছিলেন উহার প্রথম ছত্র—"অশ চড়িয়ো রাজা অভো, কিব (চারণ) চাঢ়ে গজরাজ।"

সম্ভবতঃ মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মহারাজা বখ্‌ত সিংহের নিকট হইতে কোন কূটনৈতিক প্রস্তাব লইয়া কবি করণীদান মিবাড়ে গিয়াছিলেন। কবি মিবাড়ের উপর সুপ্রসন্ন ছিলেন না। পরলোকগত মহারাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ (১৬৯৮-১৭১১ খৃঃ) ভাট চারণের দৃষ্টিতে মহাপাপী ছিলেন। ব্রাহ্মণ চারণ ভাট মিলিত হইয়া উদয়পুরে ধর্ণা দিয়াছিল। মহারাণার কঠোরতা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই দেখিয়া রাজপুরোহিত নিজ হইতে ছয় লক্ষ টাকা এবং খেমপুরের মথ্‌-বাড়িয়া চারণ তিন লক্ষ টাকা দিয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও চারণ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিলেন; কিন্তু ভাটের ধর্ণা ত্যাগ করিল না। মহারাণা খবর পাইলেন সত্যাগ্রহী ভাটেরা বিছানার মধ্যে রুটি-মিঠাই লুকাইয়া রাখে। তাঁহার হুকুমে ভাটের ডেরার উপর হাতী ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং পলায়িত ভাটগণের বিছানার মধ্যে নাকি রুটি-মিঠাই পাওয়া গিয়াছিল (সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন)।[১২] ইহার পরে উদয়পুরের পাঁচ মাইল উত্তরে আম্বেরী নামক স্থানে দুই হাজার ভাট বুকে পেটে ছোরা মারিয়া আত্মহত্যা করিল; মহারাণা ভাটদের ৮৪ গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিলেন। অমরসিংহের মৃত্যুর পর মহারাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহজী (১৭১১-৩৪ খৃঃ) রাজ্যারোহণ করিয়া পিতাকে স্বর্গে না উঠাইলেও প্রজাপালন, দানশীলতা এবং গুণগ্রাহিতার জন্য বিপুল যশলাভ করিয়াছিলেন। কবি করণীদান দরবারে উপস্থিত হইয়া মরুভাষায় স্বরচিত পাঁচটি "গীত" অর্থাৎ কবিতা মহারাণাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মহারাণা কবিকে বলিলেন, ইহা কি গীত না মন্ত্র? ধূপার্চনার দ্বারা মন্ত্রের আরতির বিধান আছে। যদি আপনার অনুমতি হয় আমি গীতকে মন্ত্রজ্ঞানে ধূপের আরতি করিব, না হয় "লক্ষ-প্রসাদ" দান গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। ইহার প্রত্যুত্তরে করণীদানজী বলিলেন, এই কয়েকদিন পূর্বেই শাহপুরার রাজা উম্মেদ সিংহ এবং ডুঙ্গারপুর রাজ্যের মহারাবল শিব সিংহ আমাকে "লক্ষ্য-প্রসাদ" দিয়াছেন, এই দান

১২। ওঝা, রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯১৯-৯২০।

এই যুগের সত্যাগ্রহ এবং অনশন ব্রতেও ভেজালের অপবাদ শুনা যায়। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে ঢাকায় আমাদের বাড়ীর নিকট ঢাকা বোর্ডের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকদিন সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। পরে শুনা গেল ছাত্রেরা নাকি গোপনে পালা করিয়া খাইয়া আসিত। ডুব দিয়া জল খাইলে নাকি নিরম্বু একাদশীর বাবাও টের পায় না।

আরও হয়ত অনেকে দিবেন। আর্যদিবাকর আপনি, মহারাণার হাতে আমার গীত দু'শ পাইলে ধন্ত হবে। মহারাণা গীতের পাতাগুলির যথাবিধি ধুপার্চনা করিয়াছিলেন, অধিকন্তু "লক্ষ-প্রসাদ"ও কবিকে দিয়াছিলেন।[১৩]

৭

মিবারের মহারাণা প্রথম জগৎসিংহ (রাজসিংহের পিতা, রাজ্যকাল, ১৬২৮-৫২ খৃঃ) দানশীলতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা ও সামন্তবর্গ অপেক্ষাও কবিগণ তাঁহার নিকট অধিক অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করিত। যোধপুর রাজ্যের গোলপাত (স্থানস্থ) চারণ রোহড়িয়া করণীদান (এই নামের একাধিক ব্যক্তি ছিলেন), একবার রাজকার্য উপলক্ষে উদয়পুর গিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে পাঁচশত কদম [পাদক্ষেপ] দূরে জগদীশের মন্দির পর্যন্ত অগ্রবর্তী হইয়া জগৎসিংহ চারণকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—যে সম্মান স্বয়ং যোধপুরের মহারাজাও মিবারে পাইতেন না। জগৎসিংহের দরবারে মারবাড় রাজ্যের যোথড়া গ্রামনিবাসী সংচায়চ শাখার চারণ হরিদাস অনেক দান-সম্মান পাইয়াছিলেন এবং মহারাণার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। একদিন অনবধানতাবশতঃ হরিদাস মহারাণার সম্মুখে শেখাবটির (বর্তমান জয়পুর রাজ্যের উত্তরাংশ) এক ক্ষুদ্র রাজা টোডরমলের উদারতা, দানশীলতা, ইত্যাদি সদ্‌গুণের উচ্চপ্রশংসা করিয়া বসিলেন।

ক্ষত্রিয় স্বভাবতঃ পরকীর্তি-অসহিষ্ণু। ক্ষত্রিয়ের দানশ্লাঘা ক্ষত্রিয়ের বীর্যশ্লাঘার মতই স্পর্শকাতর। টোডরমলের প্রশংসায় মহারাণার অভিমানের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। মহারাণা চারণকে বলিলেন, ঐখানে যাইয়া দেখুন; কি দান পাইলেন আমাকে আসিয়া বলিবেন।

চারণ তথাস্তু বলিয়া শেখাবটি যাত্রা করিলেন। হরিদাস উদয়পুর ঠিকানার সমীপবর্তী হইয়াছেন শুনিয়া টোডরমল ছদ্মবেশে পালকীবাহক সাজিয়া অন্যান্য পাল্কীবাহকগণের সহিত হরিদাসের পাল্কীর ডাণ্ডা কাঁধে তুলিয়া চলিলেন; ঠিকানায় পৌঁছিয়া হরিদাস ইহা জানিতে পারিলেন। উদয়পুরে কয়েকদিন আতিথ্যগ্রহণ করিবার পর হরিদাস বিদায় লইবার সময় টোডরমল দক্ষিণাস্বরূপ উদয়পুরসমেত ৪৫ গ্রাম তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। হরিদাস এই দান স্বীকারে অসম্মত হইয়া বলিলেন, চারণের কাজ ক্ষত্রিয়ের বৈভব বৃদ্ধি, ক্ষত্রিয়কে রাজ্যশূন্য করা নহে।

১৩। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৫১।

টোডলমল পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন, আপনার এইরূপ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই, আমি অসিবলে অন্যভূমি জয় করিয়া লইব। হরিদাস অগত্যা কয়েকটা গ্রাম স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট রাজ্য আশীর্বাদস্বরূপ টোডলমলকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

মহারাণা জগৎসিংহ ইহা জানিতে পারিয়া হরিদাস এবং টোডলমল উভয়ের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, তাঁহার আত্মম্ভরিতার অগ্নিতে শান্তিবারি বর্ষিত হইল। হরিদাস মহারাণাকে এক প্রশস্তি শুনাইয়া উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচার করিয়াছিলেন—

দোয় উদয়পুর উজলা, দুহুঁ দাতার অবল্ল।
ইক্‌তো রাণো জগতসী, দুজো টোডরমল্ল॥

দুইজন দানশীল রাজার দান-গৌরবে দুই উদয়পুর কীর্তিভাস্বর। ইহাদের একজন (মহা) রাণা জগৎসিংহ, দ্বিতীয় টোডলমল্ল।

ইহা পৌরাণিক কাহিনী নয়; এই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনা। শেখাবটির অন্তর্গত খাণ্ডেলার রাজা রায়সাল আকবর বাদশাহর প্রসিদ্ধ মনসবদার। ইনিই আকবরনামায় বর্ণিত রায়সাল দরবারী। সম্রাট রায়সালের কনিষ্ঠ পুত্র ভোজরাজকে উদয়পুরের ঠিকানা সহ ৪৫ গ্রাম জায়গীর দিযাছিলেন। টোডরমল্ল ভোজরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী, টোডরমলের বংশ বর্তমানে খেতড়ী, সূরজগঢ়, মলসীসর, নবলগঢ় ইত্যাদি ঠিকানার রাজা।

সম্রাট শাজাহানের বিশ্বস্ত মানসবদার বীরাগ্রগণ্য বুন্দীরাজ সত্রসাল ছাড়া বড় দাম্ভিক প্রকৃতি ছিলেন। কোন সময়ে মহিয়ারিয়া গোত্রের চারণ দেবা বুন্দী গিয়াছিলেন। সত্রসাল তাঁহাকে সম্মান আপ্যায়ন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু চারণের মন উঠিল না। একদিন কবিসংবর্ধনার আসর হইতে বাহির হইয়া চারণ দেবা দেখিলেন বুন্দীরাজ তাঁহার চটিজোড়া হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রাজার বিনয়ে দেবা নিজের অভিমানের জন্য লজ্জিত হইলেন এবং দোহার ছন্দে প্রশংসা করিলেন—

পার্ণাঁ গহ পৈজার, সুকব অগা ধরতাঁ সতা।
হিক হিক বার হাজার পহ সুমাঁ মাথৈ পডী॥

[জুতা হাতে তুলিয়া সত্রসাল সুকবির সামনে রাখিলেন। এক এক প্রাটির বার বার হাজার জুতা অন্য রাজাদের মাথায় পড়িল।]

সত্রসালের পৌত্র রাও ভোজ সীসন শাখার চারণ ঈশ্বরদাসকে দুই ক্রোশ অগ্রসর

হইয়া স্বাগত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পাল্‌কিতে বসাইয়া নিজে পাল্‌কির ডাণ্ডায় কাঁধ দিয়াছিলেন। রাও ভোজ পূজার অক্ষতের (আতপ তণ্ডুলের) পরিবর্তে মুক্তার দানার দ্বারা চারণের পাদপূজা করিয়া তাঁহাকে বুন্দীর প্রতোলী-পাত্র (পোতপাল বারহঠ) রূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ভোজের বংশজ মহারাওরাজা বিষ্ণুসিংহ চারণ ঈশ্বরদাসের বংশ-বরেণ্য বদন কবিকে নিজের কাঁধের উপর পা রাখাইয়া হাতীতে চড়াইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং হাতীর আগে আগে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন।[১৪]

ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে চারণ-কবি যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, কাব্যপ্রতিভা যে শ্রদ্ধা পাইয়াছে, উহা কদাচিৎ অন্যত্র দেখা যায়।

৮

রাজপুতানা এবং মহারাষ্ট্রে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজ্য অধিকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই দুই স্থানে তিনি জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। রাজপুতানা অপেক্ষা মহারাষ্ট্রের কৃতিত্ব অধিক, যেহেতু মহারাষ্ট্রের দেশপ্রেম রাজপুতানার মত রাজ-কেন্দ্রিক ছিল না; ক্ষত্রিয়ের বর্ণ জাতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুতানায় ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে অন্য সম্প্রদায় সমান বীরত্বে যুদ্ধ করিয়াছে, ক্ষত্রিয় অসমর্থ হইলে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দেশরক্ষা করিতে পারে নাই।

রাঠোর দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মারবাড়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে চারণ ব্রাহ্মণ বৈশ্য এবং আদিবাসী সকলেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কবিরাজা চারণ বাঁকী দাস রচিত "রাজরূপক" কাব্যে উহার অনেক উদাহরণ রহিয়াছে।

যে মুষ্টিমেয় যোদ্ধা আওরঙ্গজেবের অবরোধ ভেদ করিয়া মহারাজ যশোবন্তের দুগ্ধপোষ্য-শিশু অজিতকে দিল্লীর যশোবন্তপুরা হইতে দেশে পৌঁছাইয়াছিল উহাদের মধ্যে দিল্লীর যুদ্ধে চারণ সাঁদু এবং মীসন শাখার রতন প্রাণদান করিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থী শাহজাদা আকবরকে (আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহীপুত্র) সপরিবার সুদূর দাক্ষিণাত্যে পৌঁছাইবার জন্য যে পাঁচশত নির্ভীক অশ্বারোহী দুর্গাদাসের অনুগমন করিয়াছিল উহাদের মধ্যে ছিলেন চারণ সাঁদুর পুত্র যোগীদাস, ভারমল, সাদো, খাদুর পুত্র আসজ এবং বিট্টু, কানহো।

১৪। দ্রঃ ভূমিকা পৃঃ ৫০—৫১ বংশভাস্কর।

মুসলমান সেনানায়কগণ অকৃতকার্য হইবার পর বিদ্রোহী রাঠোরগণকে দমন করিবার জন্ম আওরঙ্গজেব তাঁহার বিশ্বস্ত মনসব্‌দার রাঠোর সংগ্রাম সিংকে (প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহেশদাস রাঠোরের পৌত্র) যোধপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অজিতের পক্ষাবলম্বী রাঠোর সর্দারগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে যোধপুরের বারহট চারণ কেশরী সিংহ উঁহাদের মুখপাত্র রূপে সংগ্রাম সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্তুতি ও তিরস্কারে সংগ্রাম সিংহ এতদূরে বিচলিত হইয়া পড়িলেন যে, নিজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারবাড়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বসিলেন, মারবাড়ের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাঠোর দুর্গাদাসের পর তাঁহার কৃতিত্ব সর্বাধিক। দরবারী ইতিহাসে সংগ্রাম সিংহ বিদ্রোহীগণের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন লেখা আছে; কেন দিয়াছিলেন উহা আমরা রাজরূপক কাব্য হইতে জানিতে পারি।

যাচক হইয়াও চারণ জাতি কাহারও কাছে মাথা নত করে নাই, ঐশ্বর্যের বিরাট পরিবেশের মধ্যে আপন দারিদ্র্যে সঙ্কুচিত হয় নাই, নিজের যোগ্যতায় বিশ্বাস হারায় নাই। চারণের এক উপাধি তকব অর্থাৎ তার্কিক, কথায় চারণের সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সভায়, মজলিসে চারণের পক্ষে পরাজয় স্বীকার ক্ষত্রিয় যজমানের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় অপেক্ষা অধিক অপমানজনক ছিল। বাগ্মিতার সহিত ধূর্ততার সংমিশ্রণ না হইলে সভা জয় হয় না, এই গুণে চারণকে বীদগ (সংস্কৃত বিদগ্ধ) বলা হয়।

মহড়ু শাখার চারণ জাড়া মহারাণা প্রতাপের অযোগ্য ভ্রাতা জগমালের সহিত মিবাড় রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন অপরাজেয় যোদ্ধা ও সুকবি খান খানান আবদুর রহিম চারণ জাড়ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কবির প্রশংসাসূচক ডিঙ্গল ভাষায় এক দোহা লিখিয়াছিলেন। চারণ জাড়া বড় বেয়াড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। যেখানে আবদুর রহিমকে সটান দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত সেইখানে সম্রাটের দরবারে চারণ জাড়া একদিন বসিয়া পড়িয়াছিলেন। রাজপুরুষগণ শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্ম ধমক দেওয়াতে জাড়া উঠিলেন না, একটা দোহা শুনাইয়া দিলেন—

> পগে ন বল পতশাহ, জীভাঁ জস বোলাঁত নৌ।
> অব জস অকবরশাহ, বৈঠা বৈঠা বোলসাঁ॥[১৫]

১৫। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৪৮।

অর্থাৎ বাদশাহের মত আমার পায়ে জোর নাই ; জিহ্বাতেই কিছু যশগান করিবার বল। এখন বসিয়া বসিয়াই আকবর শাহের যশ (প্রশস্তি) পড়িব।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারেও চারণের সম্মান ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে এক চারণ-কবির কবিতার অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই চারণ কর্তৃক পিতা ও পুত্রের তুলনাত্মক তুল্য-প্রশংসা জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জয়সলমীরপতি রাবল বুধসিংহের মৃত্যুর পর তেজসিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং গদীর ন্যায্য অধিকারী অখৈ সিংহের উত্তরাধিকার হরণ করিয়া অখৈ সিংহকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। অখৈ সিংহ পলাতক হইয়া উজলাঁ নামক গ্রামে সংচায়চ শাখার চারণ কান্‌হার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কান্‌হা শুধু অখৈ সিংহের ছয় মাস পর্যন্ত ভরণ-পোষণ করেন নাই, তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় জয়সলমীরের অধিকাংশ সামন্ত অখৈ সিংহের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন এবং উঁহাদের সাহায্যে তেজ সিংহকে বিতাড়িত করিয়া অখৈ সিংহের রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

কে বলিবে চারণ কেবল ক্ষত্রিয়ের পোষক, চাটুকার যাচক ?

৯

তরবারি প্রাণ হরণ করিতে পারে, মানাভিমানীর মান হরণ করিতে পারে না। মানের জন্ত ক্ষত্রিয় জাতি শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়াছেন, চারণের কাছে জোড়-হাত হইয়া রহিয়াছেন। মুসলমানকে কন্তাদান করিয়া কচ্ছবাহ বংশের কলঙ্ক রটিয়াছিল। রাজা মানসিংহ এই কলঙ্কের দাগ হাল্‌কা করিয়া মিথ্যা কীর্তির প্রভাব ঢাকিবার জন্ত নগদ টাকা, হাতী, গ্রাম ইত্যাদি লইয়া সর্বসাকুল্যে ছয় ক্রোড় দাম (চল্লিশ দামে আকবরশাহী এক টাকা) দান করিয়াছিলেন। "এই অন্তায় দান বিপ্র, সূত (চারণ) বন্দীজন (ভাট) বণ্টন করিয়া লইয়া গণিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক (কচ্ছবাহ কুলের) যশ অতিবিস্তার করিয়াছিল।"[১৬]

এই বিষয়ে সেকাল এবং বর্তমান কালের মধ্যে পার্থক্য নাই। এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ভাট চারণের প্রাপ্য এক শ্রেণীর সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিক উক্তবিধ কার্যের জন্ত ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, মানসিংহের এই দানের

১৬। বংশভাস্কর দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ২৩১৯, মূল দ্রষ্টব্য।

লক্ষ টাকার দান বৃথা হয় নাই, ভবিষ্যতে ইহার সুফল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইতে পারে।[১৭]

মোটা দক্ষিণা পাইলে চারণদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ঢেঁকীর যশও গাইতেন; কিন্তু চারণেরা যাহা কিছু রক্ষা করিয়াছেন উহার মধ্যে এমন জিনিস আছে যাহার সত্যতা সমর্থক মোগল দরবারের সমসাময়িক চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। (চারণ-শ্রুতি) যথা—

আম্বেরের মীর্জা রাজা জয়সিংহকে দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাণনাশ করাইতে চাহিয়াছিলেন এবং এই জন্য রতনু গোত্রের চারণ জগন্নাথকে অনেক লোভ দেখাইয়াছিলেন। এই লোভ তুচ্ছ ও অযোগ্য জ্ঞান করিয়া জগন্নাথ সমস্ত ব্যাপার মীর্জা রাজাকে বলিয়া দিলেন এবং বড় কৌশল করিয়া দিল্লী হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিলেন। এই কার্যের প্রত্যুপকারস্বরূপ মীর্জা রাজা চারণ জগন্নাথকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার মুদ্রা (দাম, ৪০ দামে এক টাকা) আয়ের জীবিকা (ভূমিদান) দান করিয়াছিলেন। জগন্নাথের বংশধরগণ এখন (বিংশ শতাব্দীতে) নাঁগল ঝোণ্ডুঁদা, ভোজপুরিয়া, প্রভৃতি গ্রামে বিদ্যমান (বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৬৫)।

আসল ঘটনা কিন্তু অন্যরূপ। এক বড়গুজর রাজপুত মেবারের (বর্তমান আলোয়ার রাজ্যের প্রাচীন নাম) কোন এক জায়গায় জয়সিংহের প্রাণনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জয়সিংহ সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন। শাহাজাদা দারাশুকোর প্ররোচনায় আততায়ী এই কার্য করিয়াছে বলিয়া জয়সিংহ দারাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠি পাওয়া না গেলেও উহার প্রত্যুত্তরে দারা যে চিঠি

১৭। জয়পুরের একটা ইতিহাস-ইংরাজীতে লিখিবা দেওয়ার শর্তে জয়পুর দরবার স্বর্গবাসী আচার্য যদুনাথকে খাস দপ্তর হইতে ফার্সি আখবারাত (সংবাদ তালিকা ইত্যাদি) গুলির নকল লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ইতিহাস অপ্রকাশিত অবস্থায় জয়পুরে পড়িয়া রহিয়াছে। উহার যে অংশে লেখা হইয়াছে মানসিংহের পিসী ও ভগিনীকে যথাক্রমে আকবর ও তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর বিবাহ করিয়াছিলেন উহা বাদ দেওয়ার জন্য আচার্য যদুনাথকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। যদুনাথ লিখিয়াছিলেন একটি শব্দও তিনি পরিবর্তন করিবেন না। জয়পুর দরবারের বক্তব্য ঐ দুই কন্যা আসল রাজকুমারী ছিলেন না, শুনা যায় অন্য জাতের মেয়ে ডোলায় চড়াইয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল (!!)

শুনা যায় জয়পুরের প্রামাণ্য ইতিহাস লেখা হইতেছে। উহার উপাদান হয়ত রাজা মানসিংহ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহা এতদিন আঁধারে ছিল, স্বাধীনতার পর আলোকে আসিতে বাধা নাই।

জয়সিংহকে লিখিয়াছেন উহাতে জয়সিংহের চিঠির বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে এবং ঐ চিঠির নকল আচার্য যদুনাথ জয়পুর হইতে আনিয়াছিলেন। উহাতে দারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি বড়গুজরকে প্ররোচনা দিয়াছি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনি যাহা প্রমাণ পাইয়াছেন পাঠাইবেন।..." একমাত্র আপনার ভাগিনেয়ী বলিয়া আমি অমর সিংহের কন্যার (নাগোরের রাও; যশোবন্তের পিতার জ্যেষ্ঠ এবং ত্যজ্যপুত্র) সহিত কুমার সুলেমান শুকোর সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি—

শাহাজাদা আওরঙ্গজেব পিতার বিরুদ্ধে জয়সিংহকে সপক্ষে আনিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত শত্রুতার সদ্ব্যবহার তিনি জানিতেন, তাঁহার চর সম্ভবতঃ এই বড়গুজরকে (যাহার সহিত জয়সিংহের বৈর ছিল) প্রলোভন দেখাইয়া জয়সিংহকে হত্যা করিবার প্ররোচনা দিয়াছিল। যদি চেষ্টা বিফল হয় এবং বড়গুজর ধরা পড়িয়া সত্য প্রকাশ করে, এই সম্ভাবনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এই চারণ জগন্নাথকে হাত করা হইয়াছিল এবং দারা তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া মীর্জা রাজার কাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য, রাজা যদি মারা যায় ভালই; বাঁচিয়া থাকিলেও ততোধিক ভাল; কারণ রাজা দারার দারুণ শত্রু হইবেন। রাজা জগন্নাথকে পুরস্কার দিয়াছিলেন এই কথা ঠিক। চারণের মুখে জনশ্রুতি কালক্রমে কিভাবে ইতিহাস বিকৃত করে ইহাই উহার নমুনা।[১৮]

১৮। Dara Shukoh, second edition.

বংশভাস্কর আচার্য যদুনাথ ব্যবহার করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি। চারণের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। সমসাময়িক প্রমাণের বিরোধী হইলেই আমি চারণকে পূর্বে সরাসরি বিদায় দিতাম। দারার জীবনী লিখিবার সময় উক্ত কাহিনীর আসল সত্য যে এইরূপ হইতে পারে উহা তখন চিন্তা করি নাই। বৃদ্ধ বয়সে ধৈর্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, বুদ্ধিও হয়ত পাকিয়াছে। যাহা হৌক, গবেষকগণ আশা করি ভবিষ্যতে চারণের কাহিনী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করিয়া উহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিছু আছে কিনা ধৈর্য সহকারে বিচার করিবেন।

মালব ও রাজস্থানে বিদ্বান চারণ সর্বত্র রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। রাঠোর, শিশোদিয়া এবং চৌহান কুলের মধ্যে চারণের প্রতিপত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। আম্বেরের কচ্ছবাহ দরবার ছিল সর্বভারতীয়। দক্ষিণী পণ্ডিত, পূরবিয়া ব্রাহ্মণ এবং পিঙ্গল হিন্দীর কবিগণ মরু চারণ অপেক্ষা জয়পুরে অধিক সমাদৃত হইতেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিক ভাণ্ডারে চারণ জাতির শ্রেষ্ঠ অবদান সুসংস্কৃত মরুভাষা এবং কাব্য-সমৃদ্ধ মরুসাহিত্য, যাহাকে ডিঙ্গল হিন্দী বলা হয়। রাজপুতানার ঊষরভূমি এবং বালুকা-সমুদ্র বস্তুতঃ চারণের কণ্ঠেই ভাষা পাইয়াছে। যাযাবর পশুপালকের অপভ্রংশমূলক একটি কথিত উপভাষাকে সুসাহিত্যের বাহন করিয়া আভিজাত্যের গৌরবদান করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। বহু শতাব্দী ব্যাপী চারণের একনিষ্ঠ বাণী সাধনার দ্বারা এই বিরাট্ সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছে। অপর পক্ষে ইহাও সত্য, একমাত্র ক্ষত্রিয় জাতির দান চারণের সর্ববিধ সাংসারিক অভাব দূর না করিলে, ক্ষত্রিয় রাজারা গুণগ্রাহী না হইলে, মধ্যযুগের চারণ প্রতিভা অর্ধস্ফুট-অনাঘ্রাত মল্লিকা কোরকের ন্যায় মরুর বুকে অকালে ঝরিয়া পড়িত, উহার সৌরভ দূরদূরান্তে ক্ষত্রিয়ের রাজসভা এবং মোগল দরবারকে উতলা করিত না।

পৃথ্বীরাজ রাসো প্রমুখ রাসো কাব্যের ধারা চারণ জাতি বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত প্রবহমান রাখিয়াছে। চারণ-কবির একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছিল, চার-কাব্যে কল্পনার বৈচিত্র্য নাই, সমসাময়িক ইতিবৃত্ত উহার প্রাণবস্তু। বাংলা দেশের কাব্য-রসিকগণ বলিতে পারেন ডিঙ্গল ভাষার কাব্য ছন্দোবদ্ধ গদ্য বিবৃতি, অতিশয়োক্তি ভারাক্রান্ত ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র, ওজঃগুণ ও ধ্বনিমাহাত্ম্য ব্যতীত চারণ-কবিতার অন্য সম্পদ নাই।

বাংলা দেশে যেমন ভদ্রতার খাতিরে হাতুড়ে বৈদ্যকেও কবিরাজ বলিতে হয়, রাজস্থানে যে রাচণ হয়ত কস্মিনকালে কবিতা মুখে আনে নাই তাহাকেও অন্য জাতির লোক কবি কিংবা ঠাট্টা করিয়া কবিরাজা বলে। কবিরাজা কিন্তু যশলুব্ধ পণ্ডিত ও কবিগণের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। ক্ষত্রিয় রাজারা এই উপাধি দানের অধিকারী ছিলেন। উদযপুরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাসজী একমাত্র চারণ, যিনি কাব্য না লিখিয়া "কবিরাজা" হইয়াছিলেন। শ্যামলদাসজী বিঃ সম্বত ১৯৩২ (১৮৭৫ খৃঃ) সালে উদয়পুর দরবারে তাজিমী সরদারের সম্মান পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ মহারাণা দাঁড়াইয়া যাহাদিগকে

অভ্যর্থনা করিতেন (ফার্সি তাজীম=সং অভ্যুত্থান) ঐ শ্রেণীভুক্ত হইলেন ; এক বৎসর পরে হাত বাড়াইয়া করমর্দনের অধিকার, উহার এক বৎসর পরে পায়ে সোনার "লংগর" (পায়ের কড়া) ধারণ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। মহারাণা সজ্জন সিংহজী (রাজত্বকাল খৃঃ ১৮৭৪) বিঃ ১৯৩৫ পৌষ শুক্লা তৃতীয়া দিবসে শ্যামলদাসজীর গ্রাম ঢোকলিয়ার বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি শ্যামলদাসজীকে কবিরাজা উপাধি, সোনার একজোড়া পায়ের "তোড়া", পাগড়িতে বাঁধবার জরির টুকরা (অতি উচ্চ সম্মান সূচক) এবং অনুগ্রহের প্রতীক্ আরও বহু দ্রব্য দিয়াছিলেন। মহারাণা আরও পাঁচবার শ্যামলদাসজীর গ্রামের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে (বিঃ ১৯৪ -১৮৮৭ খৃঃ) চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে মহারাণা সজ্জন সিংহ, যোধপুরের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ এবং কিষণগড়ের মহারাজা শার্দুল সিংহ একযোগে শ্যামলদাসজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

উদয়পুরের প্রজার ভাগ্যে এই প্রকার গৌরব লাভ আর কখনও ঘটে নাই।

১১

রাজপুত দরবারে বিশিষ্ট চারণগণ প্রথম শ্রেণীর সর্দারের মত অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। বংশভাস্কর প্রণেতা বুন্দী দরবারের মহাকবি মীসন সূরজমল "ঠাকুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ডুঙ্গরপুরের মহারাবল উদয় সিংহ মহিয়ারিয়া শাখার চারণ সবীসিংহকে কবিরাজা উপাধি ও পায়ের সোনার কড়া (লংগর) দিয়াছিলেন। জয়সলমীরের মহারাবল বৈরীশাল রতনু শাখার চারণ শিবদানকে কবিরাজা উপাধি ও পায়ের স্বর্ণভূষণ দিয়াছিলেন। বিকানীরের মহারাজা ডুঙ্গর-সিংহ বীটু শাখার চারণ বভূতদানকে (বিভূতিদান) কবিরাজা উপাধি এবং সংঢায়চ শাখার চারণ খুমদানকে এক গ্রাম সহ "ঠাকুর" উপাধি দিয়াছিলেন। কোটার মহারাও রামসিংহ মহিয়ারিয়া শাখার চারণ ভবানীদানকে কবিরাজা উপাধি এবং স্বর্ণভূষণ রৌপ্যদণ্ড, ছত্রচামর, ইত্যাদি অন্যান্য অধিকার সহ (privilege) তাজামে (খোলা পাল্‌কি, সুখপাল রাজকীয় সম্মানের পরিচায়ক) চড়িবার অধিকার দিয়াছিলেন।[১৯]

১৯। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৫২-৫৩।

ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য জাতির মান্য ব্যক্তিগণও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাজীম (অভ্যুত্থান), পায়ের

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চারণ-প্রতিভার বহুমুখী স্ফুরণ রাজস্থানকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। শ্যামলদাসজীর পরে যিনি রাজপুতানায় ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি পাইয়াছিলেন তিনি "আসিয়া" শাখার চারণ কবিরাজা মুরারিদান (১৮৩০-১৯১৪ খৃঃ)। মুরারিদানজীর পিতা ভারতদান এবং পিতামহ "রাজরূপক" কাব্যপ্রণেতা বাঁকীদাস। তিনি পিতার নিকট ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া জৈন-পণ্ডিত যতি জ্ঞান-চন্দ্রজীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ষোল বৎসর বয়স হইতে তিনি যোধপুর রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ মুরারিদানকে "লক্ষপ্রসাদ" মহাদান দিয়াছিলেন এবং বিদায়ের সময় যোধপুরের সুরজপোল তোরণ পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন; লোহাপোল দরজায় চারণ দানের হাতীতে চড়িয়া মাথার উপর চামর দোলাইয়া নিজের বাড়ীতে পৌঁছিলেন। ইহার পর চল্লিশ বৎসর বয়সে মুরারিদান যোধপুর জিলার হাকিম নিযুক্ত হইয়া রাজসেবায় উচ্চ হইতে উচ্চতম স্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন; দেওয়ানী আদালতের অধিকর্তা, আপীল-আদালতের জজ, জেনারেল সুপারিন্টেনডেণ্ট ইত্যাদি সকল পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্মকুশলতায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুরারিদান যোধপুর শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাজকার্যের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও চারণের সরস্বতী বিনোদন ব্যাহত হয় নাই।[২০]

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে (বিঃ ১৯৫১) মুরারিদান তাঁহার "যশোবন্ত যশভূষণ" নামক

স্বর্ণভূষণ ইত্যাদি অধিকারের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বৈশ্যের অধিকার জীবিতকাল পর্যন্ত, ক্ষত্রিয় ও চারণের অধিকার পুরুষানুক্রমিক, এমন কি পোষ্যপুত্রও উক্ত অধিকারে বঞ্চিত হয় না। উক্ত চারণগণের পায়ের স্বর্ণভূষণ ইত্যাদি তাহাদের বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ দরবারে যাইবার সময় ব্যবহার করেন।

২০। মুরারিদানের প্রকাশিত পুস্তক "যশোবন্ত যশভূষণ" এবং "চারণ-খ্যাতি", অপ্রকাশিত এবং অসম্পূর্ণ গ্রন্থ—হিন্দী কাব্য বিহারী-সতসই-র টীকা, নায়িকা ভেদ, এবং বেদান্ত বিষয়ক "আত্মনির্ণয়" এবং "বৃহৎ চারণ খ্যাতি" (দ্রঃ গুলেরী গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৯-৮০) যশোভূষণ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের গৌরব লাভ করিয়াছে। মুরারিদানজী যাযাবরীয় কবিকুলের দ্বিতীয় রাজশেখর কিন্তু কবির সহজাত আত্মম্ভরিতায় তিনি কালিদাসকে হার মানাইয়াছেন।

ভোজ সময় নিকসী নহি ভরতাধিক কো ভুল।
সো নিকসী জসবন্ত সময়...............

অর্থাৎ রাজা ভোজের সময় ভরতাদি কাব্য-শাস্ত্রকারগণের যে সমস্ত ভুল ধরা পড়ে নাই উহা বাহির হইয়াছে যশোবন্তের সময় (দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ)।

অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ ("যশোভূষণ" কাব্যের নায়ক) এই জন্য তাঁহাকে কবিরাজা উপাধি এবং দ্বিতীয়বার "লক্ষপ্রসাদ" মহাদান দিয়াছিলেন; এই উপলক্ষে মুরারিদান প্রথম শ্রেণীর সর্দারগণের দুর্লভ অধিকার এবং আগ্রহের চিহ্ন লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাচর্চা ও রাজসেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজসংস্কার কার্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। বিবাহাদি উৎসবে রাজপুতের অপব্যয়, চারণের উৎপাত এবং ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে যাঁহারা রাজপুতহিতকারিণী সভা সংস্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, মুরারিদান উঁহাদের মধ্যে অন্যতম। পঞ্চাশ পার হওয়ার পূর্ব হইতে মুরারিদানের খ্যাতি সমস্ত রাজপুতানায় প্রসার লাভ করিয়াছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণা সজ্জন সিংহ এবং যোধপুরাধীশ একত্র মুরারিদানজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

যখন স্বামী দয়ানন্দের আর্যসমাজ আন্দোলন পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারত তোলপাড় করিতেছিল, এবং স্বয়ং মহারাণা সজ্জন সিংহ দয়ানন্দের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল তখন কবিরাজা মুরারিদান মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উদয়পুর গিয়াছিলেন। এই সময় মহারাণা জরা ও ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শয়নঘরে মুরারিদানকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়াই মুরারিদানজীর চক্ষুস্থির। মহারাণা তখন বুকের উপর শিবলিঙ্গ রাখিয়া পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। মুরারিদানজীর কুতূহল নিবারণ করিবার জন্য মহারাণা বলিলেন, আমার ইষ্ট কি আপনি জানিয়াই ফেলিয়াছেন। রাজার কর্তব্য নিজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্বার্থের ভাবনা ত্যাগ করিয়া যে কার্য লোকহিতকর উহাই গ্রহণ করা। স্বামীজীর সঙ্গে বিরোধ করিলে আমার আস্তিকতা যেমন আছে তেমনই থাকিবে, কিছুমাত্র বাড়িবে না, পরন্তু স্বামীজীর দ্বারা যে অনেক হিতকার্য হইতেছে, আমার বিরোধিতা উহাতে বিঘ্নসৃষ্টি করিবে, প্রজারা যে প্রেরণা পাইতেছে উহা পাইবে না।

মুরারিদানের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক "বংশভাস্কর" গ্রন্থের টীকাকার শাহপুরা নিবাসী চারণ শ্রীকৃষ্ণসিংহ মহারাণা সজ্জন সিংহের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসিংহজী বহু বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বংশভাস্করের টীকা লিখিয়া না গেলে এই রাজপুত মহাভারত আধুনিক কোন প্রসিদ্ধ হিন্দী পণ্ডিতেরও সম্পূর্ণ বোধগম্য হইত না। মহারাজা সজ্জন সিংহ তাঁহাকে তুর্কী ঘোড়া, স্বর্ণভূষণ, ইত্যাদি দান করিয়াছিলেন, এবং রাজকীয় বড় নৌকাতে বসিবার এবং মহারাণার আগে

আগে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া চলিবার অধিকার দিয়াছিলেন, যাহা প্রথম শ্রেণীর সকল সর্দার পাইতেন না। মহারাণা সজ্জন সিংহের উত্তরাধিকারী মহারাণা ফতেসিংহ তাঁহাকে হাতী এবং কয়েক হাজার টাকা দান দিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে চারণ ও ক্ষত্রিয় অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কৃষ্ণ-সুদামা ছিলেন। এক ছপ্পয় (ষট্‌পদী) কবিতায় শ্রীকৃষ্ণসিংহজী লিখিয়াছেন—

সুদামা রীত মাধব সরস কৃষ্ণ সজ্জন স্বীকারিয়ো।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যোধপুরের মহারাজা দ্বিতীয় যশোবন্ত সিংহ এবং কিশনগড়ের রাজা শার্দূল সিংহ উদয়পুর আসিয়াছিলেন। মহারাণা সজ্জন সিংহ পিছোলা হ্রদের মধ্যবর্তী জগনিবাস মহলে তাঁহার নব নির্মিত সজ্জন বিলাস প্রাসাদের ভিতর যে জলাশয় তৈয়ার করাইয়াছিলেন উহাতে স্নান করাইবার জন্ত উহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন। নৃপতিত্রয়ের অতি অনুগৃহীত কয়েকজন সঙ্গে গিয়াছিলেন, উহার মধ্যে চারণ শ্রীকৃষ্ণসিংহও ছিলেন। জলকেলি ও মদ্যপান খুব চলিতেছিল। যোধপুরাধীশ সাঁতার জানিতেন না, তিনি স্নান করিয়া জলাশয়ের পশ্চিম কিনারার ঝরোকায় বসিয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। চারণের উচ্ছিষ্ট মদের পিয়ালা যশোবন্ত সিংহ যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানেই রাখা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণসিংহের যখন আবার মদ্যতৃষ্ণা জাগিল মহারাজা ঐ উচ্ছিষ্ট পেয়ালা ভরিয়া শরাব তাঁহার মুখের কাছে ধরিলেন। চারণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইহাতে আপত্তি জানাইলেন। মহারাজা বলিলেন, আপনারা এত পূজনীয়, যাঁহাদের জুতা আমরা উঠাইতে পারি, ঝুট, পেয়ালা কোন্ কথা ?

মহারাণা সজ্জন সিংহের মৃত্যুর পর এক শোকগীতিতে চারণ আপেক্ষ করিয়াছেন, গলা জড়াইয়া ধরিয়া শরাবের পেয়ালা আমার মুখে আর কে তুলিয়া দিবে ? (কৈ গলবাঁহী দে দিয়া, মদ-প্যালা মনুহার।)

১২

মধ্যযুগে রাজস্থানের যে ক্ষত্রিয় মহামহীরুহ-বীথির আশ্রয়ে দুর্দিনে নির্যাতিত হিন্দুর ধর্ম ও আর্য-সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করিয়াছিল, স্বাধীন ভারতে কালধর্মে সাম্য-বাদের ঝঞ্ঝা উহাকে ভূপাতিত করিয়াছে, চারণ জাতি আশ্রিতা বল্লরীর স্তায় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় অসিবলে আর কীর্তিসম্পদ আহরণ করিবে না, চারণগীতির মেঘমন্দ্র ধ্বনি আর্যরক্তে আবার

বিদ্যুৎ সঞ্চার করিবে না। কালধর্ম অনতিক্রমণীয়; তবে পরভৃত চারণ তথা স্ববীর্যভুক্ ক্ষত্রিয়ের ভবিষ্যৎ কোথায়?

চারণের জন্য ভবিষ্যতের সংকেতবার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে একজন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজদ্রোহী চারণ। তাঁহার স্বাধীন চিন্তাপ্রবণ মন গতানুগতিক সনাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজস্থানে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের উপর চারণ জাতির অনন্য-নির্ভরতা ভবিষ্যতে উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হইতে বাধ্য; যাচক চিরকাল বামন হইয়াই থাকিবে, অর্থনৈতিক চাপে বিব্রত ক্ষত্রিয় দীর্ঘদিন চারণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। এই বিদ্রোহী চারণ যাচকবৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশসেবায় ব্রতী হইয়া শেষ বয়সে তিনি অর্ধাশনে চিকিৎসার অভাবে অকালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তবুও পণভঙ্গ করিয়া তাঁহারা রাজা-মহারাজা বন্ধুর দান গ্রহণ করেন নাই। ইহার নাম আজকাল কেহ জানে না; যেহেতু তিনি কংগ্রেসী ছিলেন না, নিজের পরিচালিত সংবাদপত্রে নিজের ঢোল বেনামী বাজাইতেন না। সমসাময়িকগণের নিকট ইনি রাজস্থানের প্রথম সাংবাদিক, প্রথম মুদ্রাযন্ত্র (রাজস্থান যন্ত্রালয় প্রেস) প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম হিন্দী দৈনিক পত্রিকার (রাজস্থান-সমাচার) সম্পাদক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

মনীষী সমর্থদানজী প্রথম বয়সে স্বামী দয়ানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উৎকট আর্যসমাজী হইয়াছিলেন, "হিন্দু" শব্দ মুখে আনিতেন না, ঘাট করিয়া নিয়মিত সন্ধ্যা-হোমাদি করিতেন। আর্যসমাজের "বৈদিক প্রেস" মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক হইয়া সমর্থদানজী যাযাবর বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক বোম্বে, এলাহাবাদ, মোরাদাবাদ, আজমীঢ় প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। আর্যসমাজে ইহার প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক বেদ-ভাষ্যের প্রথম সংস্করণের মুখপত্রে সমর্থদানজীর নাম। স্বামীজীর মৃত্যুর পর সমর্থ-দানজীর মোহভঙ্গ হইল। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন, দলের খাতিরে নিজের স্বাধীনতা খর্ব করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, প্রতিনিধি-সভার দ্বাদশ মহাপ্রভুর সেবা পূর্বপুরুষের যাচক-বৃত্তি অপেক্ষাও তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। সমর্থদানজী স্বোপার্জিত অর্থে আজমীঢে হাবেলী প্রস্তুত করিয়া স্থায়ীভাবে ঐখানে বাস করিতে লাগিলেন, আর্যসমাজ ত্যাগ করিয়া সনাতনী হইলেন, সন্ধ্যা-গায়ত্রীকে চিরদিনের মত বিদায় দিলেন, ক্ষত্রিয়ের চারণ বিশ্বচারণের ভূমিকায় নামিলেন। আজমীঢে রাজস্থান যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া তিনি অনেক নিঃস্ব গ্রন্থকারের

অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশনের কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে নিজের সম্পাদনায় রাজস্থান-সমাচার নামক হিন্দী পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে অর্ধসাপ্তাহিক এবং অবশেষে দৈনিক বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার এবং দেশসেবার মৌলিক চিন্তাধারা রাজস্থান-সমাচারকে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে উন্নীত করিল, প্রতিষ্ঠা ও অর্থ জোয়ারের মত আসিতে লাগিল। যোধপুরের স্তর প্রতাপসিংহ, উদয়পুর, বিকানীর, প্রভৃতি রাজ্যের মাহারাণা, রাজা-মহারাজা এবং জায়গীরদার মহলে রক্ষণশীল অথচ সংস্কারব্রতী মনীষী সমর্থদানজীর প্রভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ইংরেজ সরকারেও তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। Chief Commissioner এবং A. G. G. তাঁহার কাছে আসিয়া পরামর্শ লইতেন।

দৈনিক পত্রিকার শ্বেতহস্তী পোষণ চারণের কর্ম নহে। পত্রিকা হইতে লাভ উঠাইবার জন্য যে ব্যবসায় বুদ্ধির প্রয়োজন উহা সমর্থদানজীর ছিল না। তিনি লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন, লক্ষাধিক টাকা ঠাট্ বজায় রাখিবার জন্য খরচ করিয়া ভাঁটার টানে ঋণের অকূল সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি কাহারও দ্বারস্থ না হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তখনও কয়েক লাখ টাকা খরচ করিয়া ভারতবর্ষের এক বিপুল ইতিহাস কয়েক খণ্ডে ছাপাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা স্তর প্রতাপসিংহজী তাঁহাকে পোতপাল চারণ রূপে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্ধাশনে থাকিয়াও সমর্থদানজী মহারাজার যাচকতা স্বীকার করেন নাই। একটি নয় বৎসরের কন্যা রাখিয়া, বিরাট দৈন্যের মধ্যে সগর্বে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর অকাল আহ্বান অকম্পিত চিত্তে সমর্থদানজী গ্রহণ করিলেন।

চারণের সম্মুখে এই বলিষ্ঠ পৌরুষের আদর্শ রহিয়াছে, রাজস্থান সমাচার বাহিত অভয় বাণী রহিয়াছে, "সত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ।"[২১]

২১। সমর্থদানজীর জীবনীর উপাদান গুলেরী গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৩-২৭৮)।

রাজপুতানার চারণ জাতি

"দিল্লী দরগহ অম্ব ফল, উচা ঘণা অপার।
চারণ লকৃখো চারণা, ভাল নবাঁবনহার ॥"
[চারণ দুরাসাকৃত দোহা]

১

সম্রাট্ আকবরের শোভাযাত্রা একদিন দিল্লীর [ফতেপুর সিক্রীর ?] রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছে। পথে যাচক ফকির ও দর্শনার্থীর ভিড়। দরবারে মুরব্বি না থাকিলে কেহ বাদশাহর কাছে প্রকাশ্য দরবারে কোন প্রার্থনা অভিযোগ জানাইতে পারে না, গরীবের ইহাই সুযোগ। ভিড়ের মধ্য হইতে একজন চারণ হাত তুলিয়া সম্রাটকে আশীর্বাদ জানাইল, চারণের হাতে একটি পুঁটলি। অনুমতি পাইয়া চারণ ঐ পুঁটলি শাহান্‌শাহকে নজর পেশ করিল। পুঁটলি খুলিয়া সম্রাট কিছু আশ্চর্যান্বিত হইলেন, এবং চারণকে অন্যদিন দেখা করিবার আদেশ দিলেন।

সম্রাট চারণকে ডাকাইয়া গোপনে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, তুমি আমার "ধুনী" কেমন করিয়া দেখিলে? সবিস্তার ঠিক ঠিক বল।

চারণ বলিল, আমার নাম লক্‌খা [প্রচলিত লাখা], নিবাস যোধপুর, মহারাজের "পোতপাল" [খাস্] চারণ। আমি বদরীনাথ যাত্রায় গিয়াছিলাম। পথে ডুলি [ছীকা] ছিঁড়িয়া নীচে পড়িয়া গেলাম, চোট সামান্য লাগিয়াছিল। নিকটেই পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন দেখা গেল। ঐ "পগদণ্ডী" ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে পথ শেষ হইয়াছে সেখানে দেখিলাম চারিটা ধুনী জ্বলিতেছে, তিনটার কাছে তিন "অতীত" [অতি বৃদ্ধযোগী] ধুনী পোহাইতেছেন। তিন মূর্তিকে দণ্ডবত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম চতুর্থ মহাত্মা যাঁহার ধুনী জ্বলিতেছে তিনি কোথায়? মূর্তিত্রয় বলিলেন, তুই কে? এইখানে কেমন করিয়া আসিলি? তোর দেশ কোথায়? আমি বলিলাম, দিল্লী মণ্ডলে আমার নিবাস। তাঁহারা বলিলেন, ঐ মহাত্মা ত দিল্লীতেই রাজত্ব করিতেছেন। আমি নিবেদন করিলাম, মহামান্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী সম্রাট আকবর শাহ বর্তমানে দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছেন, সেখানে কোন "অতীত" নাই। মহাত্মা বলিলেন, হাঁ হাঁ ঐ আকবরই ত এই ধুনীর "অতীত", উঁর সঙ্গে

তোর দেখা হবে? আমি বলিলাম, মহারাজ। বাদশাহের কাছে আমাকে কে যাইতে দিবে? মহাত্মার চিঠি ও আসা হজরতের ধুনীর "ভস্মী" লইয়া আমি দিল্লী আসিয়াছি।[১]

ইহার পর চারণ ও জাতিস্মর বাদশাহের মধ্যে কি কথাবার্তা হইল জনশ্রুতিও শুনে নাই, তবে লাখা নামক এক চারণ ছিল, তিনি আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং আকবর তাঁহাকে বরণ-পত্সাহ অর্থাৎ চারণ-সম্রাট উপাধি দিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আঢা শাখার প্রসিদ্ধ চারণ দুর্সা সমস্ত চারণ জাতির কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির অর্ঘ্য লাখাকে নিবেদন করিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামায় উদ্ধৃত দুর্সার দোহায় বলা হইয়াছে—

দিল্লীর দর্গার [দরবারের অনুগ্রহ রূপী বৃক্ষের] আম্রফল অতি উচ্চ শাখায় ফলিয়া থাকে। চারণ জাতির জন্য ঐ ডাল চারণ লাখাই নোয়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

২

চারণ বলিতেই বাঙালী পাঠকের প্রাণে "চারণের অগ্নিবীণা।" বাজিয়া উঠে, পাঠ্যাবস্থায় আমাদের কানেও ঐ "অগ্নিবীণা" বাজিয়াছে। সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি চারণ কস্মিনকালে বীণা, বেহালা কিংবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র স্পর্শ করে

১। এই গল্প বিশ্বাস করা না করা পাঠকের মর্জি কিন্তু এই গল্পে আকবরের উদারতা এবং চারণ চরিত্রে তড়িত বুদ্ধি ও ধাপ্পাবাজির যে ছায়া পড়িয়াছে উহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া মুশকিল। [দ্রঃ মুগুলেরী গ্রন্থ, নাগরী প্রচারিণী সংস্করণ, পৃঃ ২৫১]

আকবর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে আর একটি গল্প আছে, যথা দারিদ্র্যপীড়িত এক ব্রাহ্মণ পরজন্মে দিল্লীশ্বর হওয়ার কামনা করিয়া প্রয়াগ তীর্থে কাম্যকূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরজন্মে তিনি আকবর বাদশাহ হইয়াছিলেন। ছোটকালে আমি মা'র কাছে এই গল্প শুনিয়াছিলাম এবং চল্লিশের পরে আমি এই গল্পই উর্দু ইতিহাস (শমসুল্ উলামা হোসেন আজাদ প্রণীত) দরবার-ই আকবরী গ্রন্থে পড়িয়াছি। আমার মা নিশ্চয়ই বাবার কাছে (আমরা বাবাজী বলিতাম) শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বাবা কোথায় পড়িলেন কিংবা কার কাছে শুনিলেন? রাস্তার ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া পড়ার বাতিক থাকিলেও তিনি আমাদের মত ইতিহাস পড়েন নাই, বংশের কুলপঞ্জিকা লিখিয়াছেন। দেড় বৎসর বয়স হইতে যে পিতামহী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন তাঁহার কাছে জমিদারীর চিঠা, খতিয়ান ছাড়া কিছুই ছিল না, সুতরাং লোকের মুখে মগের মুলুকে যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি হিন্দু জাতি রক্ষা করিয়াছে, তাঁহাকে অবতার, যোগী যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করিবার হেতু সে যুগে নিশ্চয়ই ছিল।

না, গান গাহিয়া ভিক্ষা করা চারণের পেশা নহে। চারণ অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদায় নিকৃষ্ট ভাট [হালে "বন্দীজন"] সম্প্রদায় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যজমানের বংশকীর্তি আবৃত্তি করে, যাহারা ঢোল বাজায় তাহাদিগকে ঢোলী বলে। রাজপুতের বংশাবলী এবং ইতিবৃত্ত ভাটেরাই রক্ষা করিয়া থাকে এবং যাচক হিসাবে দান পাইয়া থাকে। ভাটের গদ্যে লিখিত ও অলিখিত ইতিবৃত্তকে খ্যাত বা বার্তা বলা হয়। ভাটের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে রাণী-মংগা বলা হয়, যেহেতু তাঁহারা রাণী এবং "ঠাকুরাণী" [সামন্ত-গৃহিণী] গণের পিতৃ-মাতৃকুলের বংশ পরিচয় রক্ষা করে এবং ইহা শুনাইয়া উঁহাদের নিকট ভিক্ষা দাবি করিয়া থাকে। চারণ প্রাচীন সূত-মাগধের ন্যায় স্তুতিপাঠক, ছন্দোবদ্ধ যশ বর্ণনা ইহাদের কাজ। চারণের রচনাকে কবিত্ কিংবা গীত বলা হয়। কবিত্ ও গীতে কথা অল্প, অলংকারই (বিশেষতঃ অতিশয়োক্তি এবং বক্রোক্তি) প্রধান; এইগুলি গান (song) নয়, অগ্নিগর্ভ গাথা, গীতের ছন্দে আবৃত্তির (declamation) উপযোগী। এই গীত অনেকটা প্রাক্-ইসলাম যুগের পৌত্তলিক আরব-কবিতার মত। বাদশাহী দরবারে নকীব যেমন বাদশাহ সিংহাসন মঞ্চে পদার্পণ করিতেই তৈমুর পর্যন্ত পূর্ব পুরুষের নাম তারস্বরে ঘোষণা করিত, রাজপুত দরবারেও প্রত্যেক সর্দারের সহগামী চারণ সংক্ষেপে প্রভুর "যশ" বর্ণনা করিত, যথা, শক্তাবত কুল-প্রধানের বন্দনা—

দুনা দাতার, চৌগুণা জুঝার
খোরাসানী মুলতানীরা[২] অগ্‌গল।

[দানে দ্বিগুণ যুদ্ধে চতুর্গুণ খোরাসনী-মুলতানীর অর্গল স্বরূপ···]

রাজপুতানায় সামাজিক নাচগানের আসরে চারণ এবং ভাট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না। বাংলা দেশের "নট" জাতি অপেক্ষাও সমাজে হেয় "ডোম" এবং তাহাদের

২। মিথ্যাভাষণ না হইলে কবিতা হয় না স্তুতিও হয় না। ঐতিহাসিক সত্যতা (heresay) উদ্ভাবনের ব্যাপারে ভাট চারণের জুড়ি নাই, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইতেও উহাদের বিবেকে বাধে না।

হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎ অপসরণের সময় মহারাণা প্রতাপকে প্রাণের ভয়ে পলাইতে হয় নাই, তাঁহার ঘোড়া "চেটক" [বা: চৈতক।] খাদ লাফাইয়া মরে নাই, ভ্রাতা শক্ত সিংহের কোন খোরাসানী-মুলতানী পশ্চাদ্ধাবনকারীকে বধ করিবার সুযোগ হয় নাই। যুদ্ধে যিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই হিন্দুবিদ্বেষী ঐতিহাসিক বদায়ূনী লিখিয়াছেন, ঐদিন বিকালে মোগল সেনা এত পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল যে, তাহারা ঘাটির ঐ পারে যাইতে সাহস করে নাই। (দ্রঃ ওঝা, রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৭৫৩)। টডের বর্ণনা বর্তমানে অচল, কিন্তু মেবার দরবারে ভাট চারণের ধাপ্পাই দাম পাইয়া থাকে।

স্ত্রীলোক "ডোম্‌নী" বিবাহাদি উপলক্ষে, উৎসবে কিংবা শরাবের মজলিসে বাজনা বাজাইয়া গান গায়, আদিরস পরিবেশন করে। চারণ ও ভাটের "গীত" অভিজাত কুলের ভব্য সম্মেলনে রৌদ্র ও বীর রস পরিবেশনের জন্য রচিত হইয়া থাকে।

চারণ জাতি রাজস্থানের সমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চারণ ব্রাহ্মণত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করে না, চারণ উভয় বর্ণের মধ্যে ব্যবধান সংকীর্ণতর করিয়াছে, চারণ গুণ ও স্বভাবে ব্রাহ্মণ, কর্মে ক্ষত্রিয়, আচার-ব্যবহারে, অশনে-বসনে সর্বসংস্কারমুক্ত রাজপুত। ব্রাহ্মণের পুরোহিত নিজের ভাগিনা কিংবা দৌহিত্র, মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গুরু; কিন্তু রাজপুতের মত চারণের গুরু এবং পুরোহিতও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর, এবং ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণের দ্বারা করাইতে হয়। ব্রাহ্মণ এবং চারণ দুই জাতিই যাচক, দান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য এবং সকলের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। চারণ জীবিকার জন্য একমাত্র ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই "ত্যাগ" দাবি করতে পারে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের দান চারণ গ্রহণ করে না, যেহেতু চারণ ভিক্ষাজীবী নয়। রাজপুত ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়া থাকে উহাকে দান (charity) বলে; চারণকে বিবাহাদিতে যাহা দিতে হয় উহাকে ত্যাগ (surrender) বলে। চারণ যে 'লক্ষ-প্রসাদ' মহাদান পায় উহা (দেবতাকে নিবেদন), ভিক্ষা নহে। চারণ রাজপুতের মতই কুলাভিমানী, কিন্তু রাজপুতের কুলবৈর প্রবণতা ও জিঘাংসা চারণের নাই। চারণ রাজপুতের নিকট যাহা চায় উহা না দিলে রক্তপাত হয়; সেই রক্ত যাচকের, দাতার নয়; চারণ শাকাহারী না হইলেও অহিংসাবাদী; কিন্তু যজমানের জন্য যুদ্ধ করে, যজমানকে অন্যায় রক্তপাত হইতে উপদেশের দ্বারা নিবৃত্ত করাইতে না পারিলে নিজের বুকে নিজেই ছোরা বসাইতে দ্বিধা করে না। চারণ উত্তম ক্ষত্রিয়ের স্তাবক, কিন্তু নিন্দার দ্বারা অধম ক্ষত্রিয়ের শাস্তিদাতা। শত্রুর তরবারি মাথা কাটিতে পারে, নত করিতে পারে না; কিন্তু চারণের কণ্ঠা সরস্বতী মান হরণ করিয়া পুত্রপৌত্রাদির মাথাও কাটাইতে পারেন। এই ভয়ে দুর্দান্ত রাজপুত স্বেচ্ছায় চারণের হাতে চাবুক খাইয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। মারবাড়ের "মোটা রাজা" উদয়সিংহ রাঠোর একদা চারণ শাখার শরণাপন্ন হইয়া চারণের রোষবহ্নি শান্ত করিয়াছিলেন।

সম্রাট আকবর মারবাড় জয় করিয়া রাও মালদেবের সর্বাপেক্ষা অযোগ্য পুত্র উদয়সিংহকে যোধপুরের গদীতে বসাইয়াছিলেন এবং সেলিমের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, ইনিই সম্রাট শাহজাহানের মাতামহ, ইতিহাসে "মোটা রাজা" নামে প্রসিদ্ধ। মোগলের অধীনতা স্বীকার এবং মুসলমানকে কন্যাদান করিয়া রাজপুত নৃপতিগণের নৈতিক অবনতি ও ধর্মে উদাসীনতার প্রথম দৃষ্টান্ত এই "মোটা রাজা" উদয়সিংহ।

মারবাড়ে উদয়সিংহের পূর্বজগণ অনেক ভূমি নিষ্কর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। মোগল দরবারে ঠাট বজায় রাখিবার খরচ অনেক, যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষ শূন্য, সুতরাং উদয়সিংহ এই সমস্ত নিষ্করভূমি যাচকগণের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিয়া খাসদখল লইতে আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত যাচককে লোকে শ্রদ্ধা করিয়া "ষড়দর্শন"[৩] (রাজস্থানী খটদর্শন) বলিত; বুদ্ধিমানেরা বলিত "খটব্রণ" অর্থাৎ ছয় ব্রণ; যথা—ব্রাহ্মণ, চারণ, যতি (জৈন সাধু), মঠধারী হিন্দুসন্ন্যাসী, শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরসমূহের ক্ষত্রিয় সেবাইত এবং মুসলমান ফকির। রাজ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, চারণ জাতির নেতৃত্বে এই সমস্ত লোক সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়া কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী আউবা নামক গ্রামে এক শিবমন্দিরকে ঘিরিয়া ডেরা ফেলিল। ছয়দিন উপবাস করিয়াও আপোস মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সত্যাগ্রহীগণ আত্মঘাতী হইবার সঙ্কল্প করিল। রাঠোর গোপালদাস চম্পাবত প্রভৃতি সর্দারগণ উদয়সিংহকে বুঝাইতে গিয়া অপমানিত হইলেন। তিনি রাগিয়া বলিলেন, ধূর্ত তোমরাই উস্কানি দিয়া যাহা করাইয়াছ উহার ফলভোগ কর। তখন উদয়সিংহের গদী চম্পাবত বাঁদাবত কুলের বর্শাফলকে ধৃত রাঠোর রাজলক্ষ্মীর পাদপীঠ নহে; উহা মোগলের অনুগ্রহ-প্রসাদ, দিল্লীর মসনদের পাশবালিশ।[৪]

যাহা হোক, অবশেষে উদয়সিংহ ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া চারণদিগের ধর্ণা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বারহট অখৈরাজ চারণকে আদেশ করিলেন, ধর্ণার

৩। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৭৭, পাদটীকা
আউবার ধর্ণার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ, ২২৭৭-৮০।

৪। মোটা রাজার বংশধর মহারাজা অভয় সিংহের পুত্র রামসিংহ তাঁহার হিতৈষী চম্পাবত সর্দারকে বলিয়াছিলেন আপনার মুখখানা যত কম দেখা যায় ভাল। চম্পাবত সজোরে নিজের ঢাল মহারাজার সামনে ছুঁড়িয়া উল্টা করিয়া বলিলেন, যুবক, তুমি রাঠোরকে অপমান করিয়াছ, রাঠোর এই মারবাড়কে এমন করিয়াই উলট-পালট করিতে পারে।

গিয়া ঘোষণা করিবে যাহারা অন্যের প্ররোচনায় অপরাধ করিয়াছে তাহারা অপরাধীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলে নিজ নিজ ভূমি ফেরত পাইবে; তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখুক। অখৈরাজ এরূপ হীন দৌত্যে স্বজাতির নিকট যাইতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে মহারাজা তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দরাম ঢোলীকে পাঠাইলেন।

সেইদিন সত্যাগ্রহী শিবিরে মহা ধুমধাম। অম্বাদেবীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজন চলিয়াছে; অখৈরাজকে পাইয়া চারণকুল দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। ডেরা হইতে অখৈরাজ ও গোবিন্দরাম আর ফিরিল না। উদয়সিংহ রাগান্ধ হইয়া অখৈরাজের কাছে "কাটার" (তলোয়ার) পাঠাইয়া দিলেন। সত্যাগ্রহীগণ নিজ নিজ কাটার দেবীর সম্মুখে রাখিয়া যথাবিধি রণবাদ্যসহযোগে হোম ও অস্ত্রপূজা করিল, অস্ত্রে দেবীর আবাহন হইল। পূজার পরে ছয়দিনের উপবাসী সত্যাগ্রহীগণ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিল, পংক্তিতে একজন সদ্যবিবাহিত বর বসিয়াছিল। তাহার বাপ খেড়িয়া শাখার বুঢ়া নামক চারণ ভোজনপ্রিয় ছিল, উপবাস সহ্য করিতে না পারিয়া সে ধর্ণা হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। ঐ দিন তাহার পুত্র বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। পিতার ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া পুত্র নববধূকে ঘরে ফেলিয়া মরণযাত্রা করিল। পরিবেশনকারীগণের মধ্যে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, দুল্হার (বর) সামনে দুইখানা পাত দাও, বাপের জন্য একখানা বাড়ী লইয়া যাইবে। চারণের ক্রোধ আছে, প্রতিশোধ লওয়ার শক্তি আছে, কিন্তু চারণের পক্ষে বৈর নিষিদ্ধ। চারণ অস্ত্রের দ্বারা পরের উপর প্রতিশোধ লইতে পারে না, নিজের উপর চালাইতে পারে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঢোল দামামার রণবাদ্য বাজিল, নানাবিধ রাগসহযোগে দেবীর ছন্দোবদ্ধ স্তুতি পাঠ হইল। গোবিন্দ ঢুলীর উপর ভার দেওয়া হইল শিব-মন্দিরের ছাদে জাগিয়া থাকিয়া সূর্য আধাআধি উঠিলে সে সকলকে মরণ-সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবে। পরের দিন গোবিন্দের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ সত্যাগ্রহীগণকে মৃত্যুর আহ্বান জানাইল। যে বীভৎস দৃশ্য দেখিবার ভয়ে গোবিন্দ সর্বপ্রথম আত্মহত্যা করিয়াছিল উহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। উন্মত্তের মত হাজার হাজার চারণ নিজের অস্ত্রে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া মরিল। বুঢ়া চারণের বীরপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিল, কাটারের এই প্রথম চোট্ পিতার প্রায়শ্চিত্ত; দ্বিতীয় চোট্ জাতিঋণ হইতে আমার মুক্তি—এই বলিয়া দুইবার পেটে কাটার চালাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। প্রকৃত বীরত্বের পুরস্কার কাহার প্রাপ্য? ঢোলীর, চারণের, না রাজপুতের?

আউবায় সত্যাগ্রহের পর চারণ-হত্যার পাপস্পর্শের ভয়ে মাড়বাড়ের প্রজা কয়েক বৎসর উদয়সিংহের নাম মুখে আনে নাই, রাজার মুখ দেখিবার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছে, ভাট চারণ তাঁহার কুকীর্তি ইতিহাসে অক্ষয় করিয়া গিয়াছে। যোধপুর রাজ্যের চারণ লাখা কয়েক বৎসর পূর্বে দেশত্যাগ করিয়া মথুরায় ঘর-বাড়ী করিয়াছিলেন এবং জায়গীরদারের মত ঠাকুরালি ঠাটে থাকিতেন। তিনি শপথ করিয়াছিলেন উদয়সিংহের মুখ দেখিবেন না, যোধপুরেও পদার্পণ করিবেন না। উদয়সিংহ তীর্থযাত্রার জন্য মথুরা গিয়াছিলেন; আসল উদ্দেশ্য ছিল কোনপ্রকারে লাখার ক্রোধ শান্ত করিয়া দেশত্যাগী চারণগণকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা। মহারাজা উপযাচক হইয়া উপর্যুপরি তিনদিন লাখার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন, লাখা বাহিরে আসিলেন না। চতুর্থ দিন মহারাজা আবার উপস্থিত হইলেন। এইবার গৃহিণীর কড়া হিতোপদেশে দিশাহারা হইয়া বৃদ্ধ চারণ শপথ ভুলিয়া গেলেন। উদয়সিংহ চারণ, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদিকে ভূমি প্রত্যর্পণ করিলেন। লাখা চারণের বংশজ লাখাবত চারণ মারবাড়ে এখনও নিষ্করজমি ভোগ করিতেছে।

৪

মারবাড়বাসী ভাট ব্রজলাল "ঢোলী"[৫] আকবর বাদশাহের মজলিসে চারণের দাপট ও জাতের বড়াই সহ্য করিতে না পারিয়া চারণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কুল—কুলমণ্ডল[৬] নামক হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া দরবারে পেশ করিয়াছিল। ব্রজলালের বিদ্যা বেশী ছিল না, ব্যঙ্গ এবং নিন্দায় কিন্তু নিপুণ ছিল। ব্রজলালের গ্রন্থবিচারের সময় চারণগণের ডাক পড়িল। চারণেরা ভাটের নিন্দার জবাব দিতে পারিল না, মজলিসে চারণের মাথা হেঁট হইল। চারণ লাখা তাঁহার কুলগুরু জয়সলমীর রাজ্যের অন্তর্গত জাজিয়াঁ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত গঙ্গারামকে দরবারে আনাইয়া ভাটদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত গঙ্গারাম সম্রাট আকবরের নিকট প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ শিব-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া চারণ জাতির উৎপত্তি সিদ্ধ করিলেন; ভাট কোন জবাব দিতে পারিল না, তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইল।

৫। ঢোলী ভাট জাতির এক সম্প্রদায়, উহার অপর নাম জাজরা অর্থাৎ সাহসী-লড়িয়া, যুদ্ধের বাজনায় উহারা সম্ভবতঃ ঢোল বাজাইয়া যোদ্ধাদিগের বংশকীর্তি গান করিত।

৬। কুল, বরণ, চারণ একার্থবাচক শব্দ।

সম্রাট গঙ্গারামের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া উজ্জয়িনীর নিকট তাঁহাকে ৫২ হাজার বিঘা জায়গীর দিয়াছিলেন।[৭]

আউবা গ্রামের বারহঠ চারণ মহামহোপাধ্যায় মুরারিদানজি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চারণ জাতির তৎকালীন কুলগুরু শক্তিদানজীর (গঙ্গারামের বংশজ) নিকট প্রাপ্ত এক পরোয়ানার প্রতিলিপি পণ্ডিত গুলেরীকে দিয়াছিলেন। উহার গুলেরীকৃত সঠিক হিন্দী অনুবাদের মর্মার্থ[৮]:

লিখ্যতাম্ (লীখাবর্তা) শ্রীলখোজী তথা সমস্ত বিসেত্রা (১২০ গোত্রীয়) চারণ-বরণ প্রধান, জয় শ্রীজী মাতাজী[৯] বাচণপূর্বক…আগ্রা-সিংহাসনাসীন অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীআকবর সাহজীর হুজুরে দরীখানায় (দেওয়ান-ই-আম) ভাট চারণদিগের কুল সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিল (নিন্দক কীধে) সমস্ত রাজা মহারাজা ঐখানে উপস্থিত ছিলেন…উজ্জয়িনী পরগণায় বায়ান্ন হাজার বিঘা জমি পাতসাহজীর নিকট হইতে তাম্রপত্র লিখাইয়া গুরু গঙ্গারামজীকে দেওয়া হইয়াছে।..ইহা ব্যতীত গুরু এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীগণকে প্রত্যেক চারণ বিবাহ উপলক্ষে সাড়ে সতের টাকা (?) দান (ত্যাগ) দিবেক।..(চারণদিগের যাচক) মোতিসরকে যাহা দেওয়া হয় উহার দ্বিগুণ কুলগুরু গঙ্গারামজীর পুত্র-পৌত্রগণ পাইবেক…ইতি

৭। দ্রঃ গুলেরী গ্রন্থ (না প্র. সভা), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪-২৬২।

দরবারী ইতিহাসে নাম না থাকিলেও চারণ লাখা নিঃসন্দেহে আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। লাখা-র বংশ লাখানত চারণ এখনও মারবাড়ে বিভিন্ন জায়গায় বর্তমান। উহাদের প্রধান ঠিকানা মেড়তা পরগণার ঠহলা গ্রাম। চারণ লাখার নামে দুইখানা পাট্টা ঠহলা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে, তারিখ যথাক্রমে বিক্রম সম্বত ১৬৫৮ এবং ১৬৭২। উহার মধ্যে লাখার পুত্র নরহরদাস এবং গিরিধরের নাম আছে। একখানা পাট্টার দাতা উদয়সিংহের পুত্র দলপতসিংহ, দ্বিতীয় পাট্টার দাতা মহারাজ কুমার সুরসিংহ এবং গজসিংহ।

উজ্জয়িনীতে চারণদিগের কুলগুরু গঙ্গারামের বংশধর শক্তিদানজীর বাড়ীতে পরলোকগত পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী ঐতিহাসিক দলিল অনেক দেখিয়াছিলেন, এবং কয়েকখানির নকল লইয়াছিলেন (পৃঃ ২৫১ পাদটীকা)। পণ্ডিত গুলেরী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুন্শী দেবীপ্রসাদজীর নিকট হইতে লাখা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন উহা লিখিয়াছিলেন।

৮। পরোয়ানার চারি কোণে চারিটা গোল মোহরের মধ্যে লেখা আছে—(॥ শ্রী॥ শ্রীদীলীপত পাতসাহজী শ্রী ১০৮ শ্রীঅকবর সাহজী বংদে দবাগীর বারহঠ লখা)।

৯। এই মাতাজী চারণকুলে ভগবতীর অবতার শ্রীকরণীজী। চারণেরা ইঁহাকে বুআজী বলে। হিন্দু পরস্পরকে সর্বসাধারণ "রাম, রামজী" বলিয়া অভিবাদন করে। চারণেরা কিন্তু "জয় মাতাজী কী" বলিয়া থাকে। করণীজীর মন্দির রাজপুতানার একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান (দ্রঃ গুলেরী গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭, পাদটীকা)।

সম্বত ১৬৪০ (খৃঃ ১৫৮৫), পঞ্চোলী পান্নালাল কর্তৃক বারহটজীর (শাখার) হুকুমে আগ্রা শহরে সমস্ত পঞ্চায়েৎগণের সম্মুখে সম্মতিক্রমে লিখিত।

৫

চারণ জাতি যেমন যজমান ক্ষত্রিয়ের যাচক, এবং ক্ষত্রিয়ের দানের উপর তাহার ন্যায্য দাবি আছে, তেমন যজমান হিসাবে চারণের উপর নিম্নলিখিত সাত-কুলের[১০] ন্যায্য দাবি এবং বিবাহাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট পাওনা আছে যথা :

(১) কুলগুরু (আদিগুরু উজ্জয়িনীবাসী পণ্ডিত গঙ্গারামের বংশজগণ)। চারণ যেমন ক্ষত্রিয়ের "অযাচক" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির নিকট চারণের যাচনা নিষিদ্ধ, তেমন এই গুরুবংশ চারণ জাতির "অযাচক"। চারণ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট হইতে এই বংশের দানগ্রহণ নিষিদ্ধ।

(২) পুরোহিত—চারণদিগের প্রত্যেক শাখার বিভিন্ন পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত আছে। গুজর-গৌর, দাহিমা, ঔদীচ্য, সনাঢ্য, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম। চারণ জাতির পৌরোহিত্য করেন ; ধর্মকার্যে, জন্ম-বিবাহাদির দান পাইয়া থাকেন, যাহাকে "দাপা" বলে। পুরোহিতেরা চারণের উদক-ডহোলী" (জল এবং ঘৃতপক্কান্ন ?) খাইয়া থাকে।

(৩) মোতীসর—এই জাতি ঝালা, খিচী, পড়িহার ইত্যাদি রাজপুত বংশীয়। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ সংসার-ধর্ম এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চারণ জাতির কুল-দেবী আবরীর উপাসক হইয়াছিল। দেবী উহাদিগকে "মোতীসর" অর্থাৎ মুক্তালহরী নাম দিয়াছিলেন। উহাদিগের বংশধরগণ ক্ষত্রিয় জাতিবর্গকে পদত্যাগ করিয়া চারণ জাতির যাচক হইয়াছিল। দেবী মোতীসরকে বর দিয়াছিলেন, তোমাদের বংশধরগণ লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া কবিতা রচনা করিতে পারিবে, এবং যে হাকরা সমুদ্র-কে[১১] আমি শুকাইয়া ফেলিয়াছি ঐ সমুদ্র যে পর্যন্ত পিছে সরিয়া না আসে ততদিন তোমাদের বংশ অক্ষয় থাকিবে।

যেমন রাজপুতের স্তাবক চারণ জাতি, সেইরূপ চারণের স্তুতিপাঠক ও বংশাবলী-রক্ষক এই মোতীসর সম্প্রদায়।

১০। দ্রষ্টব্য—বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৮০-৮১।

১১। এই নামের সমুদ্র কোথায়? সিন্ধুর এক উপনদীর নিম্নাংশকে হাকরা বলা হইত। প্রাচীন মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

কোন চারণকে উচ্চ প্রশংসা করিয়া কিছু আদায় করিবার সম্ভাবনা থাকিলে মোতীসর তাঁহাকে বলে, "অবরী কা কেড়" অর্থাৎ অবরী-মাতার সন্তান।[১২]

(৪) "রাও"-ভাট—ইহারা ভাট জাতির চণ্ডীসা শাখার এক বংশ। রাও-ভাট সম্প্রদায় চারণ এবং রাঠোর রাজপুতের আশ্রিত যাচক, এবং এই দুই জাতি হইতে দাতব্য পাইয়া থাকে। যোধপুরের চারণদের মত রাও-ভাটের "শাসন" অর্থাৎ মৌরসী নিষ্কর গ্রাম (ধর্মোত্তর) আছে।

(৫) "রাবল"-ব্রাহ্মণ—নাগেই (নাগিনী?) শক্তিমাতার দৈবাদেশে ইহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ ত্যাগ করিয়া মদ্য, মাংস ভোজন আরম্ভ করিয়াছিল, এবং চারণ জাতির আশ্রিত যাচক রূপে জীবিকা নির্বাহ করিত।

(৬) বীরমপোতা ঢোলী—কোন কোন স্থানে ইহাদিগকে ধোলা বলা হয়। সাধারণ ঢোলী জাতের মধ্যে বীরমপোতা ঢোলী কিঞ্চিৎ কুলীন এবং মানে বড়।

(৭) ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মারবাড় রাজ্যের আউবা গ্রামে চারণ ও অন্যান্য যাচক সম্প্রদায়ের যে ধর্ণা হইয়াছিল উহাতে গোইন্দ ঢোলী (গোবিন্দ) প্রাণদান করিয়া সুরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজা উদয়সিংহ রাঠোরের এই নাগরা-বাদক। ঢোলী নিঃস্বার্থভাবে ধর্ণায় সামিল হইয়া ভাবের আবেগে সকলের আগে নিজের গলা নিজে কাটিয়াছিল। হিন্দুর ভীষ্মতর্পণের মত চারণ জাতির শ্রদ্ধার দান মধ্যযুগে গোবিন্দের বংশধরগণ পাইয়াছিল এবং অদ্যাবধি পাইতেছে। ইহা চারণ জাতির উদার অনুপম বীর-পূজা।[১৩]

৬

অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত চারণ জাতির ধর্ম পাঁচমিশালী চারণদিগের "পোষাকী" ধর্ম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; কিন্তু অধিকতর জনপ্রিয় আটপৌরে ধর্ম তান্ত্রিক শক্তি উপাসনা।[১৪]

চারণগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, চারণ জাতির আদি উপাস্য দেবতা "বিষ্ণু";

১২। দ্রঃ গুলেরী প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৪২।

১৩। পূর্বে দ্রষ্টব্য। যাচকগণের এই বিবরণ বংশ-ভাস্কর (দ্বিতীয় ভাগ ভূমিকা পৃঃ ৮০-৮১) হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

১৪। পণ্ডিত গুলেরীর মতে চারণেরা শাক্ত, ভগবতী ইহাদের কুলদেবী। দ্রঃ গুলেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ পাদটীকা।

কেহ কেহ বলেন, মহাভারতোক্ত ভীষ্মপর্ব, অধ্যায় (২৩) "শক্তি" (Divine Energy), যাঁহাকে বলা হইয়াছে—"তুষ্টিঃ, পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্ধিনী।" যাহা হোক্ চারণ বৈষ্ণব হইলেও নিরামিষাশী নহেন, যেহেতু প্রভাস তীর্থে যদুকুলের বনভোজনের সময় শ্রীকৃষ্ণ শাকাহারী অক্রুর প্রভৃতি বৃদ্ধগণের পংক্তিতে বসেন নাই; যে পংক্তিতে বসিয়াছিলেন ঐ পংক্তিতে "মরিচ ও লশুন সহযোগে ভর্জিত মহিষশিশু" পরিবেশন করা হইয়াছিল—প্রমাণ হরিবংশ। চারণদের মধ্যে সচরাচর কণ্ঠি-তিলকধারী দেখা যায় না। উহাদের প্রত্যেক শাখার উপাস্য মাতা আছেন। "মাতা"র সিন্দুররঞ্জিত প্রতীক্ এক ঝাঁপিতে প্রত্যেক বাড়ীতে রাখা হয়। গৃহদেবতা রূপে ইনিই প্রথম পূজা পাইয়া থাকেন।

মধ্যযুগে চারণ জাতির আচরিত ধর্ম প্রকৃতই তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি এবং "সূর্যচন্দ্র-বিবর্ধনকারী" ছিল। চারণ স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিল এবং স্তুতিদ্বারা ক্ষত্রিয় যজমানের তুষ্টি-পুষ্টি-দীপ্তি বর্ধন করিত। ধৃতি ও তেজ চারণের চরিত্রে বিলক্ষণ। চারণ ধৃতির দ্বারা রাজপুত সমাজের ধারক হইয়াছিল; সূর্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কীর্তি ও দীপ্তি চারণের গাথায় ভাস্বর হইয়াছিল। বর্তমানকালে বাঙ্গালী এবং সেকালে চারণের ঘরেই ভগবতীর আবির্ভাব ও অবতারের কথা শুনা যায়। নাগেচী মাতা এবং করণীজী মাতা চারণ ও রাজপুত উভয় জাতির বিশেষ পূজ্যা। সঙ্কটের সময় রাজপুত শক্তিমাতার পূজাকারিণীগণের কাছে ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য ধর্ণা দিতেন।

করণীজী সম্বত ১৪৪৪ (খৃঃ আনুমানিক ১৩৮৭) মারবাড়ের থাপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত দেস্‌ণোক[১৫] গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সিদ্ধিলাভের পর করণীজীমাতার অলৌকিক শক্তির খ্যাতি বিকানীর ও জয়সলমীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বীদাবত রাঠোর এবং পূগলের (বর্তমান বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত) ভট্টি বংশের বৈর চরমে উঠিয়াছিল। যখন এই বিবাদে রাঠোর ও ভট্টি নির্মূল হইবার উপক্রম, তখন সুযোগ বুঝিয়া মরুভূমির অপর পার হইতে সিন্ধুদেশের মুসলমানগণ পশ্চিম রাজপুতানায় হানা দিতেছিল। করণীজী-মাতা বিবদমান রাঠোর এবং ভট্টিকুলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজপুতকুলকে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।[১৬]

১৫। দেস্‌ণোক্ বিকানীর ষ্টেশনের আগের ষ্টেশন।

১৬। দ্রষ্টব্য, বংশভাস্কর ভাগ ২, ভূমিকা পৃঃ ৬৫।

বিকানীরের রাও জৈতসী দেসণোক্ গ্রামে, যেখানে মাতা করণীজীর দেহরক্ষা হইয়াছিল, ঐখানে করণীজীর সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির এখনও বিদ্যমান। অভিষেকের পর বিকানীরের প্রত্যেক রাজা মাতাজীর সমাধির উপর সোনার ছাতা উৎসর্গ করিয়া থাকেন[১৭]। দেসণোকের মন্দিরে চুহার (ইঁদুরের) রাজত্ব, চারণেরা সেবাইত এবং ইঁদুরের পাহারাদার। সমস্ত নাটমন্দির, "জগমোহন" [ভিতরের গর্ভগৃহ], এমন কি প্রতিমা পর্যন্ত ইঁদুরে সর্বদা ঢাকা থাকে। দর্শনার্থীগণের পায়ে, গলায়, মাথায় উঠিয়া ইঁদুর খেলা করে। ইঁদুরের জন্য প্রত্যহ বাজরা শস্যের রসদ বরাদ্দ আছে। ইঁদুরকে মারা দূরের কথা, তাড়াইলেও মহাপাপ হয়। যদি কাহারও অনবধানতার জন্য ইঁদুর মারা যায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে মন্দিরে সোনার ইঁদুর চড়াইয়া দেবীর ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হয়। মূষিক জাতির আহারনিদ্রা, মলত্যাগ, বংশবৃদ্ধি ও ক্রীড়াকৌতুকাদি সর্বকার্যই মন্দিরের ভিতর। স্তূপাকৃতি ইঁদুর-লাদির গন্ধে নাকে কাপড় দেওয়াও নিষিদ্ধ। ইঁদুরের লোভে বিড়াল মন্দিরে হানা দেয়; কিন্তু সজাগ দশ-বারোজন চারণ প্রহরীর মোটা লাঠির ভয়ে পলাইয়া যায়, কিংবা আঘাতে মারা পড়ে। মন্দিরের মূষিক অক্ষৌহিণীকে আদর করিয়া বলা হয় "করণীজী-রা কাবা"[১৮]। অর্থাৎ করণীজীর লুঠেরা; সুতরাং ভক্তকে মূষিকের দাবি মিটাইতে হইবে, উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে। বিকানীরের মূষিক মাতাজীর মন্দিরে তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু কোনটা ফিরিয়া যায় না।

যাহা হোক করণীমাতা মূষিককে মন্দিরে প্রতিপালন করিয়া ঐ দেশকে ছয় "ইতি"র মধ্যে এক "ইতি" (calamity) বা ব্যাপক উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শলভ বা পঙ্গপালের উপদ্রব বিকানীরে প্রায় প্রতি বৎসর হয়; কিন্তু ঐ দেশে মূষিকের ব্যাপক উপদ্রবে দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই।

৭

করণজীর "কাবা" (লুঠেরা) কেবল উহার আশ্রিত মূষিক নহে; সমগ্র চারণ জাতিই মাতাজীর কৃপাপাত্র "কাবা", যাহারা অহিংস উপায়ে রাজস্থানের ছোট বড়

১৭। দ্রষ্টব্য, বংশভাস্কর ভাগ ২, ভূমিকা পৃঃ ৮২।

১৮। দ্রষ্টব্য গুলেরী প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ পাদটীকা। যে সমস্ত আভীর প্রভৃতি দস্যুজাতি অর্জুনকে পরাজিত করিয়া যদুনারী হরণ করিয়াছিল। তাহাদের বংশধর বুক ফুলাইয়া লাঠির জোরে দ্বারকাযাত্রী আর্যসন্তানগণের নিকট হইতে এখনও দাম (Black mail) আদায় করে। ইহাদিগকে সম্মানার্থে কাবা (পূজ্য ডাকাত) বলা হয়।

রাজপুত মাত্রকে লুট করিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে। চারণ যাচকের উপদ্রব যজমানবাড়ীতে বিবাহের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং উপভোগ্যও বটে। কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কায়, চারণের জ্বালায় বোধ হয় সেকালে রাজপুত সমাজে গোপনে সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে বধ করার কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুত অতি গরীব হইলেও বিবাহের সময় দায়ে পড়িয়া চারণের কাছে তাহাকে দাতাকর্ণ হইতে হয়, না হইলে মান থাকে না। যজমানবাড়ীতে বিবাহে চারণ যেরকম উপদ্রব করে, চারণ বাড়ীর বিবাহে চারণের যাচক মোতীসর সম্প্রদায়ও অনুরূপ উপদ্রব করে; না করিলে বিবাহের আনন্দই অপূর্ণ থাকে। চারণ হাত জোড় করিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা কিংবা দান প্রার্থনা করে না, চোখ রাঙ্গাইয়া হট্টগোল করিয়া জঙ্গী মেজাজে তাহার নেগ দাবি করে। নেগের পরিমাণ চারণের মর্জির উপর নির্ভর করে। উহা লইয়া দুই পক্ষে বচসা হয়, কৃত্রিম ঝগড়া হয়; কিন্তু রাজপুত রাগ করিতে পারিবেন না, বলপ্রয়োগ না করিয়া তাঁহাকে হাসিতে হইবে। চারণের প্রধান অস্ত্র নিজের রক্তপাত ঘটাইবার ভয় প্রদর্শন; উহাতেই রাজপুত চারণ-কাবার কাছে কাবু হইয়া পড়ে। রাজবাড়ীতে এবং বড় বড় ঠিকানার ঠাকুরগণের বাড়ীতে তাঁহাদের দ্বারস্থ চারণ ব্যতীত রবাহূত চারণেরা আসিয়াও ভিড় জমায়। যজমানের উপর জুলুম করিবার অধিকার থাকে একমাত্র বারহঠ বা দ্বারস্থ চারণের। অন্যান্য চারণের জুলুম হইতে যজমানকে বাঁচাইবার দায়িত্ব বারহঠ চারণের; তবে সকলকেই কিছু কিছু দেওয়াইতে হয়, নতুবা যজমান ও দ্বারস্থ চারণের নিন্দা রটিয়া যায়।

রাজপুতানার চারণ বাঁকুড়া জেলার ব্রাহ্মণ নয়, যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—বিচারের বেলায় সকলের পিছে, বিদায়ের বেলা সকলের আগে। দ্বারস্থ বারহঠ চারণ বিবাহে "নেগ্" আদায় করিবার সময় যেমন সকলের অগ্রণী, যুদ্ধের সময় দুর্গতোরণ খুলিয়া শত্রুর প্রথম আঘাত বুক পাতিয়া লইয়া প্রাণ দিতেও তেমনই পুরোগামী। চারণ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নয়, যুদ্ধে চারণ অবধ্য; কিন্তু চারণ সর্বদা যুদ্ধে তাহার যজমানের পার্শ্বেই থাকে, যজমানের শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে।

চারণদিগের মধ্যে বারহঠ চারণের সম্মান অধিক, দায়িত্বও গুরুতর। বাংলাদেশের রাজা ও জমিদারগণের যেমন সেকালে দ্বারস্থ পুরোহিত ও পণ্ডিত থাকিত সেইরূপ রাজপুতানায় রাজা ও ঠাকুরদের দ্বারস্থ পুরোহিত ও চারণ এখনও আছে, কিন্তু পচিশ বৎসর পরে থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। পাণ্ডবকুলের পুরোহিত ধৌম্যের ন্যায় রাজপুতের পুরোহিত যজমানের সহিত মধ্যযুগে নির্বাসন ক্লেশ ভোগ

করিয়াছে, অধিকন্তু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে। ভিজল বারহঠ ও বারহঠ একার্থ-বাচক শব্দ, বারহঠকে পোতপালও বলা হয়। "পোত" সংস্কৃত প্রতোলী শব্দের অপভ্রংশ—যাহার অর্থ গোপুর [দুর্গের প্রধান ফটকের সংলগ্ন সুরক্ষিত বুরুজ (Tower)]। রাজপুত স্বগোত্র অপেক্ষা অন্যকে অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু জ্ঞাতির সমান যেমন মিত্র নাই, জ্ঞাতি অপেক্ষা বড় শত্রুও নাই [মহাভারত শান্তিপর্ব]। ক্ষত্রিয় রাজ্যলোভী, কিন্তু চারণ জাতির ঐ দোষ ছিল না, বিশ্বাস-ঘাতক চারণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এইজন্য চারণকে হয়ত কোনকালে গোপুর-রক্ষক বা পোতপাল নিযুক্ত করা হইত। যে রাজপুতের দুর্গ নাই তাহার বাড়ীর সদর দরজাই প্রতোলী বা পোত; ঐখানে দাঁড়াইয়া যে চারণের ত্যাগ দাবি করিবার অধিকার তাহাকেই যজমানের বারহঠ বা পোতপাল বলে। যেখানে দুর্গ আছে সেখানে ফাটকের উপরতলা বারহঠের সরকারী বাসস্থান; কেহ কেহ ফাটকের সামনে তাঁবু ফেলিয়াও মাতব্বরি করিত। কালক্রমে ফাটকে পাহারা দেওয়ার কাজ রাজপুত যোদ্ধাই করিত; তবুও চারণের পোতপাল নাম রহিয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিদ্রোহী ঠাকুরকে দমন করিবার জন্য যোধপুরের মহারাজ সিপাহী ও তোপখানা পাঠাইয়াছিলেন। তোপের মুখে দুর্গের ফাটক টিকিবে না দেখিয়া বিদ্রোহী সামন্ত বাহিরে সম্মুখ-যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তুমুল গোলাবর্ষণের মধ্যে ফাটক খুলিবে কে? পোতপাল চারণ অগ্রবর্তী হইয়া বলিল, এই ফাটকে দাঁড়াইয়া আমি বরপক্ষের নিকট হইতে "নেগ" আদায় করিয়াছি। আমি ছাড়া ফাটক কে খুলিবে? পোতপাল ফাটক খুলিয়া বাহির হইতেই গোলা লাগিয়া ধরাশায়ী হইল।[১৯]

৮

চারণ জাতির মধ্যে সোদা চারণ শিশোদিয়া কুলের, রোহড়িয়া চারণ রাঠোর কুলের, এবং সিরোহীর দেবড়া চৌহান বংশের বারহঠ দুরসাবত শাখার চারণই হইয়া থাকে। বারহঠ নির্বাচনের সহিত এই সমস্ত কুলের ইতিহাস জড়িত আছে। মিবাড়ের ইতিহাসে সোদা বারহঠ সাহস আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে অতুলনীয় ছিল। সোদা বারহঠ না হইলে শিশোদিয়া বংশ আলাউদ্দীনের চিতোর অধিকারের পর

১৯। দ্রষ্টব্য অজমেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৬ পাদটীকা।

চিতোর পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন না, মিবাড়ের ইতিহাস হইতে হয়ত শিশোদিয়া চিরবিদায় লইতেন।

মহারাণা হম্মীর চিতোর উদ্ধারের জন্ত বারবার চেষ্টা করিয়াও যখন বিফল-মনোরথ হইলেন, সেনাবল ও অর্থ নিঃশেষ হইল তখন তিনি হতাবশিষ্ট অনুচরবর্গকে লইয়া পদব্রজে দ্বারকা যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কাঠিয়াবাড়ে গিরণার (প্রাচীন রৈবতক) দুর্গের নিকট দেথা গোত্রীয় চারণ বারুর নিবাস খোর গ্রামে তিনি রাত্রি যাপনের জন্ত বারুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বারুর মাতা বরুবড়ী ভগবতীর অবতার এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া ঐ সময়ে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি চারণী মাতাকে বলিলেন দ্বারকায় শরীর ত্যাগ করিবার জন্তই যাইতেছেন। চারণী মাতা তাঁহাকে শরীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তুমি চিতোরে ফিরিয়া যাও, চিতোর তোমার অধিকারে আসিবে। হম্মীর ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানাইলেন, তাঁহার কাছে একটা ঘোড়াও অবশিষ্ট নাই, যোদ্ধা নাই, যুদ্ধ-সামগ্রী নাই; এই অবস্থায় চিতোর রাজ্য উদ্ধার করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তিনি বলিলেন, আমার পুত্র বারু পাঁচ শত ঘোড়া তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দিবে। ইতিমধ্যে তুমি দেশে রাজপুত জমা কর, বিবাহের কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বিবাহ করিও, চিতোর রাজ্য পাইলে ঘোড়ার দাম দিতে পার, না হয় ঘোড়া আমি ভেট দিলাম জানিবে। হম্মীর মিবাড়ের কৈলবারা পরগণায় পৌঁছিবার পর বারু পাঁচ শত ঘোড়া লইয়া আসিল এবং তিনি জালোরের রাও মালদেব সোনগরা চৌহানের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্ত জালোরে চলিলেন। বিবাহের পর স্ত্রীর নিকট হইতে হম্মীর জানিতে পারিলেন স্ত্রী পূর্বেই বিধবা হইয়াছিল, তাঁহার পিতা ছল করিয়া এই বিবাহ দিয়াছেন। স্ত্রীর পরামর্শে হম্মীর শ্বশুরের বিশ্বস্ত অমাত্য মৌজীরামকে হাত করিলেন। একদিন শিকার খেলিবার ভান করিয়া তিনি জালোর হইতে দ্রুত চিতোরের দিকে চলিলেন এবং মৌজীরামকেও সঙ্গে লইলেন। ইহার পরে একদিন আধারাতে চিতোরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌজীরাম হাঁক দিল ফাটক খোল। মৌজীরামের গলার স্বর চিনিতে পারিয়া মানসিংহের দ্বাররক্ষী ফাটক খুলিয়া দিল, চিতোরের দুর্গপ্রাকারে আবার শিশোদিয়ার বিজয়পতাকা উড়িল।

চারণী মাতার উপকার স্মরণ করিয়া মহারাণা হম্মীর বারুকে শিশোদিয়া বংশের পোতপালরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সওদাগরী করিয়া চিতোর রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া বারুর গোত্রের নূতন নাম রাখিলেন সোদা। মহারাণা হম্মীর

খোদা বারহঠ বারুকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের উদক-আঘাট[২০] এবং লাখপসাব[২১] করিয়া আঁতরী গ্রাম দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি চারণী মাতা বর্‌বড়ীকে খোর গ্রাম হইতে চিতোরে আনাইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহার চিতার উপর মন্দির তৈয়ার করাইয়াছিলেন। বর্‌বড়ী মাতার আসল নাম ছিল অন্নপূর্ণা; এই জন্য এই মন্দির অন্নপূর্ণার মন্দির নামে চিতোরে অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ।

মহারাণা হম্মীরের পুত্র মহারাণা ক্ষেত্রসিংহ (খেতা) গৈণোলীর ভূস্বামী হাড়া চৌহান লালসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বুন্দী গিয়াছিলেন। বরযাত্রী দলের মধ্যে বৃদ্ধ বারহঠ বারুও ছিলেন। লালসিংহ বারুকে দান গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও বারু দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, বারু অপ্রতিগ্রহ ব্রত গ্রহণ করিয়া অযাচক হইয়াছিলেন; সুতরাং মিবাড়ের মহারাণা ব্যতীত অন্য ক্ষত্রিয়ের দান লইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয়। লালসিংহের জিদ চড়িয়া গেল। কোন পরামর্শ করিবার অছিলায় বারুকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিলেন, হয় আমার দান গ্রহণ কর, নতুবা অপমানিত হইবে। বারু ইহা শুনিয়া নিজের গলায় কাটার হানিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন (বিঃ ১৪৩৯=খৃঃ ১৩৮২)। কিছুদিন পরে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া বারুর বৈর প্রতিশোধের নিমিত্ত ক্ষেত্রসিংহ বুন্দী আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের আঘাতে জামাতা ও শ্বশুর দুইজনেই একত্র স্বর্গবাসী হইলেন।°

২০। যে সমস্ত জমি চারণকে পুরুষানুক্রমিক শর্তে দেওয়া হয় উহাকে উদক-আঘাট বা সংক্ষেপে উদক্ বলে।

যজমান দানের সময় কুশ ও জল হাতে লইয়া বলিবেন—তুভ্যমহম্ সংপ্রদদে ইদং ন মম। তাম্রপত্রে উদক্ শব্দের সহিত আঘাট শব্দ (আঘাট সীমায়াম্) লেখা থাকে। তাম্রপত্রের নিম্নাংশে গরুড় পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিত হয়—

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে হরন্তি বসুন্ধরাম্।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

উদক্-দত্তভূমির সীমার মধ্যে যদি কাহারও চাকরান্ জমি কিংবা জায়গীর থাকে উহার উপর গ্রহীতার পূর্ণ অধিকার হয়, উদক্ আঘাট বাসী সমস্ত প্রজা গ্রহীতার শাসনাধীন হয়। এই জন্য এই ভূমিকে শাসনও বলে। (দ্রষ্টব্য বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৭৩-৭৪)

২১। লাখ পসাব (Lakh Pasaw) শব্দ সংস্কৃত লক্ষ-প্রসাদ শব্দের অপভ্রংশ। লক্ষ-প্রসাদে এক লক্ষ মুদ্রা বা বস্তু বুঝায় না; লক্ষ বহু অর্থবাচক। ইহা একটি মহাদান, ইহাতে হাতী ঘোড়া তৈজস পত্রাদি ব্যতীত একটি গ্রাম নিশ্চয়ই হওয়া চাই। অতি প্রসিদ্ধ চারণ কবিগণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই দান দেওয়া হইত।

একদিন মহারাণা করণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহ অশ্বারোহণে সাহচর উদয়পুরের কিসনপোল দরওয়াজার বাহিরে খরগোস শিকার করিতে চলিয়াছেন। শহরের ফাটক অতিক্রম করিবার পর একজন অশ্বারোহী রাজপুত অলক্ষ্যে কুমারের অনুসরণ করিতেছিল। সুযোগ পাইয়া ঐ রাজপুত কুমারের সম্মুখীন হইয়া হুঙ্কার ছাড়িল—এই লও আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পরিশোধ! এমন সময় নিমেষ মধ্যে আততায়ী রাজপুতের ছিন্ন বাহু অসিসহ ভূপতিত হইল, কুমার রক্ষা পাইলেন। কুমার তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীর মুখ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হাঙ্গামার পর তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না।

মহারাণা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হুকুম দিলেন রাজধানীতে উপস্থিত সমস্ত জায়গীরদারগণ নিজ নিজ ফৌজ লইয়া মহলের চত্বরের মুজরার (Review) জন্য হাজির হউক।

বাটরড়া ঠিকানার জায়গীরদার ভোপতরাম (মহারাণা প্রতাপের পুত্র সহসমলের পুত্র) যখন জমায়েত (Contingent) হইয়া চত্বরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কুমার এক অশ্বারোহীকে সনাক্ত করিয়া বলিলেন, এই অশ্বারোহী হত্যাকারীর হাত কাটিয়াছিল। এই অশ্বারোহী দধ্‌বাড়িয়া শাখার চারণ ক্ষেমরাজ। ক্ষেমরাজ সন্দেহবশতঃ যে রাজপুতকে অনুসরণ করিয়াছিল সে কচ্ছবাহ কুলের নরুকা শাখার রাজপুত। কুমার জগৎসিংহ তাহার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন এবং ভ্রাতার রক্তের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য সে উদয়পুরে আসিয়াছিল।

মহারাণা করণ চারণ ক্ষেমরাজকে বলিলেন, আজ হইতে তুমি আমার চতুর্থ পুত্র। রাজ্যারোহণের পর জগৎসিংহ "ভাই ক্ষেমরাজ"-কে সত্তর হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দিয়াছিলেন, ক্ষেমরাজের কন্যার বিবাহে সমস্ত অন্তঃপুরসহ ক্ষেমরাজের বাড়ীতে ১৫ দিন আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহ ক্ষেমকরণকে "কাকো" (কাকা) ডাকিতেন।

জগৎসিংহের তাম্রশাসন বর্তমানে ক্ষেমপুরের ঠাকুর চিমনসিংহ দধ্‌বাড়িয়ার (ক্ষেমরাজের বংশধর) কাছেই আছে।

আওরঙ্গজেবের বাহিনী উদয়পুর পৌঁছিবার পূর্বে মহারাণা রাজসিংহ আরাবলী পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়াছিলেন। সোদা বারহঠ নরু রাজধানীতে থাকিয়া মহারাণাকে শত্রুর গতিবিধির সংবাদ দিতেন এবং রসদ

ইত্যাদি পাঠাইতেন। মহারাণা কোথায় আছেন উহা নরু ব্যতীত আর কেহ জানিত না। একদিন নরু ঘোড়ায় চড়িয়া মহারাণার কাছে চলিয়াছেন এমন সময় "বড়ীপোল" অর্থাৎ প্রধান তোরণের কাছে এক ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া বলিল, বারহঠজী, তুমিই ত এই দরজায় বড় ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া "নেগ" আদায় করিতে! এখন এই দরজা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছ? এই কথা শুনিবামাত্র নরু ঘোড়া হইতে নামিয়া গেলেন এবং নিজের পরিবার-কুটুম্ব সকলকে মহারাণীর নিকট পাঠাইয়া দিয়া ঐখানেই বসিয়া গেলেন। এক্কাতাজ খাঁ এবং রুহল্লা খাঁ যখন মন্দির মূর্তি ইত্যাদি ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়া পড়িল তখন বারহঠ নরু বিশ-পঁচিশজন অনুচর লইয়া জগদীশের মন্দিরের সম্মুখে বহু শত্রু বধ করিয়া সানুচর বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরুর প্রশংসাসূচক এক গীত এখনও লোকের মুখে শোনা যায়। ইহার মর্মার্থ—প্রতোলী-পাল বরণের অনুষ্ঠানে মহারাণা যে হরিদ্রা-রঞ্জিত অক্ষতের দ্বারা (আতপ চাউল) নরুর পাদ-পূজা করিয়াছিলেন উহার হরিদ্রাভা উজ্জলতর করিয়া (আখা পীলা করে উজলা) সোদা চারণ নেগের ঋণশোধ স্বরূপ কলম-কে (কলমা-পাঠক মুসলমান) খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। সোদা (নরু) উদয়পুরের আজরাইল (যমরাজ), তিনি ম্লেচ্ছতার লাঘব করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

রাজপুত-বৈর

নাহং রক্ষ ন ভূতং রিপুরুধিরজল-প্লাবিতাঙ্গঃ প্রকাশম্।
নিস্তীর্ণোরুপ্রতিজ্ঞাত-জলনিধিগহনঃ ক্রোধেন ক্ষত্রিয়োঽস্মি ॥

বেণীসংহারম্

১

কুল, স্বভাব এবং ইতিহাস গৌরবে রাজপুত আদর্শ আর্য ক্ষত্রিয়, মহাভারতে বর্ণিক ক্ষাত্রধর্মের ধারক ও বাহক। কুরুক্ষেত্রের বৈর-বহ্নি আজিও রাজস্থানের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। রাজস্থানের ইতিহাস যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণবর্জিত মধ্যযুগের "মহাভারত"। এই মহাভারতে কুলাভিমানী বৈর-পরায়ণ রাজপুতের আদর্শ রুদ্রকর্মা বৈরে ক্ষমাহীন ভীমসেন; এবং ত্যাগে ও শৌর্যে অপরাজেয় ধূমায়মান বৈশ্বানর ভীষ্ম পিতামহ। ক্ষমাশীল "ক্ষত্র-ব্রহ্ম" ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কিংবা অনাসক্ত পরমপুরুষ পার্থ-সারথীর স্থান রাজপুত মহাভারতে ছিল না এবং হইতেও পারে না; যেহেতু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহারা আদর্শ (typical) ক্ষত্রিয় নহেন। কৌরব দাবাগ্নির ধূমশিখা পাঞ্চালী কৃষ্ণা যিনি স্বয়ংবর সভাকে সন্ত্রস্ত করিয়া কর্ণকে মুখের উপর বলিয়াছিলেন, আমি সূত-পুত্রকে বরমাল্য দিব না;" যিনি বৈরনির্জিত যুধিষ্ঠিরের অহিংস নীতিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "শমেন সিদ্ধির্মুনয়োঃ ন রাজ্ঞঃ" (কিরাতার্জুনীয়ম্); সেই মূর্তিমতী ক্ষাত্র-গরিমা মানিনী দ্রৌপদী এবং রণরঙ্গিনী বীরমাতা যাদবী সুভদ্রাই রাজপুত-নারীর আদর্শ। রাজপুত-মাতা ত্যাগ ও ধৈর্যে পাণ্ডব-জননী কুন্তী; শোকে যাঁহার অশ্রু নাই, আনন্দে অধীরতা নাই, কর্তব্য নির্ণয়ে মাতার দুর্বলতা নাই। দ্রৌপদীর মুক্ত বেণী দেখিয়া বিস্মিতা ও পরিহাসপরায়ণা কৌরব-বধূগণকে পাঞ্চালীর দাসী শুনাইয়াছিল, "কৌরব বধূগণ মুক্তকুন্তলা না হইলে পাণ্ডুবধূ কেমন করিয়া কবরী বন্ধন করিতে পারেন? এইরূপ শঙ্কাবিহীনা মুখরা দাসীই সেকালে রাজপুতানীর মানরক্ষা করিত। বৈরপরায়ণ রাজপুত যোদ্ধার উল্লাস মধ্যম পাণ্ডবের বীভৎস আত্মপ্রসাদেরই প্রতিধ্বনি; যে প্রতিধ্বনি আরাবল্লীর পর্বতকন্দরে, মারবাড়ের মরুপ্রান্তরে চারণের গীতে মধ্যযুগের চৌহান রাঠোর যদুবংশী ভাট্টি বিশেষ ভাবে শুনিতে পাইত। বৈরে নিহত রাজপুতের অতৃপ্ত আত্মা হন্তার উদরে শৃঙ্খলিত হইয়া ছটফট করিত এবং হন্তাকে বধ করিয়া মুক্তি দেওয়ার জন্য ভাই, বন্ধু ও সগোত্রের কাছে অশরীরী বাণী প্রেরণ করিত।

বৈর-প্রবণ রাজপুত ইহা বিশ্বাস করিত। রাজপুতের জীবন-দর্শন গীতার অধ্যাত্মবাদ নহে; "ততো যুদ্ধায় যুধ্যস্ব" ব্যতীত রাজপুত আর কিছুই ভাবে নাই।

পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রাজপুত পিতা পুত্র কামনা করে না। অনির্জিত বৈরই রাজপুতের সাক্ষাৎ নরক, রৌরবাদি নরকের ভয় রাজপুতের নাই। স্বকীয় এবং পিতৃ-পিতামহ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈরের ঋণ উপযুক্ত পুত্রই শোধ করিবে, এই আশায় রাজপুত বহু পুত্র কামনা করিত। যে রাজপুত পিতা ভ্রাতা ও জ্ঞাতির রক্তপাত ও মাতার অবমাননার প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইল না সে রাজপুত নহে; সে কুপুত, কুলাঙ্গার কাপুরুষ; সমাজ তাহায় নামে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিত। রাজপুতের সর্বাপেক্ষা কঠোর ঋণ ছিল অন্ন-ঋণ। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য "অন্নদাতা"র (রাজা অথবা বেতনদাতা প্রভু) নিকট হইতে যে "ভূতি" (ভূমি কিংবা মুদ্রা) রাজপুত যোদ্ধা গ্রহণ করিত উহাই তাহার অন্ন-ঋণ। অবিচারে প্রভুর আজ্ঞা পালন এবং প্রভুর কার্যে মৃত্যুবরণেই এই ঋণের পরিশোধ; ইহাই "মরণেকা ঋণ"। এই অন্ন-ঋণের দায় মহাভারতের যুগ হইতে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ নির্বিশেষ রাজসেবকগণ নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে। দুর্যোধনের দরবারে ভীষ্ম-দ্রোণাচার্যের ন্যায় রাজপুত চিরকাল আদর্শ ভূতিভুক যোদ্ধা; হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অন্নদাতাকে রাজপুত সমান বিশ্বস্ততার সহিত সেবা করিয়া আসিয়াছে। স্বাধীন ভারতে অন্নদাতা নাই, প্রভু-ভৃত্য নাই, নিমকহালালী কিংবা হারামী নাই। যেহেতু এখন সকলেই প্রভু; কেহ কাহারও অন্ন খায় না, কেবল চুক্তির (contract) শর্ত পালনের দায় আছে। শর্ত পালন না করিলে কিংবা কাজে ফাঁকি দিলে এখন কেহ নরকে যায় না, জেলখানায় গেলেও দশজনের খরচে শ্বশুরবাড়ীর আরামে থাকে!

২

রাজপুতানায় প্রচলিত বৈর শব্দের দ্বারা সকল প্রকার "শত্রুতা" বুঝায় না। ইহার মুখ্য অর্থ পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা (Vendatta), এবং উক্ত শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়ার ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত অধিকার বুঝাইয়া থাকে। এই প্রকার "বৈর" শুধু রাজপুতের মধ্যে কিংবা ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। "কুল" (Clan বা tribe) কুলতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র এবং জ্ঞাতি-বৈর লইয়াই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। অপমান ক্ষয়-

ব্যক্তির সরাসরি প্রতিশোধ লওয়ার অধিকার মানবসমাজে আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কেহ অস্বীকার করিতে পারে নাই। সভ্যতার প্রারম্ভে হজরত মুসা (Prophet Moses) সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করিয়া হিংসা ও প্রতিহিংসার সংঘাতে উৎপন্ন লোকক্ষয়কর বৈরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। মুসার আইন, অর্থাৎ কানের বদলে কান, প্রাণের বদলে প্রাণ, ইত্যাদি প্রায় সকলেরই জানা আছে। যাহার কান কাটা গিয়াছে সে তাহার শত্রুর কান না কাটিয়া চোখ নষ্ট করিলে মুসার আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইত। মুসলমান আইনে ইহাই কিসাস অর্থাৎ অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যক্তির বৈধ অধিকার হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক যুগে অপরাধীর দণ্ড বিধানের অধিকার রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইয়াছে। বৈরের মূলনীতি "সমং সমেন শাম্যতি"। ইহাই Reprisal (প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা) রূপে সভ্যজাতির আন্তর্জাতিক আইনে (International Law) বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মুসার আইন অপেক্ষা কম নৃশংস নহে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে "প্রতিশোধ" দোষী নির্দোষ নির্বিচারে অপরাধী রাষ্ট্রের অসহায় নাগরিকের উপর গ্রহণ করা হয়, উহারা কারাদণ্ড ভোগ করে, সম্পত্তিচ্যুত হয়।

৩

রাজপুত সমাজ এবং রাষ্ট্র বৈর সাধনে ব্যক্তির উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করে নাই। ধর্মতঃ একটি বাধা ছিল, গোত্রহত্যা বা [illegible]বধ; কার্যতঃ কিন্তু রাজপুত ইহাও মানিত না। এক পরিবারের মধ্যে কিংবা এক গোত্রের মধ্যে বিবাদ "বৈর" নহে। এরূপ বিবাদ কুলপতি (Patriarch) এবং জাতিমুখ্যগণ মীমাংসা করিতেন। রাজপুত-বৈর তিন প্রকার, কুল বা গোত্র-বৈর, ভূমি-বৈর এবং মান-বৈর। গৃহদাহক, সতীত্ব-নাশক, ব্যভিচারী, বিষদাতা, ভূমি-দারা-ধন অপহারক এবং কুলত্যাজ্য (outlaw) ব্যক্তির "বৈরে" অধিকার নাই। এবংবিধ দুষ্কার্যে ধৃত, নির্জিত কিংবা নিহত ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ তাহার নিজ পরিজন কিংবা যে কুলে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই কুলের দায়িত্ব নহে। শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিহত রাজপুত সরাসরি স্বর্গে যায়। তাঁহার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণ নাই, বৈর-গ্রহণে রক্ত-তর্পণ আছে। দুই বিভিন্ন কুলের (যথা রাঠোর ও চৌহান) মধ্যে যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের বৈর পুরুষানুক্রমে চলিতে থাকে। জ্ঞাতি-বন্ধুর অবমাননা ব্যক্তিগত নয়, উহা সামগ্রিক। এই প্রকার "বৈর"ই (যথা কোন কুল হইতে

প্রেরিত "নারিকেল" অর্থাৎ কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান) মান-বৈর। এক পক্ষ কন্যা-প্রার্থী হইলে অপর পক্ষ যদি কন্যাদানে অসম্মত হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে "বৈর" উৎপন্ন হয়। রাঠোর রাজপরিবারে বাগদত্তা শিশোদিয়া কুমারীকে বরের মৃত্যুর পর কচ্ছবাহ রাজ প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন এবং উদয়পুরের মহারাণা ভীমসিংহ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এই অপরাধে রাঠোরগণ শিশোদিয়া এবং কচ্ছবাহ উভয় কুলের সহিত বৈর ঘোষণা করিয়াছিল।

রাজপুতের মান বড় ভয়ানক বস্তু। আত্মসম্মান সম্বন্ধে কৃষক হইতে ভূম্যা "ঠাকুর" পর্যন্ত সকলেই সমান স্পর্শকাতর। এই বিষয়ে রাজপুতের জুড়ি আফগানিস্থানের উপজাতি এবং উহাদের বংশধর রোহিলখণ্ডের পাঠান। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাও অমর সিংহ রাঠোরকে মীর বক্‌শী সলাবত খাঁ দরবারের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য তিরস্কার করিয়া "গোঁয়ার" বলিতে না বলিতেই সম্রাট শাহজাহানের সম্মুখে অমর সিংহের তরবারি মীর বক্‌শীর দেহ কাঁধ হইতে কোমর পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করিয়া বাহির হইয়াছিল, সম্রাট অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। "মান-বৈরে" যত রাজপুতের প্রাণ ও সম্পত্তি রাজপুতানায় নষ্ট হইয়াছে উহা রক্ষা পাইলে জাতির মান বাঁচিত, অন্ততঃ রাজস্থান মারাঠা ও পাঠান দস্যু আমীর খাঁর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইত।

রাজপুতের "ভূম্" যদি দুই বিঘা পৈত্রিক জমিও হয়, সে উহার মধ্যেই রাজা এবং তাহার মাটির ঘর কিংবা আকন্দপাতার ঝোপড়া তাহার "রাওলা" (ভদ্রাসন)। রাজা ভূমি দান করিতে পারেন, কিন্তু মৌরসী ভূম্ হস্তান্তর করিতে পারেন না। রাজপুতের "মাটির ক্ষুধা" (Land hunger) ভূমি-বৈরের প্রধান কারণ। ভূমিচ্যুত হইলে রাজপুত ডাকাতি করিবে, তবুও রাজপুত ভূমি-অপহারকের চাকরি করিয়া আত্মাকে অপমানিত করিবে না।

৪

মানুষের সহজাত হিংসাবৃত্তিকে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য সমাজ সেকালে প্রতিহিংসামূলক বৈরকে নিষিদ্ধ না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রতিহিংসার ভয় না থাকিলে মানুষ কোনকালেই হিংসা হইতে বিরত হইবার নয়। প্রেম প্রীতি দ্বারা হিংসাকে জয় করাই প্রকৃত প্রতিহিংসা। এই বাণী ভারতীয় দর্শন প্রাচীনকাল হইতে প্রচার করিলেও লোকে উহা কার্যতঃ গ্রহণ

করে নাই। এইজন্য সমাজ ও সভ্যতা হিংসা-প্রতিহিংসার সংঘাতে একবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আবার মাথা তুলিয়াছে, আবার ভাঙিয়াছে—যেহেতু আগুন আগুনের দ্বারা নিবাইবার চেষ্টা আপদ্ধর্ম মাত্র, এক জায়গায় নিবিলে অন্যত্র দ্বিগুণ তেজে জলিয়া উঠিবার আশঙ্কাই বেশী। বৈদিক যুগ হইতে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত বৈরতাক্রান্ত ছিল। আর্য ও অনার্যের বৈর, বিভিন্ন আর্য গোত্রের মধ্যে বৈর, সর্বত্যাগী ঋষি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কুলপতিগণের মধ্যে বৈর লইয়াই বৈদিক যুগের ইতিহাস। পৌরাণিক যুগে দেবতাগণের "বৈর" উহাদের উপাস্ত সম্প্রদায়গণের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষকে "ধর্ম-বৈর" এবং "কুল-বৈর" হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই। মহাযানী বৌদ্ধ ভাস্কর্য বৈদিক দেবতাগণকে নির্জিত করিয়াছে : পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে প্রায় নির্মূল করিয়া উহার তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিয়াছে। প্রত্যেক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সুপ্ত "কুল-বৈর" ও "ভূমি বৈর" সক্রিয় হইয়া সামন্ত-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অখণ্ড রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। "বলং বলং ব্রহ্ম বলং" সত্য-ত্রেতায় থাকিলেও দ্বাপর-কলিতে "বলং বল্য ক্ষাত্রবলং" বাণী ক্ষত্রিয়েতর বর্ণকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। ক্ষত্রিয় জাতি বৈরাগ্নিতে বার বার পুড়িয়াছে, ব্রহ্মবলের প্রভাবে বার বার নবকলেবর ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্মবলকে উপেক্ষা করিয়া, দেশ ও ধর্মরক্ষার কর্তব্য ভুলিয়া আবার বৈর-ব্যামোহ-গ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বাহিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ বৈর-ব্যাধিমুক্ত ছিল না। ইতিহাসে দেখা যায় "বৈর" তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে লইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষের মত ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয় নাই। পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভূমি-বৈর এবং "বর্বর" জাতির (অ-গ্রীক সুসভ্য ইরাণীয় প্রভৃতি) প্রতি প্রবল ঘৃণা ও "জাতি-বৈর" গ্রীক জাতিকে পূর্বে বিতস্তা (Bias) নদী, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমির প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। হানিবলের ইটালী আক্রমণের ফলে ঐ দেশের সংকীর্ণ "কুল-বৈর" 'কার্থেজীয়গণের বিরুদ্ধে রাজনীতি-বিচক্ষণ রোম সাধারণতন্ত্র জাতিবৈরের (national) খাতে প্রবাহিত করিয়া প্রথম বিশ্বসাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল; দ্বিতীয় ফিলিপের ইংলণ্ড আক্রমণ ইংরেজ জাতির সাম্প্রদায়িক ধর্ম-বৈরকে দেশপ্রেমে পরিণত করিয়া রোম অপেক্ষাও মহান্ সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিল; জার্মান জাতি বিজয়ী প্রথম নেপোলিয়নের অশ্ব-খুরে মর্দিত হইয়া তাহাদের মজ্জাগত কুল-বৈর ও প্রাদেশ-বৈর ভুলিয়াছিল এবং নিজানের

রণক্ষেত্রে ফরাসী-বৈরের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল ; ইসলাম আরব জাতির কুল-বৈরকে ধর্মের রথচক্রে জুড়িয়া অর্ধেক পৃথিবী জয় করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে কুল-বৈরের আগুনে ক্ষত্রিয় জাতি পুড়িয়াছে, প্রচণ্ড ক্ষাত্রশক্তিকে সংহত করিয়া কোন সৃষ্টিমূলক কার্যে নিয়োজিত করা হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ ক্ষত্রিয়-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য প্রথমে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নাকি একুশবার ভারতবর্ষ নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন ; কুঠার ছাড়া বড কিছু তিনি খুঁজিয়া পান নাই। ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাসে ক্ষত্রিয়জাতি সমূল ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন, একতাবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেব ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বীতস্পৃহ হইয়া "পঞ্চশীল" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সম্রাট অশোক "ধর্মবিজয়" ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাঘ তখনও "শাকাহারী" হয় নাই ; সুতরাং কোনটাই ক্ষত্রিয়ের মনঃপূত হইল না। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে হিংসাজীবী ক্ষত্রিয় ও ক্ষাত্রধর্মের স্থান হইতে পারে না। ভবিষ্য পুরাণ মতে কল্কি অবতারে উত্তর প্রদেশে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান স্বয়ং ম্লেচ্ছনিবহ নিধন করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের অশ্ব, অসি ও রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইহাই বোধ হয় রাজপুত-বৈরের শোকাবহ পরিণতির শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পূর্বাভাস ; কিন্তু এই ম্লেচ্ছ কাহারা ?

রাজস্থানের সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় হিসাবে রাজপুত-বৈর এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। সমাজের পটভূমি ব্যতীত বৈর-বর্ণনা সম্ভব নহে। এইজন্য আমরা রাজপুতানার খ্যাত হইতে কয়েকটি সমাজচিত্র সম্বলিত বৈরের উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

৫

যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধার উত্তরাধিকারী রাও সুজা (রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৮৮–১৫০৮ খৃঃ) তাঁহার পুত্র নরাকে জয়সলমীর সীমান্তে ফলোদি পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। নরা-র মাতা রাণী লক্ষ্মী পুত্রের সঙ্গে ফলোদি দুর্গে থাকিতেন। ফলোদির কাছাকাছি পোহ্‌করণ দুর্গ খীবন্ বা খীবা নামক এক পরাক্রান্ত রাঠোর সামন্তের অধীনে ছিল। বর্ষাকালে একদিন কুমার নরা তাঁহার মা'র ঘরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় জানালা খুলিয়া দাসী বলিয়া উঠিল, আজ পোহ্‌করণ দুর্গশীর্ষে বিজলী চমকাইয়াছে। এই কথা শুনিয়া হঠাৎ রাণী লক্ষ্মী বিমনা হইলেন ; তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। নরা বার বার

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মা, তুমি মন-মরা কেন? রাওজী কুশলে আছেন; তোমার দুই পুত্র বাঘা ও নরা বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কী দুঃখ? রাণী লক্ষ্মী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পুত্রের পীড়াপীড়িতে অবশেষে যে কথা আজীবন তাঁহার প্রাণে শল্যের মত বিঁধিয়া থাকিলেও রাঠোর কুলে জ্ঞাতি-বৈর এবং পতি-পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই, উহাই মনের খেদে বলিয়া ফেলিলেন।

মাতৃহীনা লক্ষ্মীর মাতামহ স্বীয় দৌহিত্রীর জন্য পোহ্‌করণ দুর্গাধিপতি রাঠোর সামন্ত খীবনের সহিত বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া মাঙ্গলিক "নারিকেল" প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশুভ মূলা নক্ষত্রে লক্ষ্মীর জন্ম বলিয়া ঐ নারিকেল ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরে লক্ষ্মীর এক ছোট মাসীর সহিত খীবার এবং রাও সুজার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়াছিল। "নারিকেল" ফিরাইয়া দেওয়া কন্যার প্রতি গুরুতর অপমান। লক্ষ্মীর মাতামহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই। খীবার[১] প্রতি এই বৈর রাণী লক্ষ্মী পতিকুলে শান্তির জন্য নিজের মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। নরা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মা তুমি একটা কথা বলিলেই পোহ্‌করণ আমাদের জানিবে; তোমার মাসী খীবনের ঘরে আছে বলিয়াই আমি এতদিন চুপ করিয়া আছি।"

ইহার কয়েক মাস পরে এক বৃহৎ বরযাত্রী দল পোহ্‌করণ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত খীবার ঘোড়ার খামারের নিকট দিয়া যাইতেছিল। ঘোড়ার তদারক করিবার জন্য তিনি কয়েক দিন পূর্বে লোকজন সিপাহী সঙ্গে করিয়া পোহ্‌করণ হইতে খামারে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন তিনি দাঁতন করিতে করিতে হঠাৎ কুমার নরার প্রসিদ্ধ জঙ্গী ঘোড়া "কোরিধজ"-এর হ্রেষা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলেন; তাঁহার মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় অভিভূত হইল। নরা তাঁহার জ্ঞাতি এবং সীমান্ত প্রতিবেশী, সুতরাং মিত্র নহে। অধিকন্তু ফলোদি হইতে বহিষ্কৃত নরা-র পুরোহিতকে তিনি পোহ্‌করণ দুর্গে আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিছুদিন থাকিয়া ঐ পুরোহিত কিছু না বলিয়া দুর্গ হইতে চলিয়া গিয়াছে; দুর্গে অল্প কয়েকজন মাত্র রক্ষী। খীবা সাতপাঁচ ভাবিয়া ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন অশ্বারোহীকে আদেশ করিলেন। ঐ খামারের নিকট দিয়া মারবাড় হইতে অমরকোট যাইবার রাস্তা। অশ্বারোহীগণ রাস্তা হইতে অল্প দূরে এক টিলার আড়ালে দাঁড়াইয়া যাত্রীগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। বরযাত্রী দল নিকটবর্তী হওয়া মাত্র

১। খীবন বা খীবা রাও সুজার পুত্র উদয়সিংহের পুত্র। দ্রষ্টব্য—র‍্যাড, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৭।

তাহারা হাঁক দিল, কোন্ ঠাকুরের সওয়ারী চলিয়াছে? বরযাত্রী পক্ষ হইতে জবাব আসিল, নরা বীদাবত (বীদার পুত্র) বিবাহ করিবার জন্য অমরকোট যাইতেছেন। খীবার অনুচরগণ সন্দেহমুক্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, রাও সুজার পুত্র নরার "কোরিধজ" ঘোড়া তোমার দলে কেমন করিয়া আসিল? অপর পক্ষ বলিল, ঐ ঘোড়া বরের জন্য ধার লওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দলে ভারী আগন্তুকগণকে ঘাঁটাইতে সাহস না হওয়ায় অশ্বারোহী দল ফিরিয়া গিয়া খীবনকে জানাইল; এক ভারী "বরাত" অমরকোট যাইতেছে, সঙ্গে উট-বোঝাই হাতিয়ার, দলে সকলের বরের পোশাক, মাথায় "সেহরা" (মুকুট), পরিধানে "কেসরিয়া" (কুঙ্কুম) বস্ত্র তাহারা "খাম্বাইচ" (খাম্বাজ) রাগে বিবাহের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে; গতিক কিন্তু ভাল নয় মনে হইতেছে (কুছ্ দাল-মে কালা হ্যায়)।

ছদ্মবেশী বরযাত্রী দল অমরকোটের রাস্তা পাশ কাটাইয়া পোহ্করণ দুর্গে উপস্থিত হইল। নরা-র গুপ্তচর সেই পুরোহিত দ্বারপালকে হাঁক দিল, তোমার "কাটার" (তলোয়ার) এই লও। খিড়কি খুলিয়া হাত বাড়াইতেই নরা পিছন হইতে বর্শা মারিয়া দ্বারপালকে ধরাশায়ী করিল। দুর্গ অধিকার করিয়া নরা অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "নানাজী! তুমি এখন অন্যত্র যাইয়া কাঁটা কুড়া যাও, আমি এইখানে গেহুঁ (গম) খাইব।" নরা "নানী"-কে তাঁহার সেবক চাকর ও খীবা-র রক্ষীগণকে দুর্গ হইতে বিদায় করিলেন। তাঁহারা আশ্রয়-লাভের জন্য মারবাড় রাজ্যের বাহড়মের পরগণার দিকে চলিল। এই দুঃসংবাদ পাইয়া খীবা আশীজন অশ্বারোহী এবং তাঁহার শুভচিন্তক চারণকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত পোহ্করণ দুর্গের দিকে চলিলেন। দুর্গের চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে পথিমধ্যে এক গড়রিয়ার (বাং গাড়ল) সহিত তাঁহার দেখা হইল; সে একটা ছাগল কাঁধে করিয়া যাইতেছিল। রাও খীবাকে ঐ ব্যক্তি ছাগলটা "ভেট" দিল, অজা-নন্দন অনাথ হইয়া ভে ভে করিতে লাগিল। খীবা চারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চারণ বাবা! ছাগলটা কি বলিতেছে? শাকুনবিৎ চারণ নিতান্ত সপ্রতিভভাবে বলিলেন, ছাগল বলিতেছে আপনি এই স্থান হইতে যত ক্রোশ পথ চলিয়া ইহাকে ভোজন করিবেন তত বৎসর পরে নরাকে আপনি বধ করিবেন। খীবা মেষচারককে পাঁচ ছকর (ত্রিশ পয়সা) বকশিশ দিয়া বাহড়মেরের দিকে চলিলেন এবং বারো ক্রোশ দূরে তিনোয়ানা গ্রামে ডেরা ফেলিয়া ছাগলের সদ্গতি করিলেন।

নরা এবং খীবার বৈর বারো বৎসর পর্যন্ত চলিল, পোহ্করণ এলাকায় সোয়াস্তি রহিল না, খীবা সুযোগ পাইলেই নরার অধিকারে প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুট করিত,

পরাবি' পশু হরণ করিত। শেষবার খীঁবা তাঁহার ন্যায়ে বৎসর বয়স্ক পুত্র লুঁকা এবং পিতৃব্য বরজাংগকে সঙ্গে লইয়া নরার জমিদারী হইতে অপহৃত পশুপালসহ ফিরিতেছিলেন; এমন সময় নরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। নরা ঘোড়া দৌড়াইয়া লুঁকাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধাবমান অবস্থায় লুঁকা পিছনে ফিরিয়া নরার উপর তলোয়ারের এমন এক চোট্ হানিলেন যাহাতে নরার মাথা ঐখানেই নামিয়া গেল, কিন্তু সওয়ার অবস্থায় তাঁহার ধড় (কবন্ধ) আরও দুই শত কদম (পদক্ষেপ পরিমিত জমি) আগাইয়া মাটিতে পড়িল। নরার মৃত্যুতে বৈর শান্ত হইল না। পিতার মৃত্যুর পর নরার উত্তরাধিকারী গোয়ন্দ (গোবিন্দ) এবং বৃদ্ধ খীঁবার মধ্যে বৈর তীব্রতর হইয়া উঠিল, দুই পক্ষের সংঘর্ষে আবাদ বস্তি উজাড় হইতে লাগিল (ধবৃতী বসূনে না পাবে)। অবশেষে রাও সুজা তাঁহার পৌত্র গোয়ন্দ এবং খীঁবাকে ডাকাইয়া পোহ্‌করণ এলাকা উভয়ের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দিলেন। বিঃ সম্বত ১৫৫১ চৈত্র কৃষ্ণা পঞ্চমী (খৃঃ ১৪৯৫) নরার মৃত্যু হইয়াছিল। যেখানে নরার মাথা ভূমিতে পড়িয়াছিল উহাই উভয় পক্ষের অধিকার ও বৈর শান্তির সীমারেখা নির্দিষ্ট হইল।[২]

৬

রাজপুতানার তথাকথিত ছত্রিশ কুলের মধ্যে রাঠোর কুল ছিল সর্বাপেক্ষা বৈর-প্রবণ। লোভ, হিংসা, ক্রূরতা এবং পররাজ্যহরণে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাজপুতানার কোন কুল রাঠোরকে অতিক্রম করে নাই। বীরমদেব সল্‌খাবত (রাও সল্‌খার পুত্র) এবং তাঁহার পুত্র গোপা এই হিসাবে রাঠোর বংশের কুলভূষণ "সপূত" (সুপুত্র), নৈন্‌সীর খ্যাত হইতে তাঁহাদের কীর্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রাও সল্‌খার কনিষ্ঠ পুত্র বীরমদেব রাঠোর তরবারি মাত্র সম্বল করিয়া জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন "ঠিকানা" (আবাস দুর্গ) কিংবা জায়গীর ছিল না। রাঠোর কুলের তৎকালীন রাজধানী মহেবার বাহিরে তিনি এক "গুড়া" (আত্মরক্ষার জন্য অস্থায়ী গ্রাম-দুর্গ) নির্মাণ করিয়া ঐখানেই ঠাকুরাই

২। দ্রষ্টব্য নৈন্‌সী, খ্যাত পৃঃ ১৩৮-১৪৪ (নাঃ প্রঃ সভা সংস্করণ)

নৈনসী লিখিয়াছেন তাঁহার সময় পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ১৭০ বৎসর পরেও ঐ সীমা উভয় কুলের মধ্যে অলঙ্ঘিত ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রাজপুত প্রধান এলাকায় বৈর শান্তির এইরূপ স্মরণীয় স্থানকে পূর্বে হাড়-গড়ী বলা হইত।

করিতেন। যে কোন বংশের পলাতক অপরাধীগণ কোথাও আশ্রয় না পাইলে বীরমদেবের "গুড়ায়" আসিয়া সরণা (শরণ) লইত। বীরমদেব লড়াই ঝগড়ায় একাই একশ ছিলেন ; সেজন্য জ্ঞাতি বন্ধু কেহ তাঁহাকে ঘাঁটাইত না। বীরমদেব সল্‌খাবত যে গ্রামে থাকিতেন সেই এলাকায় ঠাকুর জগমালের হাত হইতে তিনি একবার নিরপরাধ পথযাত্রী দল্লা জোহিয়া ও তাঁহার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বীরমদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাও মালাজীর পৌত্রগণের সহিত তাঁহার বিবাদ লাগিয়াই ছিল। এইজন্য তিনি মহেবা ত্যাগ করিয়া জয়সল্‌মীর চলিয়া গিয়াছিলেন। উগ্র ও পরস্বলোলুপ স্বভাবের জন্য ভট্টিরাজ্যে তিনি টিকিতে পারিলেন না। সেখান হইতে তিনি নাগোর চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ, গ্রাম লুটপাট ও উজার করিতে লাগিলেন। নাগোরের মুসলমান ফৌজদার তাঁহাকে ধরিবার জন্য জঙ্গল দেশ (বিকানীরের প্রাচীন নাম) পর্যন্ত তাড়া করিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনি অবশেষে দল্লা জোহিয়ার দেশ জোহিয়াবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জোহিয়া রাজপুত মহাভারতের যুগে পরাক্রান্ত যোধেয় জাতির বংশধর। কুরু-জাঙ্গল ক্ষেত্রে জয়সল্‌মীর ও বিকানীরের উত্তরাংশে জোহিয়া-অধ্যুষিত ভূমি জোহিয়াবাটী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জোহিয়াবাটীর রাজধানী, রাজা কিংবা রাজবংশ ছিল না। উহাদের রাষ্ট্র প্রাচীন ভারতের কুলশাসিত সাধারণ তন্ত্রের (Tribal Republic) শেষ নিদর্শন। শাসক-গোষ্ঠীর আভিজাত্যাভিমানী স্ব স্ব প্রধান ঠাকুর এক এক বস্তির (Canton) উপর প্রভুত্ব করিতেন। বীরমদেবের মাতা ছিলেন জোহিয়া ধীরদেবের পুত্রী।[৩] জোহিয়াগণ তাঁহাকে সমাদরে পরম আত্মীয় রূপে গ্রহণ করিল এবং জোহিয়া বসতি হইতে অনেক দূরে এক স্থানে তাঁহার বাসস্থান বা গুড়া তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহার ব্যয় নির্বাহের জন্য জোহিয়াগণ গ্রামের রাজস্বের এক অংশ দান হিসাবে তাঁহার জন্য বরাদ্দ করিয়া দিল। বীরমদেব পশুপালন করিয়া নিজের অবস্থা আরও সচ্ছল করিলেন। স্বভাবগুণে কিছুকাল পরেই রাঠোর-ব্যাঘ্র স্বমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়দাতাগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। দল্লা জোহিয়ার প্রতি বীরমদেবের পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া জোহিয়াগণ তাঁহার অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াছিল। বীরমদেব দান উশুল করিবার নামে গ্রামের সম্পূর্ণ মালগুজারী জবরদস্তি করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। বাঘ তাঁহার একটা ছাগী মারিলে তিনি জোহিয়াদের ১১টা ছাগী ধরিয়া আনিয়া বলিতেন,

৩। খ্যাত, পৃঃ ১৯৫, এই ধীরদেব দল্লা-র পূর্বজ, দল্লার পুত্র ধীরদেব নহেন।

বাঘটা জোহিয়ার; সুতরাং বাঘের ক্ষতিপূরণ তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিব না কেন? একদিন ঢোল বানাইবার জন্য তিনি জোর করিয়া এক ব্যক্তির একটা গাছই কাটিয়া ফেলিলেন, জোহিয়াগণ চুপ করিয়া গেল।

জোহিয়াদের মামা এবং দিল্লীর সুলতানের শ্যালক আভেরিয়া অর্থাৎ আভীর-গোত্রীয় ভাটি বুকন্‌কে জোর করিয়া মুসলমান করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বুকন্ প্রচুর ধনসহ পলায়ন করিয়া জোহিয়াগণের শরণার্থী রূপে ঐখানে বাস করিতেছিল। বীরমদেব বুকন্ ভাটির সহিত ভাব জমাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ আদায় করিলেন। নিমন্ত্রণের দিন তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গকে অস্ত্রসজ্জিত করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বুকনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পূর্বকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতায় বীরমের হাতে নিমন্ত্রণ-কর্তা প্রাণ হারাইল, তাহার সর্বস্ব লুন্ঠিত হইল। ইহার পরে বীরমদেব দল্লা জোহিয়াকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দল্লা একটা হাল্কা গরুরগাড়ীতে (থরসল) একদিকে একটা বলদ এবং অন্যদিকে একটা ঘোড়া জুতিয়া বীরমদেবের গুঢায় চলিলেন। বীরমদেবের স্ত্রী মাঙ্গলিয়ানী দুঃসময়ে দল্লার সহিত "ভাই" সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। তিনি পতির দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। দল্লা পৌঁছিবার পর বীরম শিকার হাতে আসিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার লোকজনকে প্রস্তুত করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে বীরমদেবের স্ত্রী এক লোটা জলের ভিতরে একটা দাঁতন রাখিয়া দল্লার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। দল্লা সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং বাড়ীর চাকরকে বলিয়া দিলেন পেট মোচড় দেওয়ায় তিনি "জঙ্গল" (অর্থাৎ মলত্যাগ করিতে) যাইতেছেন। অনেক দূর গিয়া দল্লা গাড়ীর ঘোড়াটা খুলিয়া উহার উপর সওয়ার হইয়া একজন "রাঠী" জাতীয় লোককে গাড়ী লইয়া আসিতে বলিলেন। দল্লা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরিল না দেখিয়া বীরমদেবের মনে সন্দেহ হইল হয়ত কোন আঁচ পাইয়া নিশ্চয়ই জোহিয়া পলাইয়াছে। তিনি দলবলসহ দল্লার অনুসন্ধানে চলিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন একটা মানুষ ও একটা বলদ একখানা "থরসল" গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

দল্লা প্রাণপণে ঘোড়া দৌড়াইয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন। জোহিয়াগণ পরের দিন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া বীরমদেবের গরু ছাগল লুট করিতে আসিল। সংবাদ পাইয়া বীরমদেব সসৈন্য বাধা দিতে আসিলেন, উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। দল্লা জোহিয়া এবং বীরমদেব পরস্পরের আঘাতে সহমৃত হইলেন, রাঠোর এবং জোহিয়াগণের মধ্যে "বৈর" ঘোষিত হইল।

বীরমদেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁহার তৃতীয় রাণীর গর্ভজাত পুত্র গোগাদেব প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জোহিয়াগণকে নানা প্রকারে বিব্রত করিতে লাগিলেন। সেকালের অদ্বিতীয় যোদ্ধা এবং সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, সম্ভবতঃ তিনি গোরখপন্থী নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ অভিযানে তিনি জোহিয়াবাটী আক্রমণ করিয়া জোহিয়াগণকে প্রতারিত করিবার জন্য বিনা যুদ্ধে বিশ ক্রোশ হটিয়া মরুভূমির মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিছুদিন পরে গোগাদেবের গুপ্তচরগণ খবর লইয়া আসিল দল্লা জোহিয়ার পুত্র ধীরদেব সৈন্যসামন্ত লইয়া পূগলের রাও "রাণগদে (রণাঙ্গ দেব) ভট্টির কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য পূগল চলিয়া গিয়াছেন। গুপ্তচরেরা দল্লার শয়নগৃহের সমস্ত খবরও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। গোগাদেব এবং তাঁহার পুত্র উদা রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক খাটিয়ায় দল্লা এবং পাশের অপর খাটিয়ায় আর কেহ শুইয়া আছে। দুইজনকেই হত্যা করিয়া তাহারা পলাইয়া গেল; নিহতদের মধ্যে একজন ছিল দল্লার নাত্নী। দল্লার ভাইপো হাঁসু দল্লার পড়াইয়া নামক নামী-ঘোড়ায় চড়িয়া শেষরাত্রে পূগল পৌঁছিয়া গেল। নব-বধূর বাসঘরের শেষরাত্রে অর্ধ-জাগরিত ধীরদেব হঠাৎ নীচে পড়াইয়া ঘোড়ার চির-পরিচিত হ্রেষা রব শুনিয়া চমকাইয়া গেলেন। হাঁসুর কাছে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ধীরদেব বিবাহের "কাঁকণ ডোর" না খুলিয়াই গোগাকে ধরিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার শ্বশুর নিজ কন্যা ও ভট্টিসেনা সঙ্গে লইয়া ধীরদেবের সাহায্যার্থ চলিলেন।

গোগাদেব ফিরিবার পথে পদরোলা গ্রামের নিকট ডেরা করিয়াছিলেন। ঐখানে জলের সুবিধা ছিল। তাঁহার রাজপুতগণ ঘোড়াগুলি জঙ্গলে চড়িবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পুকুরের ধারে আরাম করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে জোহিয়া ও ভাটি সেনার অগ্রগামী দল দূরে ঘোড়া দেখিয়া অনুমান করিল গোগা নিকটেই আছে। তাহারা ঘোড়াগুলি তাড়াইয়া লইয়া পিছু হটিল এবং ঘোড়া ও মানুষ সকলেই জলপান করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে রাঠোরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল, গোগা হাঁক দিলেন, ঘোড়া লাও। অশ্ব-রক্ষকেরা চীৎকার করিল, জোহিয়া ঘোড়া লইয়া যাইতেছে।

ঘোরতর যুদ্ধে অধিকাংশ রাঠোর নিহত হইল ; গোগাদেব দুই উরুতে তলোয়ারের চোট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, পাশেই তাঁহার পুত্র গতায়ু উদা। গোগাদেব মাটিতে বসিয়া মানুষ-প্রমাণ দীর্ঘ তাঁহার তরবারি ঘুরাইতে লাগিলেন ; কেহ কাছে আসিতে সাহসী হইল না। রাণগ্‌দে ভাটি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন ; গোগা ডাকিয়া বলিলেন, রাওজী ! আমার "নমস্কার" (যুদ্ধার্থ আহ্বান সূচক) লইয়া যাও। পূগল-পতি অবজ্ঞাভরে বলিলেন, তোর মত বিষ্ঠার ডাকে জবাব দিয়া ফিরিব নাকি ? তিনি চলিয়া যাওয়ার পর দল্লা-পুত্র ধীরদেব ঐদিক হইয়া যাইতেছিলেন। ভূপতিত পিতৃহন্তাকে বধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। গোগাদেব ডাক দিয়া ধীরদেবকে বলিলেন, ধীরদেব ! তুই শূরবীর জোহিয়া। তোর "কাকা" (বাবা অর্থে) আমার পেটের ভিতর ধড়্‌ফড়্ করিতেছে। আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। ধীরদেব ঘোড়া হইতে নামিয়া গোগার সহিত তরবারি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং সাংঘাতিক আহত হইয়া গোগার পাশে পড়িয়া গেলেন, গোগা হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীরদেব বলিলেন, আমি তোমাকে মারিলাম এবং তুমি আমাকে—। ধীরদেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পর মুমূর্ষু গোগা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলেন, রাঠোর কেহ যদি বাঁচিয়া থাক শুন। গোগাদেব বলিতেছে রাঠোর এবং জোহিয়া-র "বৈর" সমান সমান (সুতরাং সমাপ্ত) হইয়াছে। কেহ যদি পার মহেবায় গিয়া বলিবে, রাও রাণগ্‌দে ভাটি গোগা-কে "বিষ্ঠা" গালি দিয়াছে ; সুতরাং এখন হইতে ভাটিকুলের সহিত রাঠোরের "বৈর" জানিবে।

ভাটি ও রাঠোরের এই বৈর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছে, রাঠোরের রোষাগ্নিতে পূগলে ভট্টিরাজ্য লোপ পাইয়াছে, জয়সল্মীর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। রাজপুতের সব কিছু গিয়াছে ; শুধু কুলাভিমান ও বৈর-প্রবণতা এখনও আছে।

৮

সিরোহী (আবু) রাজ্যের চৌহান বংশীয় রাওর সহিত মহেবার রাঠোর ঠাকুর ধাঙ্গলের কন্যা সোনাবাইর বিবাহ হইয়াছিল। গরীব বাপ ভাই বিবাহে যথোপযুক্ত অলঙ্কার যৌতুক ইত্যাদি দিতে পারে নাই। এইজন্য সোনাবাই মন-মরা হইয়া থাকিত। তাহার এক সপত্নী আনা বাঘেলার কন্যা বাপের বাড়ীর যৌতুক ও বহুমূল্য অলঙ্কার দেখাইয়া দেখাইয়া সোনাবাইকে সর্বদা খোঁটা দিত। একদিন দুই সতীনের

মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। বাঘেলী সোনাবাইকে হেয় করিবার জন্য বলিয়া উঠিল, আরে, তোর্ ভাই পাবু নীচজাত চূড়া-থোড়ীদের সঙ্গে খানাপিনা করে! রাঠোরী রাগে লাল হইল দেখিয়া রাও বলিলেন, চট কেন? বাঘেলী ঠিক কথাই ত বলিতেছে। সোনাবাই বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন ঠিক; কিন্তু আমার ভাইএর কাছে যে থোরী আছে, তাহাদের সমান সাহসী রাজপুত আপনার নাই জানিবেন। রাও স্ত্রীর ধৃষ্টতার শাস্তিস্বরূপ সোনাবাইকে পাঁচ-সাত ঘা চাবুক মারিলেন। সোনাবাই আপন ভাই পাবু রাঠোরের কাছে অপমান ও প্রহারের কথা জানাইয়া তাহার বৈর-শোধের প্রার্থনা জানাইল।

এই স্থলে পাবু রাঠোর ও তাঁহার থোরী[8] অনুচরগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক।

রাজপুতানার লোকেরা থোরীদিগকে "ভূত" ও "শয়তানের বাচ্চা" বলিয়া থাকে। তাহারা গ্রামের বাহিরে বাস করে, মানুষ ছাড়া তাহাদের অখাদ্য জীবিত মৃত কিছুই নাই এবং অসাধ্যও কিছু নাই। ইহারা বাংলা দেশের বাউলী, চূড়া ও ডোম জাতীয় রাজপুতানার প্রাক্-আর্য যুগের অনার্য আদিম অধিবাসী। মনিবের হুকুমে পিছনে ভরসা থাকিলে তাহারা অপ্রধৃষ্য শত্রুর মাথা কিংবা মাথার পাগড়ী যাহা ইচ্ছা অনায়াসে আনিয়া দিতে পারে। গোপন গতিবিধির সন্ধান এবং গুপ্তচরের কাজে তাঁহারা অত্যন্ত নিপুণ এবং অসমসাহসী পদাতিক যোদ্ধা। তাহাদের প্রধান অস্ত্র ধনুক ও কামঠা (sling) দুইটাতেই অব্যর্থ লক্ষ্য। স্বাধীনতা হারাইয়া তাহারা চোর ডাকাত এবং অস্পৃশ্য হইয়াছে।

গুজরাট সীমান্তে আনা বাঘেলার রাজ্যে অনেক থোরী বাস করিত। কোন সময় ঐখানে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় থোরীগণ আনার গরু, উট, ইত্যাদি পশু চুরি করিয়া খাইতে লাগিল। উহাদিগকে দমন করিবার জন্য আনা ফৌজসহ তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; থোরীদিগের সহিত যুদ্ধে আনার পুত্র নিহত হইল। থোরীদের মধ্যে এক মায়ের পেটের সাত ভাই, চাঁদিয়া, দেবিয়া, ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা দুর্দান্ত ছিল। আনার ভয়ে তাহারা ঐ রাজ্য ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র এবং পশুপাল লইয়া পলায়ন

8 "*Tawuri*, *Thori* or *Tori*—These engross the distinctive epithet of *bhoot* or 'evil spirits', and the yet more emphatic title of 'sons of the devil'. Their origin is donbtful, but they rank with Bawuris, Khengars and other professional thieves, scattered over Rajputana, who will bring you either your enemy's head or the turban from it"!

Tod's *Annals*, ii, 312-319.

করিতে লাগিল। বড় বড় গরু ও উটের গাড়ীতে (গাড়া) মানুষ, ছাগল, ভেড়া ও গৃহস্থালির জিনিস বোঝাই করিয়া এই যাযাবর জাতি মরুভূমির মধ্যে শত শত ক্রোশ ঘুরিয়া বেড়াইত। এইরূপ গাড়ীই ছিল থোরীদের ভ্রাম্যমাণ গৃহ। এক সময়ে প্রাচীন টিউটন জাতি ও ভারতীয় আর্যগণ এইরূপ গাড়ী-গৃহ আশ্রয় করিয়া রাজ্যজয় ও উপনিবেশ স্থাপনার্থ যুদ্ধাভিযান করিতেন।

পুত্র-শোকাতুর আনা পলায়মান থোরীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সাত-ভাই থোরীর বৃদ্ধ বাপকে বধ করিলেন। বৈরের শপথ গ্রহণ করিয়া চাঁদিয়া, ইত্যাদি পলাইয়া গেল। পরাক্রান্ত আনা বাঘেলার ভয়ে কোন ঠাকুর তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে সাহসী হইল না; কেহ কেহ বলিল ধান্ধল রাঠোরগণের কাছে যাও। ধান্ধল রাঠোরের পুত্র ঠাকুর বুড়া থোরীদিগকে তাঁহার ছোট ভাই পাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। পাবু অত্যন্ত গরীব, ক্ষেত খামার শিকার করিয়া দিনযাত্রা নির্বাহ করিত। সে তখনও অবিবাহিত, কাছা-খোলা গোছের লোক এবং পরিবারের সকলের হাসি-ঠাট্টার পাত্র ছিল। চারণদিগের নিকট হইতে একটা তেজী বাচ্চা ঘোড়ী উপহার পাইয়া পাবু ঘোড়ীর উপর চড়িয়া তাহার বৌদিদি ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানাইতে গিয়াছিল। ঠাকুরাণী ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, ঘোড়ায় তোমার কোন্ আবশ্যক? খেতী কর, ঘরে বসিয়া খাও; ঘোড়ীর উপর সওয়ার হইয়া "ধাড়া" (লুট্‌মার্) মারিবে নাকি? পাবু বলিল, "ভাবজ (ভ্রাতৃজায়া), 'তানা' (খোটা) দাও কেন? আমিও রাজপুত। ঘোড়া আবশ্যক হইলে ডোডোয়ানা দেশের (অর্থাৎ তোমার বাপেরবাড়ীর) ঘোড়া ধরিয়া আনিতে পারি!" ঠাকুরাণী শুনাইয়া দিলেন, "যাও যাও! অতদূর যাইতে হইবে না; হয় আধা রাস্তায় মারা পড়িবে, না হয় আমার দেবর বলিয়া প্রাণে না মারিলেও ডোডা রাজপুত তোমার—দুইটি বাঁধিয়া লট্‌কাইয়া রাখিবে!" পাবুর রাঠোর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে বলিল, ডোডা কখনও রাঠোর মারিয়াছে?

পাবুর মনে ঠাকুরাণীর কথা শল্যের মত বিঁধিয়াছিল। সে তাহার নূতন থোরী অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল দেবড়া ভগ্নীপতিকে শায়েস্তা করিবার পূর্বে ঠাকুরাণীর ঠাট্টার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। কয়েক মাস পরে পাবু ডোডোয়ানায় (বর্তমান ডীডোয়ানা নাগোরের নিকটে) হানা দিয়া ডোড্ রাজপুত-গণের পশুগুলি তাড়াইয়া লইবার জন্য থোরীদিগকে হুকুম দিল। কয়েকজন ডোড্-সওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া পাবু-র তীরের পাল্লার মধ্যে আসিতেই সে এক এক তীরে পর পর দশজনকে ধরাশায়ী করিল। থোরীগণ কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছিল।

পাবু তাহাদিগকে ডাক দিয়া বলিলেন, যাহারা মরিয়াছে উহাদের ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যাও। ইতিমধ্যে পাবুর দাদার শ্যালক ডোডিয়া ঠাকুর আর একদল রাজপুত সহ আসিয়া পড়িলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে ডোডিয়া ঠাকুর বন্দী হইলেন, তাঁহার হতাবশিষ্ট অনুচরগণ পলাইয়া বাঁচিল। পশুগুলি ছাড়িয়া দিয়া পাবু বন্দী ঠাকুরকে লইয়া রাত্রের মধ্যে নিজের গ্রাম কোহ্‌লু ফিরিয়া আসিল। তাহার হুকুমে থোরীরা ঠাকুর সাহেবের—ঝুটা বাঁধিয়া তাঁহাকে ঝরোকার নীচে লট্‌কাইয়া রাখিল, এবং পরের দিন সকালে তামাশা দেখাইবার ছল করিয়া পাবু ঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ভাইকে ঐ অবস্থায় দেখিয়াই ঠাকুরাণীর চক্ষুস্থির। তিনি বলিলেন, পাবু, তোমার এটা কোন্ তামাশা? আমি ত হাসি-মজা করিয়া তোমাকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। পাবু শুনাইয়া দিল, ভাবজ। আমিও মজা (মজাক) করিয়াছি। রাজপুতকে কেহ এমন "তানা" (খোটা) দিয়া রেহাই পায় না, যে "কুপুত" (অপদার্থ) "তানা" সে সহ্য করিতে পারে। ঠাকুরাণী ভাইকে ছাড়াইয়া লইয়া তিন-চার দিন পরে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পরে পাবু আটজন সওয়ার এবং চাঁদিয়া প্রভৃতি থোরীকে লইয়া সিরোহী যাত্রা করিল। সিরোহীর রাস্তায় মধ্যপথে আনা বাঘেলার রাজ্য। উহার নিকটে পৌঁছিতেই চাঁদিয়া বলিল, আনা বাঘেলার সহিত আমাদের পূর্ব-বৈরের শোধ চাই। নিকটে আনা বাঘেলার এক বাগান ছিল; থোরীরা বাগান উজার করিতে লাগিল। খবর পাইয়া আনা ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধে আনা প্রাণ হারাইলেন, তাঁহার পুত্র বন্দী হইল। পাবু মৃত আনার স্ত্রীর যাবতীয় পোশাক ও অলঙ্কার পণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্রকে মুক্তি দিলেন। পথে ভগ্নীর জন্য এই যৌতুক যোগাড় করিয়া পাবু সিরোহীর কাছে ডেরা ফেলিল, এবং ভগ্নীপতির কাছে খবর পাঠাইল; সোনা-বাইর পিঠে চাবুকের শোধ তুলিতে আসিয়াছি, সাহস থাকিলে সিরোহী-পতি গড়ের বাহিরে আসিবেন। রাঠোর স্পর্ধার সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য চৌহান রণসজ্জা করিয়া পাবুর ডেরার কাছে পৌঁছিল। ভগ্নী বিধবা হওয়ার আশঙ্কায় পাবু থোরীগণকে পূর্বেই সাবধান করিয়াছিল রাওকে অক্ষত শরীরে বন্দী করিতে হইবে। চৌহান অশ্বারোহীগণ কূটযোদ্ধা থোরীর নাগাল পাইল না, তীর-বিদ্ধ হইয়া অশ্ব-আরোহী পিছু হটিতে লাগিল। চৌহান সেনা ছত্রভঙ্গ করিয়া থোরী পদাতিকগণ কৌশলে রাও-কে বন্দী করিল। যুদ্ধের খবর দুর্গে পৌঁছিতেই সোনাবাই স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় "রথে" (ঘেরাটোপ এক্কা গাড়ী) চড়িয়া আলুথালু হইয়া লড়াইর ময়দানে ছুটিল, কারণ বৈরে রাঠোরের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। সোনাবাই অনেক

কাকুতি করিয়া বলিল, ভাই! আমাকে "অমর-কাঁচলী" (অখণ্ড সৌভাগ্যের চিহ্ন রক্তবস্ত্র কাঁচুলী) দাও, রাওজীকে মুক্ত কর।

বৈর শান্ত হইল; ভগ্নীপতির সহিত পাবু দুর্গে চলিল। সোনাবাইর যৌতুকের ক্ষোভ মিটিয়াছিল। আনা বাঘেলার স্ত্রীর বহুমূল্য আভূষণ পরিয়া রাঠোরীর বৈরের আর এক ঝলক চৌহান ও বাঘেলীকে দেখাইবার জন্য ভাই-বোন একত্র সতীনের ঘরে উপস্থিত হইল। সোনাবাই নিতান্ত সহজ ভাবে বলিল, বাই! তোমার বাপকে আমার ভাই মারিয়া ফেলিয়াছে। উঠ, "লোকাচার" কর।

ইহা শুনিয়া বাঘেলী "পদত্রা লইল" (অর্থাৎ প্রথামত দাসী সঙ্গে লইয়া বাপের জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে বসিল)।

৯

রাজপুত বংশ-বট কালক্রমে ঝুড়ি ফেলিতে ফেলিতে কুলারণ্য সৃষ্টি করে। একই বংশতরুর বিভিন্ন শাখা কালের বাতাসে স্বার্থের ঝঞ্ঝায় পরস্পরের উপর আপতিত হইয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও হতশ্রী হয়, অরি-কুল আগাছার ন্যায় উহার রস শোষণ করিয়া বাড়িয়া উঠে। মেবার রাজ্যের 'চণ্ডাবত ও শক্তাবত' কুলের বৈর, কচ্ছবাহ-বংশে আলোয়ারের নরুকা এবং আম্বেরের (বর্তমান জয়পুর) পৃথ্বীরাজোত (রাজা পৃথ্বীরাজ কচ্ছবাহের বংশধরগণ); রাঠোর কুলে যোধপুরের 'যোধাবত', মেড়তার 'বীরমদেবোত' ও বিকানীরের 'বীকাবত' শাখার মধ্যে বংশানুক্রমিক বৈরভাব রাজস্থানের চরম দুর্ভাগ্য।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ এবং সম্রাট বাবরের সমসাময়িক যোধপুরের রাও গাগা (গঙ্গা) ও তাঁহার খুল্ল পিতামহ বীরমদেবের[৫] মধ্যে গৃহবিবাদ ছিল। গাগার

৫ বংশাবলী (টড)
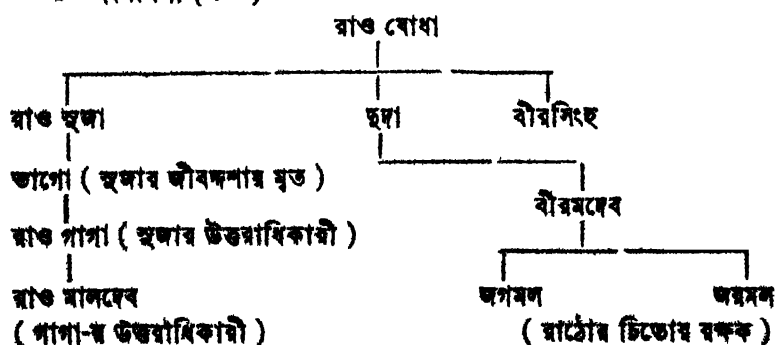
বালকপুত্র মালদেবের দুর্জয় অভিমান ও হঠকারিতার ফলে ঐ বিবাদ দারুণ বৈরে পরিণত হইয়া মারবাড়ের সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল। দৌলত খাঁ নামক লোদীবংশীয় পাঠানের সহিত এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাও গাগা পাঠানের হাতী-ঘোড়া লুট করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একটা হাতী বীরমদেবের মেড়তিয়া রাঠোরগণের এলাকায় পলাইয়া গিয়াছিল। যোধপুর রাজের প্রতি আনুগত্য মেড়তিয়া রাঠোরগণ নামমাত্র স্বীকার করিত। মেড়তিয়া রাঠোর লড়াই ঝগড়ায় সর্বদা অগ্রণী ছিল। মেডতিয়া রাঠোরগণ ঐ হাতী ধরিয়া শহরের ফাটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকাইয়াছিল। রাও গাগা বীরমদেবকে হাতী ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বীরমদেব ঝগড়া মিটাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেও মেডতার সর্দারগণ এই কার্য আত্মসমর্পণের তুল্য অপমানজনক মনে করিলেন। অবশেষে স্থির হইল কুমার মালদেব মেড়তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া এইখানে আসিলে বিদায় উপঢৌকন স্বরূপ ঐ হাতী তাঁহাকে দেওয়া হইবে। মেড়তায় নিমন্ত্রণে আসিয়া পঙক্তিতে আসন গ্রহণ করিতেই মালদেব বলিলেন, আগে হাতী চাই, পরে ভোজন। সকলে বলিল আপনি ভোজন আরম্ভ করুন, হাতী আসিতেছে, কিন্তু মালদেব কিছুতেই মানিবেন না। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহার এবং অন্যায় জিদ্ দেখিয়া সর্দারগণের ধৈর্যচ্যুতি হইল। বীরমদেবের দেওয়ান সাহানী রায়মল হুদাবত শুনাইয়া দিলেন, কুমারজী! আপনার মত 'হঠিলা' (একগুঁয়ে) বালক আমাদের ঘরেও আছে, এই ভাবে হাতী দেওয়া যায় না, আপনি আসুন। মালদেব ক্রোধান্ধ হইয়া শাসাইলেন, হাতী পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু মেড়তা উজার করিয়া এইখানে যদি মূলার চাষ না করাই তবে আমার নাম মালদেব নয়। দুদা পিতার নিকট মেড়তা পরগণা জায়গীর পাইয়াছিলেন (Tod)। নৈন্‌সী লিখিয়াছেন, রাও যোধার পুত্র বীর সিংহ বিঃ ১৫১৫ (১৪৫৯ খৃঃ) মেড়তা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মালদেব চলিয়া যাওয়ার পরে রাও গাগা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বীরমদেবকে লিখিলেন, কাজটা ভাল হইল না; আমি চোখ বুঁজিলেই এই সন্তান আপনাদিগকে দুঃখ দিবে। বীরমদেব দুইটা ঘোড়া নজর স্বরূপ সঙ্গে দিয়া বিরোধীয় হাতী যোধপুর পাঠাইয়া দিলেন। গায়ের ঘা ফাটিয়া যাওয়ার হাতীটা পথেই মারা গেল। গাগা পুত্রকে বুঝাইলেন, আমার রাজ্যে পৌঁছিয়া যখন হাতী মারা গিয়াছে হাতী আমরাই পাইয়াছি। মালদেব বলিলেন, আপনার প্রাপ্য হাতে আসিতে পারে, আমার পাওনা আসে নাই, যখন ক্ষমতায় কুলাইবে তখন আমি উশুল করিব।

ইহার এক বৎসর পরে রাও গাগার মৃত্যু হইল (১৫২৬ খৃঃ)। মালদেব যোধপুরের

গদ্দিতে বসিয়াই মেড়তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান করিলেন। মুষ্টিমেয় মেড়তিয়া রাঠোর অনেকদিন যুদ্ধ করিয়া দেশত্যাগ করিল (আনুমানিক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) মালদেব প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন। মেড়তা ত্যাগ করিবার সময় বীরমদেব শপথ করিয়াছিলেন, মেড়তার বাবুল গাছের বদলে যদি যোধপুরের আমবাগান আমি না কাটাই আমার নাম বীরমদেব নয়। নানা স্থানে আত্মগোপন করিয়া বীরমদেব অবশেষে সম্রাট শের শাহ্-র সাহায্যে মেড়তা উদ্ধার করিয়া যোধপুরের উপর শোধ তুলিলেন বটে, কিন্তু পাঠানেরা প্রায় সমগ্র মারবাড় অধিকার করিয়া বসিল। বীরমদেবের পরে জয়মল মেড়তার গদ্দিতে বসিলেন। সুর-বংশের পতনের সময় ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মালদেব জয়মলকে বিতাড়িত করিয়া আবার মেড়তা অধিকার করিলেন। জয়মল মহারাণা উদয় সিংহের সেনাধ্যক্ষ রূপে চিতোর অবরোধের সময় আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পানিপত যুদ্ধের (১৫৫৬ খৃঃ) দশ বৎসরের মধ্যে মালদেবের হঠকারিতায় বিবদমান রাঠোর কুলের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অন্ধ বৈরের ইহাই ধ্রুব পরিণাম।

বৈর-সাধনের সুযোগ পাইয়াও রাজপুত প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছে, এইরূপ উদাহরণ অতি কম। নৈন্‌সার 'খ্যাতে' যাহা পাওয়া গিয়াছে উহার উল্লেখ না করিলে রাজপুত-চরিত্রের প্রতি অবিচার করা হয়।

জালোরের ভূম্যধিকারী সোন-গড়া[৬] বংশীয় চৌহান সামন্ত সিংহ মূলু রাঠোরের স্ত্রীকে শত্রুতার প্রতিশোধ স্বরূপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। মূলু রাঠোর বৈর প্রতিশোধের জন্য শ্বশুরের এই কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া ঘরজামাই হইয়াছিলেন এবং ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাহার এক পুত্রও জন্মিয়াছিল। কিছুদিন পরে মূলুর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে অপমানিত শ্বশুর এবং মূলুর অপর শত্রু সামন্ত সিংহ বৈর-শোধের জন্য এই কার্য করিয়াছিলেন। মূলু রাঠোর স্ত্রীপুত্র-অপহারক সামন্ত সিংহকে হত্যা করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। জালোরের ভূস্বামীকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার মত জনবল মূলুর ছিল না। মূলু কুখ্যাত দস্যু, সুতরাং তাহার বৈর রাঠোর কুলের মান-বৈর নয়। মূলুর বৈর সাধনের সম্বল নিজের বাহুবল, দুর্জয় সাহস এবং তস্করের তড়িৎ বুদ্ধি। সামন্ত সিংহের অন্তঃপুরের এক দাসীর সহিত ভাব জমাইয়া মূলু যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ

৬ পূর্ব-পুরুষের নাম কিংবা উহাদের আদি নিবাসস্থান কুলের (sept of a clan) উৎপত্তি হয়। চৌহানগণের মধ্যে যাহাদের পুরনো "ঠিকানা" সোন্‌গড় [সোনাগর] ছিল তাহারা সোনাগড় চৌহান নামে পরিচিত।

করিল, এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা দাসীর সহায়তায় তুলসী মণ্ডপের নিকট আত্মগোপন করিয়া রহিল। সামন্ত সিংহ কিছু অধিক রাতে আহারে বসিয়াছিলেন, ঠাকুরাণী (মূলুর স্ত্রী) সামনে থালা রাখিয়া দিলেন। সামন্ত সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, মূলুর ছেলে কোথায়? ঠাকুরাণী বলিলেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সামন্ত সিংহ ঐ ছেলেকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্বদা উহাকে সঙ্গে বসাইয়া এক থালায় খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি ঠাকুরাণীকে বলিলেন, ছেলেকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া লইয়া আস। মূলু বড় সাহসী রাজপুত; তাহার ছেলে বাপের মত 'বাঁকা' (অসীম শৌর্যসম্পন্ন) রাজপুত হইবে।

ইতিমধ্যে খোলা তলোয়ার লইয়া সামন্ত সিংহকে হত্যা করিবার জন্য মূলু আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল এবং সব ব্যাপার দেখিতেছিল, সব কথা শুনিতেছিল। মূলু হঠাৎ সামন্ত সিংহের সামনে ছুটিয়া আসিয়া অর্ধোন্মত্তের ন্যায় চীৎকার ছাড়িয়া বলিল, তোমাকে আমি বধ করিব না, বধ করিব না, এবং এই বলিয়াই চোখের পলকে রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

১০

মেবাড়ের রাবত মেঘসিংহ চুণ্ডাবত তাঁহার নামে, মেজাজে, পোশাকে ও আওয়াজে যথার্থই 'মেঘ' ছিলেন, তবে শরতের শুভ্র মেঘ নয়, শ্রাবণের অশনিগর্ভ কুণ্ডলীকৃত কালো মেঘ যাহার আবির্ভাব রাজস্থানে ঝড়ের সূচনা করে। এইজন্যই লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল 'কালা মেঘ'। একবার কোন কারণে কথা কাটাকাটি হওয়ায় মহারাণা অমর সিংহ তাঁহাকে 'তানা' (খোঁটা) দিয়াছিলেন, আপনি মালপুরার পাট্টা লিখাইয়াছেন নাকি? রাবত মেঘসিংহ পুত্রকে লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া খালসার অধীন (Crown Land) মালপুরা পরগণার (বর্তমান জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত) পাট্টা এবং চারশতী জাত ও দুই শত সওয়ারের মনসব বকশিশ করিলেন; অধিকন্তু তাঁহার পুত্রকেও আশী সংখ্যক জাত ও বিশ সওয়ারের মনসব ও জায়গীর মালপুরা পরগণাতেই দিলেন (৬ই মার্চ, '৬১৬ খৃষ্টাব্দে)। মেঘসিংহ বেশীদিন মোগল সরকারে চাকরি করেন নাই; তিনি ঐ সময়ে আজমীঢ়ের অন্তর্গত বথেরায় মুসলমান কর্তৃক ভগ্নদশাপ্রাপ্ত আদিবরাহ মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন। মেঘসিংহের এই স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

মোগল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া মহারাণা সন্ধির শর্তানুসারে (১৬১৫ খৃঃ ১১ই মে) মিবাড়ের যে অংশ মোগল অধিকারে ছিল উহা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সম্রাটের আশ্রিত সগরজীর পক্ষাবলম্বী শক্তাবত ও অন্যান্য সামন্ত বহু বৎসর মিবাড়ের ঐ সমস্ত পরগণায় জায়গীর ভোগ করিতেছিল। তাহারা মহারাণার অধিকার নাম-মাত্র স্বীকার করিলেও জায়গীর ছাড়িল না। মহারাণার সামরিক শক্তি এত ক্ষীণ হইয়াছিল যে, ঐ সমস্ত জায়গীরদারকে উচ্ছেদ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সগরজীকে চিতোর হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া ব্যতীত মোগল সরকারও মহারাণাকে কোন সাহায্য করে নাই। অমর সিংহ নিরুপায় হইয়া কুমার করণকে বলিয়াছিলেন যে কোন উপায়ে রাবত মেঘসিংহ চুণ্ডাবতকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। একবার দিল্লী (আগ্রা ?) হইতে উদয়পুরের পথে কুমার করণ মালপুরায় মেঘসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া কুমার মেঘসিংহকে বলিলেন, রাবতজী আমার সঙ্গে দেশে ফিরিবেন প্রতিজ্ঞা না করিলে আমি গ্রাস মুখে তুলিব না।

কথিত আছে মেঘসিংহ কুমারের সঙ্গেই দেশে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু এক কথায় বাদশাহী মনসব ছাড়া যায় না, সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারে না—যাহা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সুতরাং মেঘসিংহ কখন মেবাড় ফিরিয়াছিলেন বলা যায় না, অন্ততঃ কুমারের সঙ্গে নয়। যাহা হউক, মহারাণা অমর সিংহ মেঘসিংহকে বেজু ও রতনপুরের পাট্টা দিলেন। এই দুই পরগণার পাট্টা পূর্বে মহারাণার প্রিয়পাত্র বল্লু চৌহানকে দেওয়া হইয়াছিল, বল্লুকে পরে উহার বদলে বেদলা জায়গীর দেওয়া হইল : যেহেতু বেজু তখনও কুমীরের পেটে। রাও নারায়ণ-দাস শক্তাবতের কবল হইতে বেজু উদ্ধার করা চৌহানের কর্ম নয়। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী অমর সিংহের স্বর্গবাস হইল, কিন্তু মরণকালেও কুবুদ্ধি তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিলেন বেজু হাতে আসিলে উহা যেন বল্লু চৌহানকে দেওয়া হয়।

রাজ্যারোহণের পর মহারাণা করণ রাও নারায়ণদাস শক্তাবতের কাছে বেজু ত্যাগের হুকুমনামা সহ রাবত মেঘসিংহকে পাঠাইলেন। চুণ্ডাবত ও শক্তাবতের উৎকট বৈরের উত্তরাধিকার রাবত মেঘসিংহ পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে সাক্ষাৎ তমোগুণ হইলেও ভিতরে তাঁহার যে সাত্ত্বিক উদারতা ও অনর্থক রক্তপাতে যে বিতৃষ্ণা ছিল উহা মধ্যযুগের কোন রাজপুত চরিত্রে দেখা যায় না। তাঁহার পশ্চাতে চুণ্ডাবত কুলের প্রচণ্ড শক্তি ও মহারাণার সমর্থন সত্ত্বেও তিনি মজ্জাগত বৈর ভুলিয়া

রাও নারায়ণদাস শক্তাবতের কাছে শান্তির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণদাস বুঝিতে পারিলেন চুণ্ডাবতের এই শান্তির প্রয়াস সবলের হিতোপদেশ, দুর্বলের ধর্মের দোহাই নহে, ফাঁকা শাসানিও নহে। তিনি অনিচ্ছায় বেজু ছাড়িয়া দিলেন এবং উহার নিকটে মিবাড়ের সীমার বাহিরে ভিয়ানায় উঠিয়া গেলেন।

মেঘসিংহ বেজু অধিকার করিবার পরেও ছোট ছোট শক্তাবত ভূমিয়া ঠেঠামি করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া এক শক্তাবত-গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিলেন। রাও নারায়ণদাসের শরণাপন্ন হইয়া শক্তাবতগণ নালিশ করিল, আপনি থাকিতে আমাদের এই দুর্দশা? ধূমায়মান শক্তাবত বৈরবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল, নারায়ণদাস প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

১১

বিবাহ রাজপুতের একটা বাতিক, পৌত্রলাভের পরেও রাজপুত বাগদানের "নারিকেল" গ্রহণে ইতস্তত করে না। বিবাহে রাজপুতের কালাকাল, বয়সের বিচার নাই। ক্ষত্রিয় দুহিতার পক্ষে পতির রূপ কামনা গৌণ, কুল-খ্যাতি ও শৌর্যই মুখ্য, বয়সে বাপের বড় হইলেও আপত্তি নাই, লড়াই করিয়া যে আঁধা, কানা কিংবা অঙ্গহীন হইয়াছেন, কিন্তু বাহাদুর রাজপুত বলিয়া যে লোকমান্য হইয়াছে (যথা, মারবাড়-রাজ অন্ধ নর্বদ রাঠোর), রাজপুতানী তাহাকেও বরণীয় বলিয়া মনে করিয়াছে। চুল পাকিলেও রাবত মেঘসিংহ লোকচক্ষে বৃদ্ধ নহেন, যেহেতু রাজস্থানে "(দুর্গেশাণাং) ন খলু বয়ঃ যৌবনাদন্যমস্তি!" সম্ভবতঃ কোন দূরবর্তিনী সৌদামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইবার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য "কালা মেঘ" রাবত মেঘসিংহ বরবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহযাত্রা করিলেন, দুর্গরক্ষার ভার পুত্র নরসিংহদাসের উপর রহিল।

রাও নারায়ণদাস শক্তাবতগণকে গোপনে একত্র করিয়া মেঘসিংহের অনুপস্থিতিতে বেজুর উপর অতর্কিত হানা দিলেন। নরসিংহদাস দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তাবতের সম্মুখীন হইলেন না। নারায়ণদাস দুর্গের চারিদিকে ঘোড়া দৌড়াইয়া একটিমাত্র হাতী লইয়া বিজয়োল্লাসে প্রস্থান করিলেন, লুটপাট করিয়া কোন ক্ষতি করিলেন না। ফিরিয়া আসিয়া রাবত মেঘসিংহ অপদার্থ পুত্রকে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। চুণ্ডাবত কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শক্তাবতের ভয়ে যে স্ত্রীলোকের মত দরজা বন্ধ করে সে ক্ষমার যোগ্য নহে। মেঘসিংহ শিশোদিয়া

বংশের মঙ্গলের জন্য যে কুল-বৈরকে এতদিন সংযত করিয়াছিলেন নারায়ণদাসের আচরণে উহা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল। তিনি শক্তাবতের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য চুণ্ডাবত কুলকে যুদ্ধার্থ আমন্ত্রণ জানাইলেন; শক্তাবত কুল রাও নারায়ণদাসের নেতৃত্বে চুণ্ডাবতের সঙ্গে বল-পরীক্ষার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

পাঁচ হাজার অশ্বারোহী লইয়া রাবত মেঘসিংহ নারায়ণদাসের জায়গীর ভিয়ানের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তাবতগণ দুর্গ পৃষ্ঠভাগে রাখিয়া চণ্ডাবতগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। পরের দিন ব্যূহবদ্ধ হইয়া চণ্ডাবত সেনা শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় মেঘসিংহের বজ্রকণ্ঠ তাহাদের গতি স্তব্ধ করিল। তিনি আদেশ দিলেন যুদ্ধ হইবে না, চণ্ডাবত-শক্তাবত একই শিশোদিয়া বংশের সন্তান; আমি গোত্র-হত্যা করিব না; ফিরিয়া চল, লোকে যাহা বলে বলুক। অতঃপর মানাভিমানী ক্ষুব্ধ চণ্ডাবত প্রধানগণ মেঘসিংহকে যুদ্ধার্থ প্ররোচিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট মান-বৈরের সপক্ষে যত যুক্তি সমস্তই প্রয়োগ করিলেন। ভগবদ্‌গীতা শুনিবার জন্য সেকালে কোন রাজপুতের আগ্রহ ছিল না; তবুও ভাটের খ্যাতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের[৭] প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাঁহারা বুঝাইলেন এই ব্যাপার একা মেঘসিংহের নহে, সমস্ত চুণ্ডাবত কুলের মান অপমান ইহাতে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; যুদ্ধ না করিয়া শক্তাবতের কাছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার এই কলঙ্ক কোন দিন ঘুচিবে না, শক্তাবত টিট্‌কারী দিবে, রাজপুত সমাজ হাসিবে।

মেঘসিংহ অর্জুন নহেন, যুক্তিতর্ক তিনি করিলেন না; শুধু এক কথা "গোত্র-হত্যা আমি করিব না, লোকে যাহা বলিবার বলুক।" তমোগুণী "কালা মেঘের" হঠাৎ এই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হইলে এই কুল-বিগ্রহে কয়েক হাজার শিশোদিয়া অকাতরে অকারণ প্রাণ বিসর্জন দিত, মিবাড়ের ক্ষীণ ক্ষাত্রশক্তি ক্ষীণতর হইত।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মেঘসিংহের ভীমরতি ধরিয়াছে মনে করিয়া মহারাণা তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, স্বর্গবাসী মহারাণা বেদুর জায়গীর বল্লু চৌহানকে

৭ যথা:

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্য বাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্ত তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥

দ্রষ্টব্য: ওঝা-কৃত রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮০১ (পাদটীকা); ৮১৬ নৈনসী; খ্যাত প্রথম খণ্ড। কাহিনী ও ইতিহাসের একত্র সমাবেশ ও সামঞ্জস্যবিধান সহজসাধ্য নহে।

দেওয়ার জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন। এইবার কালামেঘের আওয়াজে মহারাণার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তিনি মহারাণার মুখের উপর শুনাইয়া দিলেন—লড়াই ঝগড়া করিবার জন্ত চুণ্ডাবত, জায়গীর লইবার বেলা বন্ধু? বেন্দুর জায়গীর হয় চুণ্ডাবত না হয় শক্তাবত পাইবে, চৌহান জায়গীর লইবার কে?

মহারাণা বুঝিতে পারিলেন ঝড়ের কালোমেঘ সাদা হইবার বিলম্ব আছে; চুণ্ডাবতের পাগড়ীর ভাঁজে মালপুয়ার পাট্টা ও মন্‌সবের গরম রহিয়াছে।

বেন্দু "ঠিকানায়" মেঘাবত (মেঘসিংহের বংশধর) এখনও মহারাণার জায়গীর ভোগ করিতেছে।[৮]

১২

মোগল সাম্রাজ্যের ছায়ায় ভারতবাসী আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পাইয়াছিল, দরবারে রাজপুত প্রাধান্ত হিন্দুর প্রাণে যে আশা সঞ্চার করিয়াছিল, অনতিক্রম্য রাজপুত বৈর উহা অসাফল্য ও নিরাশার আঁধারে ডুবাইয়া দিল। সম্রাট আকবর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসীকে মৈত্রী ও মিলনের মন্ত্র দিয়াছিলেন, এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন,—রাষ্ট্রের কল্যাণে সকলের কল্যাণ, সকলের সম্মান লাভ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। উদার শাসননীতি এবং ধর্মে আপোষের মনোভাব সৃষ্টির দ্বারা এই মহান্ সত্য জাতিকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোল্লা সম্প্রদায় সম্রাটের সুল্‌হে কুল বা ধর্মে সকলের সহিত আপোষনীতি ব্যর্থ করিয়াছিল, সম্রাট পররাজ্যে ইরাণ খোরাসনে এই নীতি প্রচার করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইলেন; মানবতার উচ্চ আদর্শ সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতি-বৈর এবং ধর্ম-বৈরের আবর্তে ডুবিয়া গেল। স্বাধীন ভারতে উন্নততর "পঞ্চশীল" রূপে উহাই ভাসিয়া উঠিয়া আবার বৈর-সহস্রের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। সম্রাট আকবরের মূলনীতির অসাফল্যের জন্ত রাজপুত-বৈরই কি অংশতঃ দায়ী নহে?

প্রথম কথা, রাজপুত পাকাপোক্ত হিন্দু, এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কাল হইতে হাল তারিখ পর্যন্ত হিন্দুর বৈরিতা

[৮] মেঘসিংহের ব্যাপারে ওঝার মত বিচক্ষণ ঐতিহাসিকও অসঙ্গতি এড়াইতে পারেন নাই, নৈন্‌সী মালপুরার খোঁটা অমর সিংহের মুখে আরোপ করিয়াছেন। আমি নৈন্‌সীর বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছি; ওঝার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

কোনদিন অন্যের বিশেষ অনিষ্ট করে নাই, সর্বদা স্বজাতির অনিষ্ট বিশেষরূপে করিয়াছে, অন্যেরা ইহার বিলক্ষণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান হইয়াছে। রাজপুতের বৈর সম্বন্ধে ঐ এক কথা। সমগ্র রাজস্থান একযোগে আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, করিবার অবকাশও পায় নাই। মহারাণা প্রতাপের স্বাধীনতা সংগ্রাম মানব-সভ্যতার বিবর্তনে কাল-প্রগতির বিরুদ্ধে সনাতনের সর্বস্ব-পণ সংঘাত। স্বাধীনতা এমন এক বস্তু যাহার জন্য যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেও অক্ষয়কীর্তি লাভ হয়, জয়ী হইলে বিশ্ববরেণ্য হইয়া থাকে। প্রতাপ নিঃসন্দেহ এই গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু কাল-প্রগতির রথচক্র তাঁহার জয়লাভে স্তব্ধ হয় নাই, সনাতন কোণঠাসা হইয়াছে, বিজয়ী হয় নাই; এবং কখনও হইতে পারে না। প্রতাপ সেই যুগের ক্ষত্রিয় ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টিপ্রসার পৈত্রিক রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহার চোখে মিবাড়ের বাহিরে পৃথিবী ছিল না; শিশোদিয়া ব্যতীত মানুষ ছিল না, যাহাদের ভবিষ্যৎ তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে। এইখানেই প্রতাপ ও আকবর চরিত্রের মধ্যে মহান্ পার্থক্য। প্রতাপের বিরোধিতায় আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার ব্যাহত হয় নাই, শাসননীতি ব্যর্থ হয় নাই, রাজপুত প্রতাপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই; দীর্ঘকাল কিছু লোকক্ষয় ও অর্থহানি হইয়াছে। অন্যপক্ষে, প্রতাপের শক্তি সাফল্যের দ্বারা বর্ধিত হয় নাই, দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। প্রতাপ ক্ষুদ্র মিবাড়ে গো-ব্রাহ্মণ ও বেদ রক্ষা করিয়াছেন; আকবর রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে। আকবরের সাম্রাজ্যে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ধর্ম-বৈর ও জাতি-বৈর থাকিলে প্রতাপের উত্তম প্রশংসনীয় হইত, যেই শিবাজী রাজসিংহ দুর্গাদাস ও ব্রজমণ্ডলের জাঠ জাতি এই উভয় বৈরের নূতন স্রষ্টা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানুষ আকবর এবং আকবর বাদশাহ এক ব্যক্তি হইলেও দুই স্বতন্ত্র সত্তা ছিলেন। মানুষ আকবর প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। বাদশাহ আকবর হলদীঘাটের যুদ্ধের পরে মিবাড়-বিজীগিষা সংযত করিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু করিতে পারেন নাই—যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ ও মানবতা পরস্পরবিরোধী। প্রতাপ সন্ধি করিতে পারেন নাই, যেহেতু ক্ষত্রিয়ের "মান-বৈর" মানবতার ক্রন্দনে ধ্বংসের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

যাহা হোক্, "রাজপুত্তেষু বৈরঃ" ইতি "রাজপুত-বৈর" অর্থে সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী আকবর মোগল-দরবারে অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিস্পর্ধিতা ব্যতীত ঐ বৈরকে অন্যত্র

অনর্থ ঘটাইবার রাস্তা বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাটই একমাত্র ভূমির অধিকারী; বাদশাহী ফরমান্ ব্যতীত তলোয়ারের জোরে কোন কুল কর্তৃক অন্যের জমি দখল করা দণ্ডনীয় অপরাধ, এবং শাস্তিদাতা স্বয়ং সম্রাট; সুতরাং সাম্রাজ্যের মধ্যে রাজপুতের পূর্বকালীন ভূম বৈর রহিত হইল। কুল-বৈর রাজপুতানার গণ্ডির মধ্যে অশান্তি ঘটাইবার অবকাশ পাইল না; যেহেতু সকল রাজপুত কুলের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি এবং রাজন্যবর্গ দেশ হইতে বহু দূরে দূরে সাম্রাজ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন; ছোটখাটো সংঘর্ষ কদাচিৎ ঘটিলেও উহা এক গোয়ালে বাঁধা দুই ষাঁড়ের মধ্যে ভূমির জন্য ঢুসাঢুসি অপেক্ষা বেশী গুরুতর গণ্য হইত না।

সম্রাট আকবর তাঁহার অবর্তমানে হিন্দু-প্রজার ন্যায্য অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাজপুতের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। কুমার সেলিমের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহে আশঙ্কান্বিত হইয়া আকবর সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র, রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়, খানখানান্ আবদুর্ রহীমের জামাতা এবং চরিত্রগুণে সকলের প্রিয় খসরু-কে উত্তরাধিকারী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম রাঠোরকুলের ভাগিনেয়, রাঠোরকুলের দোষ-গুণ তিনি সমস্তই পাইয়াছিলেন, কিন্তু ছোটকাল হইতে পিতা সেলিমের মত গোঁড়ামির দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। মাতুলবংশের সহায়তার উপর ভরসা করিয়া খসরু দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার দুরাশা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পূর্বেই পিতা-পুত্রকে কেন্দ্র করিয়া ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। সেলিম পিতার ইসলামবিরোধী কার্য ও শাসননীতি পরিবর্জন করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া শৌর্যে রাজপুতের সমতুল্য বারহাবাসী সৈয়দগণকে নিজপক্ষভুক্ত করিলেন। রাঠোরগণের দুর্জয় পণ, হিন্দুর ভাগ্যে যাহাই ঘটুক কচ্ছবাহকুলের ভাগিনেয়কে দিল্লীর সিংহাসনে বসিতে দিবে না। কচ্ছবাহকুলের মধ্যে মিল ছিল না। রাজা মানসিংহের উচ্চতর মনসবের প্রতি ঈর্ষান্বিত রাজা রামদাস কচ্ছবাহ আগ্রা দুর্গের রাজকোষ-রক্ষক। তিনি কয়েক ঘণ্টা খসরু পক্ষীয়গণকে ঠেকাইয়া না রাখিলে কুমার সেলিম সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইতেন। ইহার পর খসরু বিদ্রোহী হইয়া পিতার হাতে চোখ এবং বৈমাত্রের ভ্রাতা খুরমের হাতে প্রাণ হারাইলেন। রাজপুত-বৈরের জন্য ইহাই মোগল সাম্রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম ভাগ্যবিপর্যয়। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধে মীর্জা রাজা জয়সিংহ ও মহারাজা যশোবন্তের কুলক্রমাগত বৈর দারার পরাজয় ও মৃত্যু ঘটাইয়া হিন্দুকে "পুনর্মূষিকোভব"

করিল। আওরঙ্গজেবের হাতে আকবরের সাম্রাজ্য তুলিয়া দিয়া মীর্জা রাজা নিজে ডুবিলেন, এবং অবশেষে হিন্দুকেও মজাইলেন।

১৩

সার্বভৌম মোগল শক্তি রাজপুতানাকে শোষণ করে নাই, রাজপুতকে দুর্বল ও ও অকর্মণ্য করে নাই। রাজপুতনার উপর কাগজে-কলমে যে রাজস্ব ধার্য ছিল উহা রাজপুত মনসবদারগণের বেতন জায়গীর ইনাম বাবদ খরচ হইয়া বাদশাহী তহবিলেও টান পড়িত। মোট কথা, এই সময়ে রাজপুতানা পরোক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, রাজপুতানার বাহিরে রাজপুত আত্মপ্রসারের সুযোগ পাইয়াছে, মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক উপনিবেশ হিসাবে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে রাজপুত জায়গীরদারগণ সামন্তরাজ্য স্থাপন করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজস্থান তথা সমগ্র উত্তর ভারতে মারাঠা সার্বভৌমত্বের নামে যে অরাজকতা, শাসনের নামে যে অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ চলিয়াছিল উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী রাজপুত। রাজপুতানায় মারাঠা-প্রভুত্ব অশান্তি ও কুল-বৈরে ইন্ধন যোগাইয়াছে, রাজপুতকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছে। মহারাজাধিরাজ সওয়াই জয়সিংহ অতি কুক্ষণে নর্মদাতীর হইতে খাল কাটিয়া মারাঠা কুমীরকে সিপ্রানদীতে আনিয়াছিলেন; মহারাণা জগৎ সিংহ ১৭৪৭ খৃঃ জয়পুরের উপর শোধ তুলিবার জন্য কুমীরকে রাজপুতানায় আনিলেন; কুমীর দেববিগ্রহ ব্যতীত রাজপুতনার সবকিছু গ্রাস করিয়াও তৃপ্ত হইল না। অবশেষে মিবাড়ের মহালক্ষ্মী কৃষ্ণকুমারীকে বলি কামনা করিল।

১৪

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মিবাড়-মারবাড, বুন্দী-জয়পুর এই রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রাচীন বৈর চরমে উঠিয়াছিল; প্রত্যেক রাজ্যের ভিতরে-বাহিরে নৃশংস রাজপুত বৈরের তাণ্ডব। চুণ্ডাবত এবং শক্তাবত কুলের বৈর লইয়াই মিবাড়ের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস। বৈরের প্রধান কারণ, রাজদরবারে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অকর্মণ্য মহারাণাগণের অনুগ্রহ বিতরণে বৈষম্য, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কুলের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি, এবং মহারাণার জন্য প্রাণত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত

থাকিলেও জ্ঞাতিশত্রুর সহিত আপোষ-মীমাংসায় অনিচ্ছা। যে মিবাড়রাজ্য মোগল সম্রাটকে নগদ এক টাকা রাজস্ব দেয় নাই সেই রাজ্য হইতে কুল-বৈরের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মহারাণা দ্বিতীয় জগৎ সিংহের সময় হইতে দ্বিতীয় অরিসিংহের মৃত্যু পর্যন্ত ছাব্বিশ বৎসরে (১৭৪৭-১৭৭৩ * নগদ দণ্ড এক কোটি একাশী লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা আয়ের পরগণা মারাঠাগণ লইয়া গিয়াছিল। ‡

নাবালক মহারাণা ভীমসিংহ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মিবাড়ের গদিতে বসিয়াছিলেন। চিতোর এই সময়ে চুণ্ডাবতগণের অধিকারে, চুণ্ডাবত সর্দারগণ মহারাণার অভিভাবক, শক্তাবত প্রধানগণ চুণ্ডাবতের বিরোধী। চুণ্ডাবতগণ ক্ষমতা হাতে পাইয়া শক্তাবতগণকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

মহারাণার আজ্ঞা পাইয়া কুরাবড ঠিকানার রাবত অর্জুন সিংহ শক্তাবতপ্রধান মুহকম সিংহের ভীণ্ডর দুর্গ অবরোধ করিলেন। অর্জুন সিংহের অনুপস্থিতির সুযোগে রাবত লালসিংহ শক্তাবতের পুত্র সংগ্রাম সিংহ কুরাবডের পশুহরণ করিবার জন্য হানা দিলেন, যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের বর্শার আঘাতে অর্জুন সিংহের পুত্র জালিম সিংহ নিহত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া অর্জুন সিংহ মাথার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া বৈশ্যের দাড়-পাকানো কাপড়ের "ফেঁটা" বাঁধিয়া শপথ করিলেন যতদিন পুত্র-রক্তের বৈর শোধ না হয় ততদিন পাগড়ি বাঁধিবেন না। তিনি একদিন অতর্কিতে সংগ্রাম সিংহের অনুপস্থিতিতে তাঁহার গিরিদুর্গ শিবগড় আক্রমণ করিলেন। সংগ্রাম সিংহের বৃদ্ধ পিতা লালসিংহ অসিহস্তে বীরগতি লাভ করিলেন, সংগ্রাম সিংহের শিশুসন্তানগুলিকে ক্রোধান্ধ চুণ্ডাবত অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া মাথায় পাগড়ি বাঁধিলেন। চুণ্ডাবতের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল, ডুবিতে বিলম্ব হইল না। রাজমাতা সর্দারকুঁয়ারী তাঁহার মন্থরা রামপিয়ারীর মন্ত্রণায় অন্তঃপুরের দেউরীরক্ষক সোমচাঁদ গান্ধীকে রাজ্যের সর্বেসর্বা প্রধান নিযুক্ত করিলেন। মহারাণা স্বয়ং ভীণ্ডর দুর্গে পদার্পণ করিয়া শক্তাবতকুলপতি মুহকম সিংহকে উদয়পুরে লইয়া আসিলেন। ইহার পূর্বে মুহকম সিংহ বিশ বৎসর যাবৎ চুণ্ডাবত প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উদয়পুরের মুখ দেখেন নাই। রাজদরবারে শক্তাবতগণের জয়-

* ওঝা রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯৮১

‡ মহারাণা অরিসিংহের রাজ্যারোহণ ১৭৬১ খৃঃ মারাঠার সহিত সন্ধি ১৭৪৭ খৃঃ। জয়পুরের গদীতে নিজ দৌহিত্রকে অন্যায় ভাবে বসাইবার জন্য তিনি মারাঠাগণকে রাজপুতানায় ডাকিয়া আনিয়া সর্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন। ইহা রাজপুত-বৈরের শোচনীয় পরিণাম।

অন্ধকার হইল এবং সোমচাঁদ গান্ধীর শাসনক্ষমতা ও নীতিনিপুণতায় নিমজ্জমান মিবাড় কিছুদিনের জন্য মারাঠা কবল হইতে রক্ষা পাইল। সোমচাঁদ মারাঠাগণের বিরুদ্ধে রাজপুতগণকে সাময়িকভাবে একতাবদ্ধ করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে লালসোটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মাহাদজী সিন্ধিয়ার পরাজয় ঘটাইয়াছিলেন। চুণ্ডাবত ইঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে সাহস করে নাই। কিছুদিন পরে কুরাবড়ের রাবত অর্জুন সিংহ এবং চাবণ্ড ঠিকানার চুণ্ডাবত ঠাকুর সর্দার সিংহ রাজমাতার সহিত দেখা করিবার জন্য অন্তঃপুরে গিয়েছিলেন। ঐখানে সোমচাঁদ গান্ধীকে একাকী দেখিতে পাইয়া চুণ্ডাবতদ্বয় পরামর্শ করিবার অছিলায় তাঁহাকে কিছু অন্তরালে লইয়া গেলেন। "আমাদের জায়গীর ছিনাইয়া লইবার সাহস তোমার কেমন করিয়া হইল?" এই বলিয়া হঠাৎ দুইজনে দুই দিক্ হইতে তরবারির আঘাত করিয়া সোমচাঁদ গান্ধীকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। হত্যার পর রক্তাক্ত তরবারি হাতে অর্জুন সিংহ মহারাণার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তিরস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। (২৪শে অক্টোবর ১৭৮৯ খৃঃ)। মহারাণা ভীমসিংহ মৃত সোমচাঁদের ছোট ভাই সতীদাস এবং শিবদাস গান্ধীকে প্রধান এবং উপ-প্রধান নিযুক্ত করিলেন। শক্তাবতগণকে সহায় করিয়া অহিংসাবাদী গন্ধবণিকদ্বয় চুণ্ডাবতগণের উপর বৈরের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত মিবাড়ের গৃহ-বৈরে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। চিতোরের নিকট এক যুদ্ধে শক্তাবতকুল চুণ্ডাবতগণকে পরাজিত করিল; চুণ্ডাবতগণ পাল্টা আক্রমণ করিয়া খেরোদার নিকট পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলিল। তুল্যবল এই কুলদ্বয়ের বৈরাগ্নিতে মিবাড় উজাড় হইতে লাগিল, চাষা তাঁতি মজুরের দল দেশ ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। সতীদাস বৈরান্ধ হইয়া চুণ্ডাবতগণকে দমন করিবার জন্য মাহাদজী সিন্ধিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন; মহারাণা কার্যতঃ সিন্ধিয়ার অধীন হইয়া গেলেন, সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি অম্বাজী ইংলিয়া শাসনকার্যে সর্বেসর্বা হইলেন। এই সন্ধির, শর্তানুসারে চুণ্ডাবতগণের উপর চৌষট্টি লাখ টাকা জরিমানা ধার্য হইল; উশুল হইলে আটচল্লিশ লাখ সিন্ধিয়া এবং ছত্রিশলাখ মহারাণা লইবেন।

সরকারী ক্রোকপিয়াদার শ্বশুরবাড়ী নাই; সুতরাং প্রথম চোটে মারাঠা প্রতিনিধি চুণ্ডাবত ও শক্তাবত উভয় কুলের নিকট হইতে যথাক্রমে বারো লাখ ও আট লাখ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া সিন্ধিয়ার তহবিলে জমা দিলেন, মহারাণা কিছুই পাইলেন না। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়া অম্বাজী ইংলিয়াকে উদয়পুর হইতে অন্যত্র বদলী করিয়া গণেশ পন্তকে উদয়পুরে প্রেরণ করিলেন। শক্তাবত তাঁহার সাহায্যে কুণ্ডাবত কুলের কুরাবড় ঠিকানা অধিকার করিয়া সালুম্বর

দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। চুণ্ডাবত অজিত সিংহ অম্বাজীর শরণাপন্ন হইয়া মারাঠাদিগকে চুণ্ডাবতগণের পক্ষে আনিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের চুণ্ডাবত পক্ষ ক্ষমতা হাতে পাইয়া সতীদাস এবং সোমচাঁদের পুত্র জয়চন্দ্রকে কারাবদ্ধ করিল এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চুণ্ডাবত প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। ইতিমধ্যে শক্তাবতগণ মিবাড়ের মারাঠা সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে বিরোধের সুযোগ লইয়া উদয়পুর দরবারে আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সতীদাস গান্ধী প্রধান নিযুক্ত হইয়া সোমচাঁদের অপর হত্যাকারী রাবত প্রতাপ সিংহ চুণ্ডাবতের উপর প্রতিশোধ লইলেন। রাবত সর্দার সিংহ বাকী বেতনের জামিন হিসাবে পাঠান সিপাহীগণের ডেরায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সতীদাস ও জয়চন্দ্র পাঠানদের বেতন চুকাইয়া দিয়া সর্দার সিংহকে কিনিয়া লইল এবং এক নদীর কিনারায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল, তিনদিন পর্যন্ত কাহাকেও লাশ উঠাইতে দিল না। চাকা আবার ঘুরিল। কিছুদিন পরে চুণ্ডাবতগণ প্রবল হইয়া বন্দী সতীদাস ও পলাতক ভ্রাতুষ্পুত্র জয়চন্দ্রকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া রাবত সর্দার সিংহের বৈরঋণ শোধ করিল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের ইহাই ঐতিহাসিক পটভূমি।

১৫

যোধপুরের মহারাজা ভীমসিংহের সহিত ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ কৃষ্ণকুমারীর বাগদান হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রাঠোর ভীমসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার শত্রু এবং পিতৃব্যপুত্র মানসিংহ রাঠোর যোধপুরের গদিতে বসিয়াছিলেন। ভীমসিংহের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে জয়পুরের মহারাজা জগৎ সিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বাগদান হইল, এবং জয়পুরের দূত বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উদয়পুরে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সহিত এই সময়ে দেনা-পাওনা লইয়া জয়পুরের সহিত বিবাদ চলিতেছিল। জগৎ সিংহের নিকট টাকা না পাইয়া জয়পুরকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়া মহারাণাকে লিখিলেন, বিবাহের প্রস্তাব লইয়া জয়পুর হইতে যে দূত ঐখানে গিয়াছে তাহাকে পত্রপাঠ বিদায় দিতে হইবে। মহারাণা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় স্বয়ং দৌলতরাও সসৈন্যে উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। উদয়পুরের নিকট যুদ্ধে মহারাণা পরাজিত হইয়া দৌলতরাওর অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। একলিঙ্গজীর মন্দিরে মহারাণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দৌলতরাও চলিয়া আসিলেন। সিন্ধিয়া

কেবলমাত্র জগৎ সিংহের নিকট হইতে মোটা টাকা আদায় করিবার জন্য এই ফিকির করিয়াছিলেন, টাকা আদায় হইলে এই বিবাহে মারাঠার অন্য আপত্তি ছিল না।

এই সময়ে যোধপুরের অধীন পোহ্‌করণের বিদ্রোহী রাঠোর সামন্ত ঠাকুর সওয়াই সিংহ তাঁহার পৌত্রীর সহিত জয়পুরের মহারাজা জগৎ সিংহের সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য এবং আরও গূঢ়তর উদ্দেশ্যে জয়পুরে আসিয়াছিলেন। এই খবর পাইয়া মহারাজা মানসিংহ রাঠোর ঠাকুর সওয়াই সিংহকে লিখিলেন, যদি পৌত্রীকে জয়পুর লইয়া গিয়া বিবাহ দাও তাহা হইলে রাঠোরকুলের মহা অপমান (হতক্) হইবে। প্রত্যুত্তরে সওয়াই সিংহ কড়া জবাব দিলেন, রাঠোরের বাগদত্তা কন্যাকে (কৃষ্ণকুমারী) কচ্ছবাহ নৃপতি বিবাহ করিতে যাইতেছেন, ইহাতে রাঠোরকুলের হতক্ নাই, আর আমার পৌত্রীর বেলা হতক্? পত্র পাইয়া মদান্ধ মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বধূরূপে দাবি করিয়া রাঠোরসেনাসহ বিবাহের সাজে উদয়পুর সীমান্তে পর্বতসর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনুরূপ বরসজ্জায় মহারাজা জগৎ সিংহ এবং আমীর খাঁ পর্বতসরে আসিলেন। যুদ্ধে রাঠোরের শোচনীয় পরাজয় হইল, পলাতক মানসিংহ যোধপুরের ফটক বন্ধ করিয়া রহিলেন। যুদ্ধের পর বিচক্ষণ রাজনৈতিক জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী হরগোবিন্দ নাটানী পরামর্শ দিলেন প্রথমে উদয়পুরে বিবাহ সম্পন্ন করিয়া জয়পুরে ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাঠোরের প্রতি বৈরান্ধ কচ্ছবাহের ইহা মনঃপূত হইল না, আগে রাঠোরের সঙ্গে বহুদিন সঞ্চিত বৈরের হিসাব-নিকাশ, বিবাহ পরের কথা। ঠাকুর সওয়াই সিংহ রাঠোর জগৎ সিংহকে বুঝাইলেন, প্রধান প্রধান রাঠোর সামন্তের অপ্রীতিভাজন অত্যাচারী মানসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার এই উত্তম সুযোগ। যুদ্ধে মহারাজা জগৎ সিংহের দক্ষিণ হস্ত আমীর খাঁ পাঠান ভাবিলেন, উদয়পুরে বিবাহের বরযাত্রী হওয়া অপেক্ষা মারবাড় লুঠেই লাভ অধিক। আমীর খাঁ মারবাড় আক্রমণের পক্ষে মত দিলেন; জয়পুর বাহিনী যোধপুর অবরোধ করিয়া মানসিংহ রাঠোরের অবস্থা কাহিল করিয়া তুলিল। আমীর খাঁর দস্যু সেনার ভয়ে সামন্তগণ মানসিংহের সাহায্যার্থ আসিতে সাহসী হইল না, কয়েকদিনের মধ্যে যোধপুরের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন গোপনে জয়পুর শিবির হইতে পিণ্ডারীর দল লইয়া আমীর খাঁ উধাও হইলেন। দুই দিন পরে তিনি জয়পুরের বাহিরে ডেরা করিয়া শহর দখল করিবার উপক্রম করিলেন। মহারাজা জগৎ সিংহের জন্নী কয়েক থানা,

আশরফী হীরা-জহরত সাজাইয়া উহার উপর নিজের ওড়নাখানা রাখিয়া দাসীগণের হাতে আমীরের কাছে পাঠাইয়া আবেদন জানাইলেন, আমীরের সঙ্গে লড়াই করিবার মত মরদ এখন জয়পুরে নাই, তাঁহার সম্মানার্থ কিছু নজর জয়পুরের তরফ হইতে পেশ করা হইল। আমীর খাঁ ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র ওড়নাখানা থালা হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের মাথায় বাঁধিলেন এবং রাজভগ্নীকে রাম রাম জানাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন—যেখানে মরদ আছে সেইখানে আমি লড়াইয়ের তালাশে চলিলাম, জয়পুরের কোন ভয় নাই, বহিনজী হুকুম করিলেই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইব।

যেমন বিদ্যুৎ গতিতে আসিয়াছিলেন তেমনই ভাবে আমীর খাঁ জয়পুর হইতে যোধপুর ফিরিয়া আসিলেন, ইতিমধ্যে জগৎ সিংহ যোধপুরের অবরোধ উঠাইয়া জয়পুর রক্ষার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। আমীর খাঁ পূর্বেই বিনা নোটিসে রাতারাতি জয়পুরের চাকরি ইস্তফা দিয়াছিলেন। ইহার জন্য নগদ মোটা টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহার তোপখানা ও কয়েক হাজার সওয়ার সমেত তাঁহাকে জয়পুর অপেক্ষা অধিক বেতনে যোধপুর সরকারের চাকুরিতে লওয়া হইয়াছিল। আমীর খাঁ যোধপুরে ফিরিয়া নগদ তিন লক্ষ টাকা এবং বহু উপঢৌকন পাইলেন, মহারাজা এবং রোহিলা আফ্রিদী পাঠান পাগড়ি-বদল "ভাই" হইলেন। আমীর খাঁ মিথ্যা দাবিদার (Pretender) ধনকুল সিংহের পক্ষকে নির্মূল করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া নাগোরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। নাগোর হইতে দশমাইল দূরে শিবির স্থাপন করিয়া তিনি নাগোরের পীর তর্থানের দরগা দর্শনের অজুহাতে ঐখানে গিয়া ধনকুল সিংহের অভিভাবক ও সর্বেসর্বা পোহ্করণ সামন্ত সওয়াই সিংহের সঙ্গে দেখা করিলেন। ধনকুল সিংহকে আমীর খাঁ যোধপুরের গদিতে বসাইয়া দিলে বিশলক্ষ টাকা পাইবেন এই শর্তে কথাবার্তা করিয়া তিনি সওয়াই সিংহের পাগড়ি-বদল ভাই হইলে এবং কোরাণ ছুঁইয়া ধনকুল সিংহের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। বিদায়ের সময় আমীর খাঁ সওয়াই সিংহ এবং সমস্ত রাঠোরগণকে তাঁহার ডেরায় পরের দিন এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পাঁচশত রাঠোর সর্দার সঙ্গে লইয়া সওয়াই সিংহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। নাচ গান শরাব আফিমে যখন সকলেই মশগুল তখন রাঠোরগণের মাথার উপর তাঁবু চাপা পড়িল, একজনও পলাইতে পারিল না (বিঃ ১৮৬৪, ১৭শে চৈত্র=১৮০৮)। আমীর খাঁ মারবাড়ে কার্যতঃ পাঠান অধিকার স্থাপন করিলেন, এবং মন্ত্রী ইন্দ্ররাজ এবং রাজগুরু দীননাথের

শত্রুগণের নিকট হইতে সাত লক্ষ টাকা লইয়া ঐ দুইজনের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহার পর মহারাজা মানসিংহের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কিছুদিন পরে মানসিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বদমায়েশি করিতে গিয়া মারা পড়িল, মানসিংহ সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গেলেন। আমীর খাঁ এই পাগলের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দেওয়ার অজুহাতে বিরাট সেনা লইয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিবাড় আক্রমণ করিলেন।

১৬

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শেষের দিকে আমীর খাঁর পাঠান সেনা দুই দিক হইতে উদয়পুর আক্রমণ করিল। এক ভাগ স্বয়ং আমীর খাঁর অধীনে দেবারী গিরিবর্ত্মের পথে, অন্য ভাগ তাঁহার জামাতা জমশিদ খাঁর নেতৃত্বে চীরবার রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। আমীর খাঁ শাসাইলেন এগার লক্ষ টাকা না পাইলে একলিঙ্গজীর মন্দির ধ্বংস করিবেন। কিন্তু একলিঙ্গজীকে রক্ষা করিবে কে? চুণ্ডাবতগণ কয়েক বৎসর পূর্বে শক্তাবতগণকে দরবারে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল, একলিঙ্গজীর রক্ষার্থ শক্তাবতকুল চুণ্ডাবতের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবে না। রাঠোর ঝালা চৌহান ও চুণ্ডাবতকুলকে লইয়া মহারাণা ভীম সিংহ যুদ্ধে নামিলেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুর সহিত এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এগার লক্ষ টাকার দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, অথচ রাজকোষ শূন্য। যাহাদিগকে জামিন দেওয়া হইয়াছিল উঁহাদের উপর উপর কাবুলী জুলুম আরম্ভ হইল। চুণ্ডাবত অজিত সিংহ মহারাণার প্রতিনিধি হিসাবে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ অজিত সিংহকে জানাইলেন, কৃষ্ণকুমারীকে হয় যোধপুরে বিবাহ, না হয় ভীম সিংহের কন্যার মৃত্যু ব্যতীত যুদ্ধ-বিরতি নাই, উদয়পুর ধ্বংসের পূর্বে পাঠান সেনা মিবাড় ত্যাগ করিবে না। অজিত সিংহ এই দারুণ সংবাদ মহারাণাকে জানাইলেন। পাঠানের উৎপীড়ন ও সন্ধির কথাবার্তা যুগপৎভাবে চলিতে চলিতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। মহারাণা প্রতাপ কিংবা রাজসিংহের মত মহারাণা ভীমসিংহ আরাবলীর দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিলেন না কেন? ঐ পথ তখনও উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মহারাণা কেবল নামে ভীম, সন্তান উৎপাদনে বাপ্পা রাওয়ের সমকক্ষ অর্থাৎ পাঁচ কম এক শত সন্তানের জনক। দ্বিতীয় কথা, ঐ অঞ্চল তখন সম্পূর্ণ শক্তাবত কুলের জায়গীর, মহারাণার সহিত চুণ্ডাবত সর্প-বিবরে প্রবেশ করিতে পারে, শক্তাবত কুলের আশ্রয়প্রার্থী হইতে পারে না। তৃতীয় কথা, আমীর খাঁ

এমন করিয়া উদয়পুরের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে রাজপুত ভাবিবার অবসর পায় নাই।

২১ জুলাই (১৮১০ খৃষ্টাব্দ) উদয়পুর প্রাসাদে শেষ মীমাংসার জন্য দরবার বসিল। মহারাণা তাঁহার রাজকীয় ছুরিকা সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই ছুরিকার দ্বারা কৃষ্ণকুমারীকে কেহ হত্যা করিয়া শিশোদিয়া বংশের কুলমান রক্ষা করুক। ঘৃণা-লজ্জায় সকলে বিনানুমতিতে দরবার ত্যাগ করিলেন, তাঁহারা প্রাণ দিতে আসিয়াছিলেন, শত্রু ব্যতীত কাহারও প্রাণ লইতে আসেন নাই। মহারাণা তাঁহার নিকট জ্ঞাতি ভৈরব সিংহোত শাখার বৃদ্ধ মহারাজা দৌলত সিংহকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই কার্য সমাধা করিতে বলিলেন। ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া দৌলত সিংহ গর্জিয়া উঠিলেন—যিনি এই রকম আদেশ দিতে পারেন, তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলাই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। নিরপরাধ বালিকার উপর অস্ত্রাঘাত আমার কার্য নহে, ঘাতকের কাজ।

এই বলিয়া দৌলত সিংহ মহারাণাকে সমীহ না করিয়া চলিয়া গেলেন; অথচ বিলম্ব করিবার সময় নাই, আমীর খাঁর চর কৃতান্তের মত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহার পিতা দ্বিতীয় অরিসিংহের রক্ষিতা দাসীর পূর্ব পতির ঔরসজাত পাপিষ্ঠ জবানদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জবানদাস আজন্ম জল্লাদ অপেক্ষাও নরহত্যায় অধিক উৎসাহী। জবানদাস ছুরিকা গ্রহণ করিয়া অকম্পিত চিত্তে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিল, রাজমাতা সর্দারকুঁয়ারীর করুণ ক্রন্দনে পাষাণ গলিলেও জবানদাসের হৃদয় গলিল না। তাঁহার উপর ব্রহ্মশাপ পড়িয়াছিল। তাঁহার কর্মের ফলে মিবাড়ের এই দুর্দশা। স্বামীর বিশ্বস্ত প্রধান-মন্ত্রী অমরচাঁদ বড়বাকে তিনি নিজের দাসী রামপিয়ারীর দ্বারা অপমানিত করিয়াছিলেন, বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করাইয়াছিলেন। তিনি নিজের নিরঙ্কুশ আধিপত্য রক্ষার নিমিত্ত সর্ববিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, পুত্রগণকে নিজের দুরাকাঙ্ক্ষার ক্রীড়াপুতুল করিয়া রাখিয়াছিলেন, একবার চুণ্ডাবত একবার শক্তাবতকে প্রশ্রয় দিয়া উভয় কুলের মধ্যে অহি-নকুল সংগ্রামের তামাশা দেখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী মহাকাল বধূর অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাবলীল চরণক্ষেপে মহাযাত্রা করিলেন। ষোড়শী কৃষ্ণকুমারীর অপ্সরাদুর্লভ রূপচ্ছটায় উদ্ভাসিত শান্ত-সৌম্য বরাভয়দায়িনী মূর্তির সম্মুখে ঘাতক কিছুক্ষণ অসাড় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার সর্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল, ছুরিকা মুষ্টি হইতে ভূপতিত হইল; ঊষার উদয়ে নিশান্তরের অন্ধকারের মত জবানদাস কোথায়

অদৃশ্য হইয়া গেল কেহ দেখিতে পাইল না। অমরীকে তবুও মরিতে হইবে। শূন্য দরবার গৃহে সংবাদের জন্য পিতা অস্থির, দুয়ারে শত্রুর দূত অসহিষ্ণু।

কৃষ্ণকুমারী ভিতরে আসিয়া মৃত্যুর বাসরশয্যায় বসিয়া বিষের পেয়ালার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, গগনভেদী ক্রন্দনের রোল তাঁহার কানে পৌছল না, রোরুদ্যমানা জননীর কাতরতা দেখিয়া চোখে জল আসিল না, নির্বাত, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় তাঁহার আননশ্রী দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চাপোৎকট বংশীয়া (চাবড়া) জননীকে ক্ষত্রিয় দুহিতার উপযুক্ত প্রবোধ দিয়া, পিতাকে ভক্তি নিবেদন ও আশীর্বাদ করিয়া বিষের প্রথম পেয়ালা তিনি অমৃত জ্ঞানে সন্তোষের সহিত পান করিলেন। পাপের বিষ কুমারীর পুণ্যদেহে অতিষ্ঠ হইয়া কিছুক্ষণ পরে বমির সহিত বাহির হইয়া আসিল। এইভাবে তাঁহাকে পর পর তিনবার বিষ দেওয়া হইল, তিনবার বমি হইয়া গেল। অবশেষে বমন নিবারক ও শৈত্যগুণ বিশিষ্ট কুসুমফুলের (safflower) রসের সহিত মারাত্মক পরিমাণে আফিম গুলিয়া কৃষ্ণকুমারীকে দেওয়া হইল, ম্লান হাসির সহিত উহা পান করিয়া তিনি ঢলিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণকুমারী রাজপুত-বৈর সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল পান করিয়া আজ হইতে ১৫২ বৎসর পূর্বে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভারত-জননীর সর্বাঙ্গ এখনও ভারত সন্তানগণের অন্তর্বৈর বিষে জর্জরিত। ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে বৈর, নিত্য-নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় জন্মলাভ করিয়া কেবল বৈর বৃদ্ধি করিতেছে। "নাই" বলিলে না কি সাপের বিষও থাকে না, এইজন্য রামদাস বাবাজী মহাশত্রুঘ্ন এই "নাই" মন্ত্র জপের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন ভারতে ইতিহাস-চর্চা উক্ত শত্রুঘ্ন মন্ত্রের বিষ্ণুভারাক্রান্ত মৈত্রেয় টীকাভাষ্য। আমাদের বৈর-মুক্তিকামনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী নির্জিত বৈরের গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন, তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে বৈর কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। শাক দিয়া মাছ ঢাকা আর কতদিন চলিবে? বিক্রমোর্বশীয় নাটকের রাণী ঔশীনরীর ন্যায় দরবারী ঐতিহাসিকদের "প্রিয়প্রসাদন" ব্রতের সমাপ্তি কতদিনে হইবে?

মুসলমান সভ্যতার ধারা ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চা

ইসলাম বলিতেই ইতিহাসের সহিত অপরিচিত অমুসলমানের মনে ধ্বংসের বিরাট মূর্তি ভাসিয়া উঠে। বস্তুতঃ, ইসলামের অভ্যুত্থান যেন প্রলয়ের মহাপ্লাবন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সহসা ইহার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস আরব মরুর বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া বিধাতার রুদ্ররোষের ন্যায় পূর্ব-রোম বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের উপর প্রচণ্ড বেগে আপতিত হইল। আরব জাতির এই বিপুল বিজয় অভিযান ও ইসলাম-প্রচারকে কোন কোন ঐতিহাসিক গথ, ভাণ্ডাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি কর্তৃক পশ্চিম-রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আরব জাতি ও উক্ত জাতিসমূহের প্রসারকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কেননা, গথ ভাণ্ডাল প্রভৃতির পশ্চিম দক্ষিণ ইউরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস উপচিত জনশক্তির মহাপ্লাবন ছাড়া আর কিছুই নহে। এ সমস্ত জাতির কোন অন্তপ্রেরণা ছিল না, জগৎকে তাহাদের নূতন কিছু দেওয়ার ছিল না। কিন্তু ইসলাম এশিয়ার ফরাসীবিপ্লব, আরব জাতি এ বিপ্লবের অগ্রদূত। ইসলামের বিজয় প্রাচীন সভ্যতার রাহুগ্রাস কিংবা বর্বর পশুবলের তাণ্ডব নহে। পৌত্তলিকতা ও পৌরোহিত্যবর্জিত উন্নততর একেশ্বরবাদ, সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনব ধর্মরাজ্যের আদর্শ লইয়া মুসলমান বিশ্ববিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল। নূতনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতনের পরাজয় ও আংশিক ধ্বংস অনিবার্য। যে-কারণে রাজন্যপ্রধান ও রাজশাসিত ইউরোপ ফরাসী-বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই সমসাময়িক পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য, পারস্য ও হিন্দুস্থান ইসলামের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।

মানব-আত্মার যেমন ধ্বংস নাই, তেমনি জাতির আত্মা-স্বরূপ সভ্যতারও সম্যক বিনাশ নাই। ইহা জরাজীর্ণ ক্ষয়রোগগ্রস্ত জাতিকে ত্যাগ করিয়া নূতন জাতিকে বরণ করে। বিজিত জাতির সভ্যতা অপেক্ষাকৃত কম সভ্য বিজেতাগণকে প্রায়ই জয় করিয়া থাকে। মুসলমান গ্রীস জয় করিবার বহুশতাব্দী পূর্বে গ্রীক-জ্ঞানচর্চা মুসলমান-রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানেরা সঙ্গীত ও দর্শনকে বনাম গ্রীস হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। সঙ্গীত ও দর্শনকে আরবী ভাষায় মুসিকি ও ফলসফা বলা হইয়াছে। আরিস্তু (Aristotle), আফলাতুন্ (Plato) ও

জালিনুস্ (Galen) গ্রীক হইলেও মুসলমানেরা নিতান্ত আপনার করিয়া লইয়াছে। জ্ঞানরাজ্যে মুসলমান জাতিভেদ ও ধর্ম-বৈষম্য বিচার করে নাই। সমস্ত বিজিত জাতির জ্ঞানভাণ্ডার অনুসন্ধান ও উদ্ধার করিয়া মুসলমান উহার সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ মুসলমান কর্তৃক প্রাচীন জ্ঞানচর্চা এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমান সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

হজরত মহম্মদের পরবর্তী প্রথম খলিফা-চতুষ্টয়ের রাজ্যকালকে (হিঃ ১১-৪১) ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়। উহা ধর্মনিষ্ঠার সত্যযুগ, কিন্তু সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চার শৈশব মাত্র। মরুবাসী আরব সবেমাত্র তখন শহুরে হইয়াছে; লুঙ্গী-চাদর ছাড়িয়া সুসভ্য ইরানীয়দের অনুকরণে পায়জামা, মোজা টুপী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পয়গম্বরের সময় মক্কা-মদিনায় যে-কয়জন লেখাপড়া জানিত তাহাদের সংখ্যা হাতের আঙুলে গণনা করা যাইত। এ-সময়েও অবস্থা সেইরূপই ছিল। কোরাণশরীফ, জেহাদ ও বেহেশ্‌ত্‌ (স্বর্গ) ছাড়া অন্য কোন বিষয় তখন খাঁটি মুসলমানের চিন্তার অতীত ছিল। আরবদের মধ্যে একদল ছিল কপটাচারী (মোনাফেক্‌); সুবিধাবাদ ছাড়া অন্য কোন ধর্মবিশ্বাস তাহাদের ছিল না। তাহারা সুজলা সুফলা সিরিয়া, মিশর ও ইরাকের সুরম্য উদ্যানবাটিকায় বিজয়লব্ধ ঐশ্বর্য ও নারী-সৌন্দর্যে ভূস্বর্গ সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর। মহাত্মা আলীর মৃত্যুর পর ওম্মীয়গণ খেলাফৎ অধিকার করিল। ইহারা ছিল নামেমাত্র মুসলমান; অধিকাংশই হজরত কর্তৃক মক্কা-অধিকারের পর দায়ে ঠেকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ওম্মীয়গণের শতবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল সাম্রাজ্যগর্বিত আরব জাতির বীরত্ব-গৌরবে উদ্ভাসিত হইলেও উহা নিরঙ্কুশ ভোগলালসার আবিল প্রবাহে কলঙ্কিত। মুসলমানেরা ওম্মীয় খেলাফতকে ন্যায়হীন ধর্মহীন যথেচ্ছাচার এবং পাপ ও ব্যভিচারের যুগ বলিয়া থাকেন। আরব জাতির নৈতিক জীবনে ইহা যেন ইসলাম-প্রতিষ্ঠিত সংযমের কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ চিরস্বাধীন, ভোগলোলুপ, অতৃপ্ত বেদুইন প্রকৃতির বিদ্রোহ—মুসলমান সাম্রাজ্যে 'পিউরিটান রেজিম'-এর পর 'রেস্টোরেশান'।

দ্বিতীয় ওমর ও হিশাম ব্যতীত এই বংশের খলিফাগণ প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতেন। দ্বিতীয় বলিদ (Walid) একটি শরাবের চৌবাচ্চা তৈয়ার করাইয়াছিলেন। উহাতে ডুব-সাঁতার দিয়া মদ খাওয়াই ছিল তাঁহার পরম আনন্দ। তাঁহার হাতে কোরাণশরীফেরও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। একদিন কোন কারণে তিনি তীরধনু লইয়া কোরাণের উপর চাঁদমারী (target) করিতে আরম্ভ

করেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার কবিতার একছত্র—

"When thou meetest the Lord on the last judgment morn,
Then cry unto God 'By Walid I was torn.'*

একমাত্র দ্বিতীয় ওমর ছাড়া এ-বংশের কোন খলিফা বিজিত জাতিদের মধ্যে ইসলাম-প্রচারের কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে নিয়ম ছিল, শুধু কল্‌মা পড়িলে কেহ মুসলমান হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সুন্নৎ হওয়া চাই। কিন্তু এত করিয়াও আরব ছাড়া অন্য জাতীয় অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সময়ে জিম্মিরা জিজিয়া বা মুণ্ডকর হইতে রেহাই পাইত না। ইসলামের অনুশাসন না মানিলেও আরবেরা ইসলামকে তাহাদের মৌরসী সম্পত্তি মনে করিত। আরব ছাডা অন্য কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ করুক ইহা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। সঙ্গীত, প্রাচীন আরব কবিতা, মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্তী খলিফা-চতুষ্টয় ছাড়া অন্য বিষয়ক, যথা—প্রাচীন পারস্য ও দক্ষিণ-আরবের রাজ-বংশের ইতিহাস ও যুদ্ধকাহিনী —তাঁহাদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হইত। তাঁহাদের ধারণা ছিল, মরুবাসী বেদুইনের তাঁবুই প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। সেজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শিক্ষাসমাপ্তির জন্য রাজপুত্রদিগকে নিরক্ষর বেদুইনদের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। লেখাপড়া ও স্কুলমাস্টারকে আরবেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত, কেননা, প্রাচীন রোমে যেমন গ্রীক ক্রীতদাসগণ শিক্ষকতা করিত, প্রধান প্রধান শহরে এই সময় মাওয়ালারাই ছেলে পডাইত। এজন্য একটি চলিত কথা ছিল— তাঁতী ও মাস্টারের মূর্খতা। এই সময় প্রকৃতপক্ষে আরবেরা অর্ধসভ্য অবস্থায় ছিল। রাজ্যের হিসাবনিকাশ কিংবা কোন দপ্তরে আরবদের চাকরি দেওয়া হইত না। যে-দেশের মাটিতে চাষ হয় না, যে জাতি যতদিন কৃষিকে অবজ্ঞা করে ততদিন সে-দেশে সভ্যতার অভ্যুদয় হয় না। বাস্তবিকপক্ষে আরব সভ্যতা বলিয়া কোন বস্তু নাই। আরবের মরুবেষ্টনীর বাহিরে প্রাচীন আসীরিয় বাবিলনীয় ও ইরানীয় সভ্যতার মহামিলন-ক্ষেত্র তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে যে সভ্যতা আব্বাসী খলিফাদের সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা মুসলমান সভ্যতা। এই সভ্যতা বিজিত মাওয়ালাগণের কীর্তি। তাহারাই প্রাচীন সভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দর্শন, সঙ্গীত গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রকৃতিবিজ্ঞান ইত্যাদি আহরণ করিয়া আরবের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে।

* *Umayyads and Abbasides*, trans. by Margoliouth, p. 104.

ইসলাম জাতিভেদ ও বর্ণভেদ স্বীকার করে না; মানুষ মাত্র না হউক, অন্ততঃ মুসলমানেরা পরস্পর সমান। খোদাতালার রাজ্যে আরব-হাবসী, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে তফাৎ নাই। তাঁহার দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সৎকার্য ও পুণ্যের পরিমাণ—ঐশ্বর্য কিংবা বংশমর্যাদা নহে। কিন্তু ওম্মীয়-বংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্র ও সমাজে বৈষম্য সাম্যের, জিঘাংসা মানবপ্রেমের, সকীর্ণ-বংশ-বৈর উদার জাতীয় ঐক্যের স্থান অধিকার করিল। এই সময়ে মনুষ্য জাতির তিন ভাগ পরিকল্পিত হইত, যথা—আরব, মাওয়ালা (ইরানী, গ্রীক প্রভৃতি বিজিত জাতি যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল) এবং আহেল ই কেতাব, অর্থাৎ য়িহুদী ও খৃষ্টান যাহারা মুসলমানদের পূর্বে অপৌরুষেয় গ্রন্থ বাইবেল ও পেন্টাটিউক পাইয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে আরব ষোল আনা মানুষ, মাওয়ালা অর্ধ-মনুষ্য, এবং আহেল-ই-কেতাব অমানুষ (non-men) অর্থাৎ, মনুষ্য-পর্যায়ের অন্তর্গত নহে। আরবের ভাষা, আরবের ধর্ম এবং আরব-প্রভুত্ব মেরুদণ্ডহীন সুসভ্য গ্রীক ইরানী প্রভৃতি বিজিত জাতিসমূহকে বাস্তবিকপক্ষে এতই অভিভূত করিয়াছিল যে, আরবীভাবাপন্ন মাওয়ালারা নিজেদের ছোট জাত বলিয়াই মনে করিত। আরব কন্যার সহিত মাওয়ালার বিবাহ শূদ্র ও ব্রাহ্মণীর প্রতিলোম-বিবাহের চেয়েও অধিকতর নিন্দনীয় ছিল। কথিত আছে, এক আরব-কন্যা একজন পরম বিদ্বান ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিল। বর আরবী ভাষায় দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইলেও স্ত্রীকে বাসরঘরের বাতি নিবাইতে বলিবার সময় ধরা পড়িলেন। তিনি জাতিতে আরব ছিলেন না। স্বামীর অশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ শুনিয়া স্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তালাক দিলেন। কোন মাওয়ালা আরব-কন্যা বিবাহ করিয়াছে, এই সংবাদ সরকারী কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হইত, এবং এই অপরাধের জন্য মাথার চুল ও চোখের ভুরু কামাইয়া মাওয়ালাকে দু শ ঘা বেত মারা হইত।* প্রসিদ্ধ কবি নুছেবের পুত্র তাঁহার আরব-প্রভুর কন্যার প্রেমে পড়িয়াছিল, এবং কন্যার অভিভাবকগণও এ বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া কবি তাঁহার হাবসী গোলাম-দিগকে হুকুম দিলেন, ছেলেকে বেদম প্রহার করিয়া যেন তাহার এ বাতিক দূর করে; কারণ মাওয়ালা-কবি তাঁহার পুত্রের এরূপ অভিলাষ অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। মাওয়ালাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষা, চরিত্রের উৎকর্ষ ও জ্ঞানে আরবদের চেয়ে শতগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এক দল ছিলেন দাস-মনোভাবসম্পন্ন আরব-ভক্ত—যে ভক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্ধর্মী শূদ্রের ভক্তির সহিত

* *Ummayyad and Abbasides.* p. 119.

তুলনা করা যাইতে পারে। শুধু ওমীয় রাজত্বকালে নয়, যখন আব্বাসী খলিফাদের দরবারে মাওয়ালাদের পূর্ণ প্রাধান্য, তখনও এই শ্রেণীর মাওয়ালাদের অহেতুকী আরব-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। খলিফা মনসুরের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ইবন্-উল-মোকাপ্‌ফা একজন ইরানীয় মাওয়ালা ছিলেন। বসোরা শহরে একজন বিশিষ্ট পারস্যবাসীর বাটীতে এক বৈঠকে ইবন্-উল মোকাপ্‌ফা প্রশ্ন তুলিলেন—পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ? উপস্থিত ব্যক্তিরা স্থান ও পাত্র বিবেচনা করিয়া বলিল—ইরানী জাতি। ইবন মোকাপ্‌ফা বলিলেন—ইহা ঠিক নহে; ইরানী জাতি মহাপরাক্রান্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু নিজেদের প্রতিভাবলে তাহারা নূতন কিছু আবিষ্কার করে নাই। তিনি একে একে গ্রীক প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন জাতির দাবি খণ্ডন করিয়া এ বিষয়ে আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আরব বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই, তবুও আরব জাতিকে জানিবার ও বুঝিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

মাওয়ালাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি কর্মকুশলতা ও সাহসে ইরানীরা ছিল অগ্রণী। ইহাদের সংখ্যাও ছিল অন্যান্য জাতীয় মাওয়ালাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে আরব মাওয়ালা বিরোধ আরব ও ইরানীয় জাতির প্রাচীন শত্রুতার নূতন রূপ,—সেমেটিক ও আর্যসভ্যতার আভনব শক্তিপরীক্ষা বলা যাইতে পারে। ইরানীদের মধ্যে সকলেই ইবন্ উল মোকাপ্‌ফার মত আরবী ভাবে বিভোর, আরব মাহাত্ম্যে মন্ত্রমুগ্ধ ও কায়মনে আরবভক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণ করিয়া অগ্নিউপাসক মুমূর্ষু ইরানীয় জাতি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল। আরব বিদ্বেষ ছিল ইরানের এই নূতন জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র। ইরানী মাওয়ালাগণ রাজনীতিক্ষেত্রে ওমীয় যুগে অখণ্ডপ্রতাপ আরব-শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারে নাই। আরবেরা যাহাদিগকে তলোয়ারের জোরে জয় করিয়াছিল তাহারা কাগজে কলমে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য একটি আরব-বিদ্বেষী বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠা করে। ইহার নাম ছিল শু-উব্বী, ইহারা সাম্যবাদী নামেও পরিচিত ছিল। ইসলামের সাম্যবাদ প্রধানতঃ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু শু-উব্বীরাই সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিল—শুধু মুসলমানেরা পরস্পর সমান নহে, মানুষ মাত্রেই সমান। ইসলাম অপেক্ষাও অধিকতর উদার এই সাম্যবাদ ছিল শু উব্বীদের প্রতিপাদ্য বিষয়। আরবের বিরুদ্ধে পৃথিবীর যে-কোন জাতির পক্ষে ওকালতী করা, আরব জাতিকে অন্যান্য জাতির চেয়ে সভ্যতা, জ্ঞান ও চরিত্রগুণে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল

সাম্যবাদীদের লেখনী-চালনার উদ্দেশ্য। আরবভক্ত ও আরববিদ্বেষী উভয় পক্ষেই ইরানীরা বাদ-প্রতিবাদ চালাইত। লেখাপড়া, চুল-চেরা যুক্তিতর্ক ওম্মীয় যুগের আরবেরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। এই দুই দলের বিরোধ ও বাদ-প্রতিবাদের ফলেই মুসলমানের দৃষ্টি প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চার প্রতি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। আরবভক্তরা খলিফাগণকে লইয়া গর্ব করিলে সাম্যবাদীরা ফেরায়ুন (পিরামিড নির্মাতাগণ), নিমরুদ, খসরু, সীজার, সোলোমন, আলেকজাণ্ডার এবং ভারতবর্ষের সম্রাটগণের কীর্তি বর্ণনা করিয়া প্রতিপক্ষকে নির্বাক করিত। নবী রসুলের কথা উঠিলে সাম্যবাদীরা বলিত—বাবা আদমের পর এক লক্ষ চব্বিশ হাজার রসুল-পয়গম্বরের মধ্যে হুদ (Hud), সালেহ, ইসমাইল ও হজরত মহম্মদ এই চারিজন মাত্র আরব-বংশে জন্মিয়াছেন। জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতার তর্ক উঠিলে একা কোরাণশরীফেই আরবী-পাল্লা ভারী হইয়া উঠিত। আরবী-বিদ্বেষীরা এক্ষেত্রে সুবিধা করিতে না পারিয়া গ্রীক ও হিন্দু দর্শন, ইরানীয়, খল্‌দীয় ও প্রাচীন মিসরের জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ইত্যাদির নজীর উপস্থিত করিত।

আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নপুরী, আরবা-বিক্রমাদিত্য খলিফা হারুণ-অল্‌-রশিদের রাজধানী বাগদাদ নগরী ছিল মধ্যযুগে বিশ্বভারতীর প্রিয় নিকেতন। উদারচেতা ও মুক্তবুদ্ধি আব্বাসী খলিফাদের আশ্রয়ে শু-উব্বীরা বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে। ওম্মীয়-বংশের ধ্বংস ও আব্বাসী খেলাফতের প্রতিষ্ঠা নবজাগ্রত ইরানী জাতির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হইয়াছিল। এজন্য রাজবংশ আরব, রাজকীয় ভাষা ও ধর্ম আরবী হইলেও আব্বাসী খেলাফতের প্রথম ভাগকে পারস্য-প্রাধান্যের যুগ বলা হয়। শু-উব্বীদের প্রভাবে গোঁড়া মুসলমান সমাজের সঙ্কীর্ণতা বহু পরিমাণে দূরীভূত হওয়াতে এ-সময়ে মুসলমান সভ্যতা অতিদ্রুত উন্নতিলাভ করে। খলিফা মনসুর হইতে মামুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত (খৃঃ ৭৫৪—৮৫৩) মুসলমান সভ্যতার স্বর্ণযুগ। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার অবসানে মুসলমান সমাজ এ-সময়ে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছে। বাধাহীন জ্ঞানচর্চা ও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ কিংবা প্রবৃত্তি ইহার পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় নাই। বালক ও প্রবীণের মনোবৃত্তি, জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির যতখানি তারতম্য, আব্বাসী খলিফার একজন দরবারী আলেম্ (পণ্ডিত) এবং প্রথম চারি খলিফার সমসাময়িক একজন আন্‌সার্ অর্থাৎ মদিনাবাসীর মধ্যে এ-সমস্ত বিষয়ে ততখানি তফাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্রুতকীর্তি খলিফা মনসুর, হারুণ-অল-রশিদ এবং মামুনের দরবারে জ্ঞানচর্চার বিবরণ হইতে এই উক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে।

খলিফা মনসুর

মনসুর নিষ্ঠাবান মুসলমান হইলেও শাস্ত্রচর্চায় জায়েজ, না-জায়েজ, হারাম ও হালাল বিচার করিতেন না। ইসলামের অনুশাসনে মুসলমানের ফলিত জ্যোতিষ (astrology) আলোচনা নিষেধ। মনসুর সর্বপ্রথমে এই নিষেধ উপেক্ষা করিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমাদর করিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারী জ্যোতিষীর নাম ছিল নো-বখ্‌ত। নো-বখ্‌তের দ্বারা লগ্ন ও শুভমুহূর্তে বিচার না করাইয়া খলিফা এক পা-ও চলিতেন না। ইনি ও ইঁহার বংশধরগণ বহু জ্যোতিষ গ্রন্থ ফার্সী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। মনসুরের গুণগ্রাহিতায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন হিন্দু জ্যোতিষী বাগদাদ গিয়াছিলেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের সাহায্যে অল্-ফজরি ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত (*Sind-hind*) ও খণ্ড-খাণ্ডক (Ar-kand) নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের আরবী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মনসুরের রাজত্বকালে পঞ্চতন্ত্রের করটক-দমনক উপাখ্যান ইসলামের বহু পূর্বে ফার্সী ভাষায় তর্জমা হইয়াছিল। মনসুরের আদেশে ইবন্ উল-মোকাপ্‌ফা এই ফার্সী তর্জমার আরবী-অনুবাদ (*Kalitawa Damna*) করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চাও মনসুরের সময় হইতে আরম্ভ হয়। জুরজিস (George) নামক সিরিয়ান খৃষ্টান ছিলেন তাঁহার দরবারী হকিম। তিনি সিরীয়, গ্রীক ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

খলিফা মনসুরের পুত্র মেহ্‌দীর রাজত্বকালে মানী প্রভৃতি তার্কিকগণের গ্রন্থ আরবী ভাষায় তর্জমা হওয়ায় শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ইসলামে চার্বাকদের ন্যায় একদল কুতার্কিক দেখা দেয়—ইহাদিগকে জিন্দিক বলা হইত। এই গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, চিন্তাশীল, অবিশ্বাসী তার্কিকদের তর্কের হামলায় ইস্‌লামের আলেম-সমাজ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িলেন। চার্বাকেরা যেমন বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, পরজন্ম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইত্যাদিকে যুক্তি ও উপহাসের তীব্র বাণে বিদ্ধ করিয়া লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিন্দিকদের তর্কের বিরুদ্ধে রসুল, কোরাণ ও খোদাকে রক্ষা করা সেকেলে মৌলানাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল। কেননা, প্রকৃত মুসলমানেরা ধর্মকে লৌকিক যুক্তির বহু ঊর্ধ্বে মনে করে। মৌলানা ও গোঁসাইরা এ বিষয়ে একমত—অর্থাৎ "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" গোসাঁইরা "কৃষ্ণনিন্দা" শুনিলে কানে আঙুল দিয়া "স্থানত্যাগেন" দুর্জনকে বর্জন করেন। কিন্তু মৌলানারা ছিলেন অন্য ধাতের লোক—কথায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে তাঁহারা সকল যুক্তির সেরা "লাঠ্যৌষধি" ব্যবস্থা করিতেন। "ইসলাম গেল" রব তুলিয়া তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসী জনসাধারণকে

ক্ষেপাইয়া তুলিতেন, কিংবা খলিফার দরবারে নালিশ করিয়া জিন্দিকদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু ইহাতেও জিন্দিক-বাদ ধ্বংস হইল না; মুখে হার না মানিলেও জিন্দিকদের কাছে মৌলানারা মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিতেন —কেননা ভাবের ঘরে কেহ বেশীদিন চুরি করিতে পারে না। খলিফা মেহ্‌দী বুঝিতে পারিলেন, যুক্তিদ্বারা কুতার্কিকগণকে পরাস্ত করিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে যুক্তিতর্কের যুগে ইসলামের প্রভাব ক্রমশঃ খর্ব হইবে। মৌলানারা নিরুপায় হইয়া জিন্দিকগণের প্রদর্শিত পথে বিরুদ্ধবাদী তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাস থাকাতে অমুসলমান-শাস্ত্রচর্চার বিষক্রিয়া ইহাদের উপর দেখা গেল না। পরবর্তীকালে বরং এই বিষকে হজম করিয়া ইমাম গজ্জালী অমর হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র লেখনী ইসলামকে নূতন রূপ দিয়াছে। তাঁহার কৃপায় বহু জিন্দিক নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ধর্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে। জিন্দিকগণের সহিত বাদ-প্রতিবাদের ফলে এই সময়ে ইল্‌ম্‌-ই-কালাম বা ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

খলিফা হারুণ-অল-রশিদের সময় বাগদাদ শুধু মুসলমানের শহর ছিল না। সকল দেশের ও সকল ধর্মের লোক তখন বাগদাদে বাস করিত। ইহারা তখন অনেকে রাজদরবারে চাকরির লোভে আরবী শিখিত। খলিফা হারুণ বাগদাদে এক বাণীধাম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নাম ছিল বায়েৎ-উল-হিক্‌মৎ (*Bait-ul-Hikmat*) বা Academy of *Sciences*—অবশ্য হিক্‌মৎ বলিতে Arts এবং Science দুই-ই বুঝায়। খৃষ্টান, য়িহুদী ও হিন্দু পণ্ডিতেরা এখানে অনুবাদকের কাজ করিতেন। তাঁহাদের স্ব-স্ব ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ—যাহা তথায় সযত্নে সংরক্ষিত ছিল—এই সময় তাঁহারা আরবীতে অনুবাদ করেন। ইসলামের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া খলিফা হারুণ তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র চর্চার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ভোগক্লিষ্ট দেহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি তিনি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দরবারী চিকিৎসকদের মধ্যে বেশীর ভাগ আরব কিংবা মুসলমান ছিল না। হারুণের মন্ত্রী বরামকী-বংশীয়েরা হিন্দু আয়ুর্বেদের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ইহাদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন বাল্‌হীক (Balkh) দেশের নববিহার নামক বৌদ্ধ সংঘারামের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'বরামক'* না-কি সংস্কৃত শব্দ 'পরমক' শব্দের বিকৃতি। বরামক ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। কেহ কেহ বলেন, এই পরমক বা বরামক ভারতবর্ষীয় ছিলেন। যাহা হউক ইহার বংশধরগণ ইসলাম গ্রহণ করিবার

* Alberuni's India, Trans, by Sachau, Preface, P. xxx—xxxiii.

পরেও ভারতবর্ষের সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অনেক পণ্ডিতকে ভারতবর্ষে পাঠাইতেন। তাঁহারা অনেক হিন্দু-চিকিৎসককে বাগদাদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হিন্দু-চিকিৎসকদের মধ্যে ইবন্-ই-দহন (ধনিন ?) বাগদাদের সরকারী চিকিৎসাগারের (*Dar-us-shifa*) প্রধান কবিরাজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জুর্জীজেয়দন কৃত *Ulum-i-Arab* নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত হিন্দু-কবিরাজ ও হিন্দু-আয়ুর্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। মন্কা হিন্দী—ইনি পারস্য ভাষা জানিতেন। ইহারা বিন্-বারমক ইহাকে খলিফা হারুণের চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি ফার্সী ভাষায় তর্জমা করেন।

২। ইবন্-ই-দহন—ইহার একখানা পুস্তকের নাম উন্সান্কর বা এই রকম কিছু। অপরখানির নামও দুর্বোধ্য।

৩। সালেহ্-বিন-ভেলা—রশিদের সময় ইনি ইরাকে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন।

৪। শানক্—বিষ-সম্বন্ধে ইনি এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে ফার্সী পরে ফার্সী হইতে আরবীতে অনুবাদ করা হয়।

'তবকাৎ-উৎ-তিব্বা'র (*Tabqat-ut-tibba*) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, আব্বাসী খেলাফতের সময় বাগদাদে অনেক হিন্দু চিকিৎসক, জ্যোতিষী ও দার্শনিক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কন্কা (কঙ্কায়ন ?) শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে মন্জহল ও বাখর (ভাস্কর ?) নামক দুইখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়।

আরবী ভাষায় তর্জমা করা কয়েকখানা হিন্দু গ্রন্থের নাম—

১। জুদর প্রণীত প্রাণী, উদ্ভিদ ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

২। *Rausa-ut-Hindia* হিন্দুস্থানের স্ত্রীরোগ-সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

৩। *Rai-ul-Hind-fil-ajnas-Hayyatu Samumha*—বিভিন্ন জাতীয় সর্প ও তাহাদের বিষ।

৪। *Kissa-hubut-i-Adam*—সৃষ্টিপ্রকরণ (মনুসংহিতা ?)

৫। *Biafar* (?)—সঙ্গীতের তানলয় প্রকরণ।

ইসলাম-সম্রাটদীয় বরপুত্র খলিফা মামুনের সময় বাগদাদে বিদ্যাচর্চার ইতিহাস আমরা পরে আলোচনা করিব।

খলিফা আবদুল্লা অল্-মামুন

১

মুসলমান-জগতে যে-সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, খলিফা হারুণ-অল-রসিদের জ্যেষ্ঠপুত্র মামুন তাঁহাদের অন্যতম। ইতিহাসে তিনি মুসলমান যুক্তিবাদিগণের অগ্রণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মামুনের চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা আধুনিক সমাজে প্রশংসনীয় হইলেও সেকালের মুসলমান জনসাধারণ ও ইমামদের কাছে মনে হইত ধর্মে স্বেচ্ছাচার, চিন্তার দুর্বলতা ও শাশ্বত সত্যের অবমাননা। মামুন আমাদের আকবর কিংবা দারা শুকো নহেন। কিন্তু উভয়ের দোষ-গুণ দুই তাঁহার মধ্যে ছিল। মোটামুটি বলিতে পারা যায় ভারতবর্ষে যেমন দ্বিতীয় আকবর জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের বাহিরে দ্বিতীয় মামুন আবির্ভূত হয় নাই। শাসকের আসনে বসিয়া ইহারা মুসলমান রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে এক নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন যাহা সনাতনপন্থী মুসলমান বিংশ শতাব্দীতেও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাঁহারা ভবভূতির মত "কালোহ্যয়ম্ নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী"—এই সান্ত্বনা লইয়াই সমাজের নিন্দা ও অপবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কাল যদি কোন দিন জ্ঞানের সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করে, আচারের মরু-বালুকারাশিকে যুগান্তকারী ভাবের ঝঞ্ঝায় অপসারিত করিয়া বিচার-বুদ্ধিকে মুক্ত করে, তখনই আকবর ও মামুনের প্রতি মানব-সমাজ সুবিচার করিতে পারিবে। কাল-ধর্ম লঙ্ঘন না করিলে মানুষ প্রাকৃত-জনের ঊর্ধ্বে স্থান পায় না; অথচ কালধর্মের বিরোধিতা সমাজের উপর কখনও কখনও নিন্দনীয় অত্যাচার। আকবর ও মামুন ছিলেন অপ্রতিহত-প্রভাব স্বেচ্ছাচারী সম্রাট; সাম্য ও সত্যের উপাসক হইলেও স্বভাবতঃ রজোগুণী। ধর্মে ও রাষ্ট্রে তাঁহাদের অহিংসনীতি ও যুক্তিবাদ যেখানে বাধা পাইয়াছে সেখানেই তাঁহারা শাসকের স্বমূর্তি ধরিয়াছেন। যাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে সর্বধর্মের প্রতিপোষক ছিলেন, পরমতসহিষ্ণুতা যাঁহাদের চরিত্রকে মহনীয় করিয়াছিল, দেখা যায় তাঁহারা দুজনেই তাঁহাদের কুলধর্ম ইসলাম ও তদানীন্তন মুসলমান-সমাজের প্রতি কোন কোন বিষয়ে অবিচারও করিয়াছেন। ইহাই আকবর ও মামুন চরিত্রের কলঙ্ক।

খলিফা মামুনের রাজত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পুস্তকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। মৌলানা শিবলী নুমানী অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম

সহৃদয়তার সহিত মামুনের জীবন-চরিত উর্দু 'অল্-মামুন' গ্রন্থে সমালোচনা করিয়াছেন। ব্রকম্যান্ সাহেব কৃত সুয়ূতীর 'তারিখ-উল্-খোলাফা'র ইংরেজী অনুবাদে মামুনের চরিত্র ও রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। মোটামুটি এই দুখানা পুস্তক অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত।

২

১৭০ হিজরীর প্রথম রবিউল মাসের মাঝামাঝি সময় (৭৮৬ খৃঃ)। হারুণ তখনও খলিফা হন নাই। তাঁহার ভাগ্যাকাশ নিরাশা ও আশঙ্কার ঘটায় সমাচ্ছন্ন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাদি তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের দাবি উচ্ছেদ করিয়া জীবননাশের সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করিতেছেন। শাহ্জাদা হইয়া যাহার শাহী-তক্তে বসিবার দাবি নাই, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও নাই। তিনি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; প্রেমোদ্যানে তখনও কুসুমোদ্গম হয় নাই। এই মাসের ১৬ তারিখ শুক্রবার রাত্রিতে চিন্তাক্লিষ্ট হারুণ বিছানায় শুইয়া আছেন; এমন সময় উজীর-ই-আজম্ ইয়াহা বরমকী আসিয়া তাঁহাকে দুটি সুখবর দিলেন—হাদি মারা গিয়াছেন; তিনি খেলাফতের মালিক। ঘটনা এমনই অপ্রত্যাশিত যে হারুণ সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। হাদি ও হারুণের মাতা ক্ষমতালোলুপ সম্রাজ্ঞী খাইজুরাণের চক্রান্তে সেই রাত্রেই হাদির বিলাস-সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে বিছানায় শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। হারুণ ইহার কিছুই জানিতেন না। হারুণ নিজ সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে হারেমের খোজা আসিয়া তৃতীয় সংবাদ নিবেদন করিল—তাঁহার উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ; খোরাসানী ক্রীতদাসী মরাজিল একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে। হারুণ পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল্লা। মরাজিল পুত্র প্রসব করিবার অল্প সময়ের মধ্যে মারা যান; মামুন মাতৃহারা হইলেও পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

৩

পাঁচ বৎসর বয়সে মামুন কোরাণ-শরীফ্ পাঠ আরম্ভ করেন। স্বনামখ্যাত আরবী ব্যাকরণবেত্তা কিসাই নহ্বী মামুনকে কোরাণের পাঠ দিতেন। ইহা ছাড়া মৌলনা ইজ্দী ছিলেন মামুনের আতালিক (guardian tutor)। তাঁহার উপর ভার ছিল শুধু পড়ান নয়,—বালকের চাল-চলন আদব-কায়দা দুরস্ত করা। একদিন ইজ্দী

পড়ার ঘরে উপস্থিত হইয়াছেন ; মামুন তখনও অন্দরমহলে। গোলামেরা সুবিধা পাইয়া ইজ্‌দীকে বলিল—আপনি যখন থাকেন না, সাহেবজাদা সকলের উপর বড় জুলুম করেন। শাহ্‌জাদা হইলেও মাস্টারের হাত হইতে নিস্তার ছিল না। মামুন হাজির হইলেই ইজ্‌দী তাহাকে পাঁচ-সাত ঘা বেত বসাইয়া দিলেন। এমন সময় চাকর খবর দিল খলিফা হারুণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রধান মন্ত্রী জাফর বরমকী শাহ্‌জাদার সহিত দেখা করিতে চান। মামুন তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছিয়া নিজের করাসের উপর বহি খুলিয়া বসিল ; যেন কিছু ঘটে নাই। উজীর ভিতরে আসিয়া শাহ্‌জাদার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা বলিলেন। এদিকে ইজ্‌দীর প্রাণটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। উজীর চলিয়া যাওয়ার পর আশ্চর্য হইয়া তিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বেত-মারার কথা বলিলে না ? মামুন বলিলেন, আপনার শাসন আমার পক্ষে কত উপকারজনক তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না ? ইজ্‌দীর শিক্ষায় মামুন অল্প বয়সে অসাধারণ বক্তা ও তর্ককুশল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইজ্‌দীর পুত্র মহম্মদের কাছে মামুন ফেকা বা মুসলমান-ব্যবহারশাস্ত্র পড়িয়া উহা সম্যক আয়ত্ত করেন। ইহার পর তিনি হদিস্ বা হজরত-কথামৃত (যাহাকে ইসলামীয় স্মৃতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে) পাঠে মনোযোগী হইলেন।

সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ হদিস্-বেত্তা (মুহাদ্দিস্) ছিলেন কুফাবাসী মালিক ইবন্ আনিস্। হারুণ তাঁহার কাছে লিখিলেন—তিনি বোগদাদে পদার্পণ করিয়া শাহ্‌জাদা মামুন ও আমীনকে হদিস্ শিক্ষা দিলে খলিফা অনুগৃহীত হইবেন। জ্ঞান-গর্বিত, নির্ভীক, নির্লোভ, পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে খলিফাকে জানাইলেন, বিদ্যা লোকের কাছে উপযাচক হইয়া উপস্থিত হয় না ; মানুষই বিদ্যার কাছে যায়। দারিদ্র্যে অমলিন পাণ্ডিত্যের স্পর্ধার নিকট হারুণের সাম্রাজ্যগর্ব স্বেচ্ছায় পরাজয় মানিল। তিনি পুত্রদ্বয়কে মালিকের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য কুফায় পাঠাইয়া দিলেন। অসাধারণ মেধাবী ও জ্ঞানপিপাসু মামুন অল্প বয়সে "সর্বশাস্ত্র পারংগম" হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ইসলামীয় ব্যবহারশাস্ত্র (ফেকা), সাহিত্য, ও আরব জাতির প্রাচীন ইতিবৃত্তে তিনি সে-সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সমকক্ষ গণ্য হইতেন।

৪

লোকের চক্ষে প্রতীয়মান হইলেও জগতে প্রকৃত সুখী বোধ হয় কেহ নাই। আরব্যোপন্যাসের নায়ক হারুণও সুখী ছিলেন না। তাঁহার অবস্থা ছিল অনেকটা

আমাদের সম্রাট শাহজাহানের অপেক্ষাও শোচনীয়। আমীনের মাতা সম্রাজ্ঞী জুবেদার চক্রান্তে মিথ্যা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হারুণ নিজ রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষে বরমকী-পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করিলেন। ঐশ্বর্যের ভাঙা হাটে তিনি তখন নিতান্ত একক ও অসহায়; মামুন আমীন প্রভৃতি পুত্রচতুষ্টয়ের কাছে তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার নৈশপরিক্রমার বিশ্বস্ত সঙ্গী মসরুর মামুনের ও বিশ্বাসী চিকিৎসক গেব্রিয়ল আমীনের গুপ্তচর রূপে তাঁহার শ্বাসবায়ু গণিতেছিল।

ইহার চার বৎসর পরে নৈরাশ্য ও আশঙ্কার আঁধারে হারুণের শেষযাত্রা সমাপ্ত হইল খোরাসানের পথে পারস্যের তুস্ শহরে (২৩শে মার্চ, ৮০৯ খৃঃ)।

৫

হারুণ-অল্ রশিদের ইচ্ছা ছিল মামুনকে অখণ্ড সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবেন। কিন্তু নিজ জ্ঞাতিগণের অনুরোধে তিনি হাশিম-বংশীয়া রাজকুমারী জুবেদার গর্ভজাত পুত্র আমীন কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকেই খেলাফতের অধিকার দিয়াছিলেন। তবে ইহাও নির্দেশ ছিল মামুনের পূর্বে যদি আমীন মারা যায়, মামুনই সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিকারী হইবেন। মামুন ১৮২ হিঃ অর্থাৎ ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হারুণের মৃত্যুর পর আমীন খলিফা হইলেন। মামুনকে খোরাসান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে আমীন মামুনকে খোরাসান হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য এক বৃহৎ অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামুন নিজ সেনাপতি তাহের খোরাসানীর যুদ্ধকৌশল ও মন্ত্রী ফজল বিন সহলের কূট রাজনীতির বলে জয়ী হইলেন; আরববিদ্বেষী তাহের বন্দী আমীনকে মামুনের বিনানুমতিতে হত্যা করিয়া স্বীয় প্রভুর ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিল।

৬

মামুন ৮১৩ হইতে ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসর তিনি খোরাসানের রাজধানী মরু নগরে বাস করিতেন। পণ্ডিত ও ভাববিলাসী রাজদণ্ডের অধিকারী হইলে যাহা হয়, মামুনের বিশাল সাম্রাজ্যে তাহাই ঘটিতে লাগিল; সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলতা—কুফা, মক্কা, মেসোপোটেমিয়া, এমন কি বাগদাদ হইতে তাঁহার শাসনকর্তারা বিতাড়িত হইল। এই সময় তিনি মন্ত্রী

ফজল্ বিন্ সহলের হাতের পুতুলের মত ছিলেন। লোকে বলে রাজধর্মের অভিধানে কৃতজ্ঞতা শব্দ নাই; অন্ততঃ আব্বাসী খলিফাগণের কাছে ইহা অজ্ঞাত ছিল। বিশ্বস্ত আরব সেনাপতিকে মন্ত্রী ফজলের চক্রান্তে প্রকাশ্য রাজদরবারে হত্যা করা হইল। সুচতুর তাহের ফাঁদে না পড়ায় রক্ষা পাইল। ইহা ছাড়া মামুন আরও একটি রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়া বসিলেন। আব্বাসী ইমামেরা শীয়াদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খেলাফৎ অধিকার করিয়াছিলেন। মামুন মনে করিলেন, এ অবিচারের প্রতিকার কর্তব্য; ন্যায্যতঃ (শীয়াদের মতে) আলীর বংশধরেরাই খেলাফতের প্রকৃত মালিক। এই ভাবিয়া তিনি পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ আলী-অল্ রেজাকে তাঁহার কন্যাদান করিলেন এবং তাঁহার পরে খেলাফৎ উনিই পাইবেন এ হুকুম জারি করিলেন। সুন্নী আরব-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মামুনের পক্ষে ইহা পায়ে কুঠারাঘাত তুল্য। কিছুদিন পরে মামুনের চৈতন্য হইল। ফজল মামুনের ইঙ্গিতে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইল, হঠাৎ আলী-অল্ রেজার মৃত্যু হইল; কেহ কেহ সন্দেহ করেন মামুন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ৮১৯ খৃষ্টাব্দে মামুন বোগদাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং সাম, দান, দণ্ড, ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া সর্বত্র নিজের প্রভুত্ব ও শান্তিস্থাপন করিলেন।

৭

আব্বাসী খলিফাগণের রাজত্ব ইসলামের পররাজ্য-জয়যাত্রার ইতিহাস নহে। ইহার বৈশিষ্ট্য মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার; ইসলামের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ভাণ্ডারে অফুরন্ত দান। বিচারবুদ্ধি আপ্তবাক্যের নাগপাশ ও সংস্কারমুক্ত না হইলে জ্ঞানরাজ্যজয়ে কৃতকার্য হইতে পারে না। খলিফা মামুন এই জন্য এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলেন। আব্বাসী-বংশের খেলাফৎ-প্রাপ্তির পর হইতে মুসলমান মোতাজেলা বা যুক্তিবাদী সম্প্রদায় ইসলামের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধর্মমত আক্রমণ করিয়া মোল্লা-সম্প্রদায়ের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছিল। খলিফা হারুণের হস্তে ধর্মে তর্কজাল বিস্তারকারী জিন্দিক বা বেইমান দার্শনিকের নিস্তার ছিল না। বিশর্-বিন-মারিবসীর কোরাণ সম্বন্ধে মোতাজেলা-মতানুযায়ী টিপ্পনীর কথা হারুণের কাছে পৌঁছাইলে তিনি বলিয়াছিলেন বিশরকে হাতে পাইলেই মাথা লইবেন। কিন্তু হারুণের পুত্র মামুন সেই মোতাজেলামত নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না। তাঁহার রাজশক্তির সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া

সমস্ত মুসলমানকে মোতাজেলাবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কোরাণের ও খোদাতালার সম্বন্ধ, হজরত রসুলাল্লার সশরীরে খোদাতালার সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাবর্তন (মিহ্‌রাজ-ই-জিস্‌মানী) এবং কিয়ামতের (প্রলয়) দিন মুসলমানের সৃষ্টিকর্তার মুখদর্শন—এই কয়টি বিষয়ের ব্যাখ্যা লইয়াই বিশ্বাসবাদী সনাতন মুসলমান-সমাজ ও যুক্তিবাদী মোতাজেলাদের মধ্যে বিরোধ ছিল।

মোতাজেলারা বলেন কোরাণ কদীম অর্থাৎ শাশ্বত সৃষ্টিপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ খোদাতালা আদিতে ছিলেন, অন্তেও একমাত্র তিনিই থাকিবেন; কোরাণকেও যদি কদীম মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ছুইটি শাশ্বত বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়—ইহা দ্বৈতবাদ (Dualism) যাহা ইসলামের বিরোধী। মুসলমান দর্শনে ইহার কি মীমাংসা আছে জানি না, কিন্তু আর্যদর্শন মতে কোরাণকে বলা যায় বেদ ও যাঁহা হইতে এই বেদ নির্গত হইয়াছে তিনিই নাদ-ব্রহ্ম। কোরাণ খোদাতালার সৃষ্ট; অন্তিমে অবিনশ্বর কোরাণ খোদাতালাতেই লয় হইবে—ইহা মানিয়া লওয়া খাঁটি মুসলমান দোষাবহ মনে করে।

আকবর বাদ্‌শা নাকি এক দিন বলিয়াছিলেন মাটি হইতে এক পা উঠাইয়া আমি অন্য পাখানি উঠাইতে পারি না; হজরত মহম্মদ কি করিয়া রাত্রে বিছানা হইতে জেরুসালেম গিয়া সেখান হইতে সশরীরে আস্‌মানে চড়িলেন এবং খোদাতালার সঙ্গে দেখা করিয়া আবার মক্কায় নিজ বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন দরজার কড়া তখনও নড়িতেছে এবং বিছানার লেপখানিও গরম আছে? আকবর স্থূল জগতের বিজ্ঞানসম্মত কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু হজরত রসুলাল্লার সশরীরে স্বর্গে গমনাগমন অধ্যাত্ম-রাজ্যের ব্যাপার, যেখানে জড়-বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে না। যাহা হউক, মামুন আকবরের মত এতটা অবিশ্বাসী ছিলেন না। মোতাজেলারা বলেন, মিহ্‌রাজ ব্যাপারটা মিথ্যা নয়; কিন্তু হজরত স্থূল শরীরে আস্‌মানে উঠেন নাই; ঘটনাটি স্বপ্ন কিংবা ভ্রম নহে। সূক্ষ্ম-শরীরে তিনি সপ্তম স্বর্গে খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। মোতাজেলারা সে যুগে আধা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়াছিলেন। মোতাজেলাদের মতে কিয়ামতের দিন ইমানদারেরা খোদাতালার মুখ পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইবে বটে, কিন্তু এই পৃথিবীর চর্মচক্ষে নয়।

২১৮ হিঃ (৮৩৩ খৃঃ) অর্থাৎ নিজ রাজত্বের শেষ বৎসর এক ফতোয়া জারি করিয়া মামুন জোরজবরদস্তি করিয়া অধিকাংশ কাজী ও উলেমাগণকে কোরাণ সৃষ্ট এই কথা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার এই মত গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে নিছক গালাগালি দ্বারা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করিলেন। এই সমস্ত উলেমা অনেকটা আকবরের সময়কালীন শেখ্ আবদুন্‌নবী ও মোল্লা আবদুল্লা সুলতানপুরীর স্থায় ছিলেন। ধর্মের পাণ্ডা হইয়া ধর্মকে ফাঁকি দিতেন।*

মামুন বোগদাদের কোতোয়ালের কাছে লিখিলেন—অমুক ব্যক্তি যদি খলিফার ফতোয়ায় দস্তখত করিতে নারাজ হয়, বলিও সরকারী গোলা হইতে ধান চুরি করায় বোধ হয় তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; অমুক মিশরে কাজীগিরি করিয়া এক বৎসরে কত টাকা জমাইয়াছে আমীর-উল-মোমিনিন্ ভাল রকম জানেন; অমুকের জন্মের ঠিক নাই; আবুনছর খেজুর বিক্রী করে, বুদ্ধিও তাহার তদ্রূপ; সুদ খাইয়া ইবন্ নুহ ও ইবন্ হাতেমের আকল্ ও ইমান্ ইহুদীর মত হইয়াছে; মস্তভাও বেগারীকে বলিও ঘুষ ও সওগাত লওয়াতেই বুঝা যায় তাহার ইমান্ কতখানি ঠিক, ইত্যাদি। যাহা হউক, মোতাজেলা-বাদ খলিফা মামুনের পরবর্তী দুই খলিফার সময় প্রবল ছিল। অবশেষে আওরঙ্গজেব-রূপী খলিফা মোতোয়াক্কেল মোতাজেলাগণকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় খাঁটি সনাতন ইসলামকে রাহুমুক্ত করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের স্বাধীন চিন্তা ও অমুসলমানী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার পথ চিরদিনের জন্ম বন্ধ হইল।

৯

ইমাম হিসাবে মামুন মোতাজেলা-মত-বিরোধীদিগকে কঠোর শাসন করিলেও তাঁহার রাজনীতি উদার ছিল, খলিফা হারুণের মত তিনি খৃষ্টান প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করেন নাই। ভারতবর্ষে একমাত্র আকবরের রাজত্বকাল ও ভারতের বাহিরে মামুনের শাসনকালেই মুসলমান-রাজ্যের অমুসলমান প্রজারা ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। কিন্তু মামুন আকবরের মত অন্তধর্মাবলম্বীগণকে রাষ্ট্রে সমান অধিকার দেন নাই—ইচ্ছা থাকিলেও দেওয়া অসম্ভব ছিল। প্রাচীন পারস্ত-রাজগণের স্থায় মামুনও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণকে স্ব-স্ব ধর্মের প্রাধান্ত

* ইহাদের একজন জাকাৎ (ধর্ম-দান) না দেওয়ার জন্ত প্রতি বৎসরের শেষ মাসে সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে কবালা (বিক্রী) করিয়া আবার নূতন বৎসরের প্রথম মাসে স্ত্রীর নিকট হইতে নিজের নামে কিনিয়া লইতেন।

ও অন্য ধর্মে যুক্তিবাদের ত্রুটি প্রমাণ করিবার জন্য তর্ক-সভা আহ্বান করিতেন, আকবরের ইবাদৎখানাও এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। লাহোর ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আর্যসমাজের পণ্ডিত ও জমিয়তের উলেমাগণের মধ্যে ধর্ম-বিচার ও তর্কযুদ্ধ এই ধারা প্রচলিত রাখিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষে নূতন নহে; বুদ্ধদেবের পূর্বকালীন* আর্য পরিব্রাজক হইতে চৈতন্যদেব পর্যন্ত এই ধারা প্রচলিত ছিল। তবে হিন্দু সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজে সেই spirit of chivalry দেখা যায় না যেখানে বিচারে অপদস্থ পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীর দার্শনিক কিংবা ধর্মমত দ্বিধাশূন্যমনে গ্রহণ করিয়া প্রকৃত যোদ্ধার মত প্রতিপক্ষের সম্মান করিতেন। কথিত আছে, কোন হাশিমী মৌলানা অল-কিন্দী নামক তাঁহার একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ-খৃষ্টান বন্ধুকে পবিত্র ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার উত্তরে অল-কিন্দী ইসলাম-ধর্মের অসারতা প্রমাণ করিয়া আঁধার হইতে আলোকে আনিবার আশায় বন্ধুকে খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। অল-কিন্দীর এই পত্র *Apology of Al-Kindy* নামে স্যর উইলিয়ম মিউর ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছে। অনুবাদকের উদ্দেশ্য বোধ হয় সাধু ছিল না; ইসলাম-বিরোধী খৃষ্টান পাদরীদিগের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া তিনি এ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই *Apology*র তুলনায় এইচ. জি. ওয়েলসের হজরত মহম্মদের নিন্দা নিছক গালাগালি মাত্র; ইহাতে অল-কিন্দীর গভীর ইতিহাসজ্ঞান ও যুক্তির প্রখরতা কিছুই নাই। অল-কিন্দীর "ক্ষমাপ্রার্থনা" খলিফা মামুনের ধর্মে সাম্যনীতি ও সে-যুগের মুসলমান সমাজের পরমত সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। আপাতদৃষ্টিতে ইহা ইসলামের গৌরব-ললাটে কলঙ্ক-রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া ইসলাম দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের ন্যায় গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছে।

মামুন ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কিংবা বিশ্বাসীর মনে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছায় তাঁহার রাজ্যে অল্-কিন্দীর মত পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দিতেন না। প্রত্যেক মুসলমানের মত মামুনের অস্থিমজ্জাগত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইসলাম শাশ্বত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য—ভঙ্গুর কাচ নহে। কিন্তু তিনি জানিতেন যে সত্য বিচার-ভীরু, দুনিয়ার বাজারে যাহার যাচাই হয় নাই, তাহা জগতে আদৃত হয় না।

খলিফা মামুনের জীবনীর অবশিষ্টাংশ, তাঁহার চরিত্র, বিলাসব্যসন, সঙ্গীত-চর্চা, অনুবাদের সাহায্যে ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারে অফুরন্ত দান।

---

* Rhys David's *Buddhist India*.

'পদ্মাবত' কাব্য এবং পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা

বর্তমান শতাব্দীর ঐতিহাসিক গবেষণায় কাব্য-নাটকের নায়িকাগুলির উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। আধুনিকেরা বলেন—ইহারা কাল্পনিক, ইতিহাসে তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; প্রাচীনেরা বলেন, ইহারা খাঁটি ঐতিহাসিক—কল্পনাপ্রসূত নহেন। "প্রবাসী" পত্রিকার ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় "পদ্মিনী-উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আমি পদ্মিনী-উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পত্রিকার ১৩৩৮এর চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রায়-মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একখানা ঐতিহাসিক কাব্য; পদ্মিনী, গোরা, বাদল, ডুলী-বেহারা, আলাউদ্দীনের কারাগার সবই ঐতিহাসিক। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলির পুনরায় বিচার করা প্রয়োজন। নিখিলবাবু কবি আলাওলের "পদ্মাবতি পুঁথি" অবলম্বন করিয়া মূল হিন্দী পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি "পদ্মাবতে"র কোন হিন্দী সংস্করণ পড়িয়াছেন কি না, প্রবন্ধ পাঠে বুঝা যায় না। তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশে মূল ও অনুবাদে যে ভুলগুলি দেখা যায়, রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত ও নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত 'পদ্মাবতে'র (জ্যায়সী গ্রন্থাবলী) সাহায্যে তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। দ্বিতীয়তঃ, নিখিলবাবু বর্তমান সময়ে রাজপুত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার 'রাজপুতানেকা ইতিহাসে'র উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। তিনি শুধু টডের রাজস্থান, তারিখ-ই-ফিরিশতা, এবং পাথরে লেখা কল্পিত ঘটনা-পূর্ণ 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যের সাহায্যে "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা"র কথা লিখিয়াছেন। পদ্মিনী-উপাখ্যান-সম্পর্কে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু তাহাও আমরা গৌরীশঙ্করজীর গবেষণামূলক হিন্দী ইতিহাস অবলম্বনে আলোচনা করিব। কোন অর্বাচীন লেখকের কলমের এক খোঁচায় পদ্মিনীর মত নায়িকা ইতিহাস হইতে সরিয়া পড়িবেন, ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে। এ-সম্বন্ধে যত বিচার হয় ততই ভাল।

"পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধে নিখিলবাবু ভূমিকায় বলিয়াছেন, পদ্মাবত ঐতিহাসিক কাব্য বটে কেননা ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, ব্যক্তি ও স্থান লইয়াই

লিখিত (পৃ. ৮১১)। উক্ত সংজ্ঞানুসারে কাব্য, উপন্যাস, কিংবা নাটকের 'ঐতিহাসিকতা' স্থির করিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কিংবা ক্ষীরোদবাবুর অধিকাংশ পুস্তককে 'ঐতিহাসিক' বলিয়া মানিয়া লইতে হয় না কি? ইতিহাসের নায়িকার অভাবই কবি এবং উপন্যাস-লেখক পূরণ করিয়া থাকেন। তবে কি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিংবা কাব্যের এ নায়িকাগুলিকে ঐতিহাসিক 'ফ্যাক্ট' হিসাবে গ্রহণ করিবেন?

নিতান্ত সমসাময়িক না হইলে কোন কাব্যকে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা বড়ই বিপজ্জনক। মারাঠী 'শিবভারত,' সংস্কৃত 'রামচরিতম্', 'পৃথ্বিরাজ বিজয়ম্', হিন্দী 'সুজান-চরিত' (জাঠরাজা সূরজ মলের জীবনচরিত), 'রাজবিলাস' ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্য—কেন-না এগুলি দরবারী কবিরা রাজার আদেশে লিখিয়াছিলেন—চাটুবাদগুলি বাদ দিলে এইগুলি হইতে সত্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে। ঘটনার বহু বর্ষ পরে রচিত 'পদ্মাবতে'র মত দার্শনিক allegory-র কথা দূরে থাকুক, সমসাময়িক কবির বংশধরেরা লিখিয়াছেন, এমন প্রামাণ্য 'পৃথ্বিরাজ-রাসো' হইতে ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। মেবারপতি সমরসিংহ বীর পৃথ্বিরাজের ভগিনী পৃথা বাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শিহাবুদ্দীন ঘোরীর সহিত তিরোরীর দ্বিতীয় যুদ্ধে ইনি প্রাণত্যাগ করেন—ইহা 'পৃথ্বিরাজ-রাসোর' প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং মহারাণা রাজসিংহের সময় রচিত 'রাজপ্রশস্তি'* কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে। অথচ অজমের-চৌহানবংশে তিনজন পৃথ্বিরাজ ছিলেন; কোন্ পৃথ্বিরাজের ভগিনীকে সমরসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন? শিহাবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বিরাজের সমসাময়িক মিবাড়ের রাজা ছিলেন সামন্ত সিংহ, সমরসিংহ নহেন। মেবার-রাজ রাজর্ষি সমরসিংহ ছিলেন পদ্মাবতের নায়ক রতনসিংহের পিতা। সমরসিংহের রাজত্বের একটি শিলালিপি চিতোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার দ্বারা প্রমাণ হয়, সমরসিংহ অন্ততঃ বি. সং ১৩৫৮,† অর্থাৎ ১৩০২ ইংরেজীর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১১৯২ খৃষ্টাব্দে তিরোরীর যুদ্ধে সমরসিংহের মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব? ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সমসাময়িক ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত

* ততঃ সমর সিংহাখ্যঃ পৃথ্বীরাজস্য ভূপতেঃ।
পৃথাখ্যায়া ভগিন্যাস্তু পতিরিত্যাতিহার্দতঃ॥
ভাষারাসা পুস্তকেঽস্য যুদ্ধস্যোক্তোস্তি বিস্তরঃ॥
রাজপ্রশস্তি, সর্গ ৩

† ওঝা-কৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস," ২য় ভাগ, পৃ. ৪৫০-৪৫৮।

না হইলে কোন কাব্যের নায়ক, বিশেষতঃ নায়িকাদিগকে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এইবার আমরা "পদ্মাবতীর ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধের কয়েকটি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিব।

পদ্মাবতের রচনাকাল

নিখিলবাবু 'পদ্মাবতে'র রচনাকাল সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের মত-সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য এক অদ্ভুত 'থিওরি' খাড়া করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৯২৭ হিজরীতে কাব্য-রচনা আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন ৯৪৭ হিজরীতে বোধ হয় গ্রন্থ শেষ হইয়াছিল। হিন্দী কাব্যের মুখবন্ধে "রাজস্তুতি" একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কাব্য আরম্ভের সময় যিনি রাজা থাকেন তাঁহার যশই কীর্তিত হইয়া থাকে। যাঁহার সিংহাসনে বসিবার বৎসরেই কাব্য সমাপ্ত হইল তাঁহাকেই কাব্যে বন্দনা করা হইয়াছে,—প্রবন্ধ-লেখক এমন আর একটি উদাহরণ হিন্দী কাব্যে দেখাইতে পারেন কি? তাঁহার উদ্ধৃত হিন্দী দোঁহার শেষ চরণ "কথা-আরম্ভ বেন কবি কহে" বাংলা না হিন্দী? নাগরী-প্রচারিণী-সভা পদ্মাবতের অনেক পুঁথির সাহায্যে এই কাব্য সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে ৯৪৭ হিজরীতে কাব্য আরম্ভ করা হইয়াছিল :—

সন নব সৈ সৈঁতালিস অহা।
কথা-আরম্ভ বৈন কবি কহা॥
সিংঘল দীপ পদমিনী রাণী।
রতন সেন চিতউর গঢ় আনী॥
অলাউদীন দেহলী সুলতানু।
রাঘৌ চেতন কীন্হ বখানু॥
সুনা সাহি গঢ় ছেঁকা আই।
হিন্দু-তুরুকন্হ ভই লরাই॥
আদি অন্ত জস গাথা অহৈ।
লিখি ভাখা চোপাই কহৈ॥

সন ৯৪৭ হিজরীতে কবি কথা-আরম্ভের "বাণী" (foreword) লিখিয়াছেন। সিংহল-দ্বীপের পদ্মিনী রাণীকে রতন সেন চিতোর-গড়ে আনিয়াছিলেন। রাঘবচেতন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে পদ্মিনীর রূপের বাখান করাতে শাহ্ গড় আক্রমণ করিতে আসিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের যুদ্ধ হইল। আদ্যন্ত "গাথা" বা কাহিনীর ন্যায় "ভাষা" [হিন্দী ভাষা]তে চৌপদী ছন্দে কবি বলিতেছেন।

মালিক মহম্মদ জ্যায়সী শের শা'র যে প্রশংসা করিয়াছেন উহা আব্বাস সরবানী-কৃত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' (আকবরের রাজত্বকালে লিখিত) গ্রন্থে উক্ত সম্রাটের গুণাবলী বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। অথচ 'পদ্মাবত' 'তারিখ-ই-শেরশাহী'র অনেক পূর্বে লিখিত। এই হিসাবে এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ৯২৭ হিজরীতে (১৫২০ খৃঃ) কাব্য আরম্ভ করিলে জ্যায়সী ইব্রাহিম লোদীর প্রশংসা করিতেন—অজ্ঞাতনামা ফকিরের খ্যাতি তখনও গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে নাই। সে-কালে গ্রন্থকারগণ নিজেদের পুস্তকের ভূমিকা আজকালকার লেখকদের মত সকলের শেষে লিখিতেন না। শ্রীহরি কিংবা বিসমিল্লা লেখার মত দেবস্তুতি, রসুল-বন্দনা ও চারি খলিফার গুণবর্ণন, রাজপ্রশংসা ইত্যাদি গ্রন্থারম্ভে না লেখা অশুভ বিবেচিত হইত। নিম্নলিখিত দোহা হইতে বুঝা যায় তিনি শের শা'র কার্য ও চরিত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।

সের সাহি দেহলী সুলতানু।
চারিউ খণ্ড তপা জস ভানু॥
ওহী ছাজ ছাত ঔ পাটা।
সব রাজৈ ধরা লিলাটা॥
জাতি সুর ঔ খাঁড়ে সুরা।
ঔ বুধিবন্ত সবৈ গুন পুরা॥

... ...

অদল কহৌঁ পুহুমী জস হোই।
চাঁটা চলত ন দুখবৈ কোই॥
নৌসেরবাঁ জো আদিল কহা।
সাহি আদল সরি সৌউ ন অহা॥
অদল জো কীন্হ উমর কে নাই।
ভই 'অহা' সকল দুনিয়াই॥
পরী নাথ কোহ ছুবৈ না পারা।
মারগ মানুষ সোন উছারা॥
গউ সিংহ রেগহি এক বাটা।
দুনৌহি পানি পিয় এক বাটা॥
নীর খীর ছানৈ দরবারা।
দুধ পানি সব করৈ নিরারা॥
ধরম নিরাউ চলৈ, সত ভাখা।
দুবর বলী এক সম রাখা॥

পুনি দাতার দই জগ কীহ্না।
　　অস জগ দান ন কাহু দীহ্না॥
বলি বিক্রম দানী বড় কহে।
　　হাতিম করণ তিয়াগী অহে॥
সের সাহি সরি পূজন কোউ।
　　সমুদ্র সুমের ভণ্ডারী দোউ॥

… … …

এস দানি জগ উপজা সেরসাহি সুলতান।
না অস ভয়েউ ন হোইহি না কোই দেই অস দান। (পৃ. ৪-৬)

—দিল্লীর শের শাহ্ সূর্যের ন্যায় প্রতাপে চারিদিক তাপিত করিতেছেন। রাজছত্র ও পট তাঁহারই শোভা পায়। সমস্ত রাজারা তাঁহার কাছে আভূমি নত-ললাট। জাতিতে তিনি সুর এবং তাঁহার তরবারিও সুরোচিত (পরাক্রমী)। তিনি ধীমান; সমস্ত গুণ পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে।… এইরূপ আদিল, অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ রাজা পৃথিবীতে কোথায়? তাঁহার রাজ্যে পিপীলিকাকেও কেহ দুঃখ দিতে সাহসী হয় না। খসরু "আদিল" (ন্যায়পরায়ণ) বলিয়া পরিচিত হইলেও ন্যায়নিষ্ঠায় তিনিও শের শার সমকক্ষ নহেন। তিনি খলিফা ওমরের তুল্য ন্যায়বিচার করেন। সারা দুনিয়ায় তাঁহার "বাহবা" (প্রশংসা) হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের নাকের নথ ছুঁইতে (অর্থাৎ গায়ে হাত দিতে) কিংবা রাস্তায় সোনা ছড়াইয়া রাখিলেও কাহারও উঠাইবার সাধ্য নাই। গরু ও সিংহ এক রাস্তায় ধূলি উড়াইয়া চলে; একঘাটে জল খায়। তাঁহার দরবারীরা দুধ হইতে জল আলাদা (অতি সূক্ষ্মভাবে সত্যমিথ্যা নির্ধারণ) করিতে পারে। তিনি ধর্মপথগামী এবং প্রিয়ভাষী; তিনি সবল দুর্বলকে সমানভাবে (শাসনে) রাখিয়াছেন।…তিনি দাতা; জগতে তাঁহার ন্যায় দান কেহ দেয় নাই। বলিরাজ ও বিক্রমাদিত্য বড় দানী ছিলেন বলিয়া লোকে বলে। হাতিম তাই (আরব দেশের) এবং কর্ণও ত্যাগী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শের শার সমান কেহ নয়; সমুদ্র ও সুমেরু তাঁহার ভাণ্ডার।…জগতে এমন দানী সুলতান শের শাহ্ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবে না, এবং এমন দানও কেহ দিবে না।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কবি শের শাহ্ রাজত্বে তাঁহার 'পদ্মাবত' রচনা আরম্ভ * করিয়াছিলেন—ইহার বিশ বৎসর পূর্বে নয়।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শহীদুল্লা বাংলা পদ্মাবতী পুঁথির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য হিন্দী, উর্দু ও আরবী অক্ষরে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ পুঁথিতে ৯৪৭ হিজরী কাব্যারম্ভের তারিখ দেওয়া আছে।

পদ্মাবতী পুঁথির শ্রীজা ব্রাহ্মণ

শ্রীজা নামক ব্রাহ্মণের কোন উল্লেখ জ্যায়সীর পদ্মাবতে নাই। সুলতান আলাউদ্দীনের পত্র লইয়া সর্জা নামে এক বীরপুরুষ চিতোরে গিয়াছিলেন। মূল পদ্মাবতে আছে—

সর্জা বীরপুরুষ বরিয়ারু।
তাজন নাগ সিংহ অসবারু॥
দীন্হ পত্র লিখি, বেগি চলাবা।
চিতউর-গঢ় রাজা পহঁ আবা॥ (পৃ. ২৪১)

বীরপুরুষের অগ্রণী সর্জা সিংহের উপর চড়িলেন। তাঁহার হাতে সাপের চাবুক। তাঁহার হাতে পত্র দিয়া সুলতান আদেশ করিলেন যেন দ্রুত চলিয়া চিতোর-গড়ের রাজার কাছে পৌছে।

সর্জা যে তুর্ক, অর্থাৎ মুসলমান, ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত দোঁহাতে পাওয়া যায়। রাজা রতনসেন দূতের ঘৃণ্য প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন—

তুরুক! জাই কহু মরৈ না ধাই।
হোইহি ইসকন্দর কে নাই॥ (পৃ. ২৪৩)

আলাউদ্দীন চিতোর অবরোধ করিয়া কৃতকার্য না হওয়ায় সর্জাকে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া রাজা রতনসেনের কাছে পাঠাইলেন। সর্জা সিংহে চড়িয়া আবার রতনসেনের কাছে গেলেন।

"সর্জা পলটি সিংহ চঢ়ি গাজা।
অজ্ঞা যাই কহো জঁহ রাজা॥ (পৃ. ২৬৪)

রতনসিংহকে উদ্ধার করিয়া বাদল চিতোর যাইতেছেন। গোরা মুসলমান সেনাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়ায় তুর্কী বীরগণ যুদ্ধে নামিলেন। কবি লিখিতেছেন—

"সর্জা বীর সিংঘ চঢ়ি গাজা।
আই সে'হ গোরা সোঁ বাজা॥
পহলবান সো বখানা বলী।
মদদ মীর হম্জা ও অলী॥
লঁধউর ধরা দেব জস আদী।
ঔর কো বর বাঁধৈ কো বাদী?
মদদ অয়ুব সীস চঢ়ি কোপে।
মহা কাল জেই নাঁব অলোপে॥

জো তায়া সালার সো আএ
জেই কৌরব পাণ্ডব পিড় পাএ॥ (পৃ. ৩২২)

বীর সর্‌জা সিংহে চড়িয়া শপথ গ্রহণপূর্বক যুদ্ধার্থ গোরার দিকে চলিলেন। তিনি বিখ্যাত পালোয়ান বীর—তাঁহার উপর মীর হামজা ও আলীর বর (মদদ) ছিল। তিনি পূর্বে নঁধউরের ন্যায় রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন। আর কে তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার শক্তি রাখে? তাঁহার সাহায্যার্থ আয়ুবও গর্বিতভাবে যুদ্ধে চলিলেন। তিনি (আয়ুব) 'মহামাদে'র নাম লোপ করিয়াছিলেন।

কৌরব-পাণ্ডবের ন্যায় (অর্থাৎ দুর্যোধনের ন্যায়) অভিমানী (পিড়—ফার্সি 'পিন্দার' শব্দের ঠেট্ হিন্দী অপভ্রংশ) তায়া সালারও (Salar of Tai tribe) আসরে নামিলেন। আমীর খসরু হইতে ফিরিশতা পর্যন্ত বরাঙ্গলের (Warangal) রাজার নাম Laddar Deo লেখা হইয়াছে। ইহা রুদ্রদেব নামের অপভ্রংশ। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর সর্বপ্রথমে ইহাকে পরাজিত করেন। ইতিহাসে আলাউদ্দীনের সেনাপতিদের মধ্যে সর্‌জা, আয়ুব কিংবা সালার তায়া নাম দেখা যায় না। ইতিহাসের মালিক কাফুরই উদ্ভট কবি-কল্পনায় সিংহের উপর সওয়ার, হাতে সাপের চাবুক বীর সর্‌জা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

গোরা ও "বাদিলা"

কবি আলাওলের বটতলার ছাপা 'পদ্মাবতী পুথি' আগাগোড়া পড়িলেও নিখিলবাবু 'বাদিলা'র পরিবর্তে বাদল লিখিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পদ্মাবতীতে তাঁহারা দুই ভ্রাতা" (প্রবাসী, পৃ ৮১৭)। জ্যায়সীর পদ্মাবতে গোরা বাদলকে দুই ভাই কিংবা খুড়ো-ভাইপো (যেমন টড্ লিখিয়াছেন) বলা হয় নাই। কবি বলিতেছেন—

গোরা বাদল রাজা পাহাঁ।
রাবত দুবৌ দুবৌ জনু বাহাঁ॥

রাজার কাছে গোরা ও বাদল ছিলেন। তাঁহারা দুজনই "রাবত" (সামন্ত), এবং উভয়েই রাজার ডান-হাত বাঁ-হাত।

গোরা ও বাদল রাজাকে আলাউদ্দীনের কারাগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া চিতোর যাইতেছেন। পথিমধ্যে মুসলমান-সেনাকর্তৃক তাঁহারা আক্রান্ত হইলেন। যুদ্ধ ও মৃত্যু অনিবার্য দেখিয়া গোরা বাদলকে বলিতেছেন—

তব অস্‌মন হোই গোরা মিলা।

পিতা মরৈ জো স'করৈ সাথা।
মীচু ন দেই পুতকে মাথা॥

বাদলা। তুই রাজাকে নিয়ে যা। সঙ্কট-সময়ে বাপ বৃথা ছেলের মাথা কাটায় না।

সুতরাং জ্যায়সীর মূল পুস্তকে গোরা-বাদলের পিতা-পুত্র সম্বন্ধই পাওয়া যায়। জ্যায়সীর পদ্মাবতের ভূমিকায় সম্পাদক রামচন্দ্র শুক্ল মহাশয় বাদলকে গোরার পুত্রই বলিয়াছেন (পৃ. ২৩)

তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা

মহম্মদ আবুল কাসেম ফিরিশ্‌তা দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর-দরবারের আশ্রিত ঐতিহাসিক। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তিনি তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। ফিরিশ্‌তা অনেক দেশ বেড়াইয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি যেখানে যাহার কাছে কিছু শুনিতেন, বিনা-বিচারে নিজের পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। এগুলি অধিকাংশই প্রমাণহীন মিথ্যা গুজব, কিংবা কাল্পনিক কাহিনী। জ্ঞানের প্রসার কম থাকায় তিনি ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করিতে না পারিয়া নিজের পুস্তকে এমন অনেকগুলি কথা লিখিয়াছেন যাহার জন্য প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই তাঁহার ভাগ্যে বেশী মিলিয়াছে। যাঁহারা মুসলমান-যুগের ইতিহাসের আধুনিক গবেষণার সহিত সাধারণভাবেও পরিচিত, তাঁহারাই জানেন, অধিকাংশ স্থলে ফিরিশ্‌তার নাম উল্লেখ করা হয়—তাঁহার ভুল সংশোধনের জন্য। ফিরিশ্‌তাকে অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাপ্ত হইয়াছে। উত্তর-ভারতের ইতিহাস হিসাবে ফিরিশ্‌তার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য নাই। হিন্দুস্থানের কথা দূরে থাক্‌, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসেরও তিনি সঠিক খবর রাখিতেন না; মিথ্যা জনশ্রুতিগুলিকে প্রামাণ্য ইতিহাসের ছাপ দিয়া তিনি অনেক ঐতিহাসিককে ফাঁপরে ফেলিয়াছেন। বাহ্‌মনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ফিরিশ্‌তার মাহাত্ম্যেই ব্রাহ্মণ গঙ্গুর ভৃত্য বলিয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন। (Briggs, vol. II, pp. 284-285.)

মেবারের রাজা রত্নসেন সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তা যাহা লিখিয়াছেন তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এক্ষণে বিচার করা প্রয়োজন। ৭০৩ হিজরীতে আলাউদ্দীনের চিতোর-জয় সম্পর্কে ফিরিশ্‌তা মেবারের কোন রাজার নাম করেন নাই, কিংবা সুলতান রাজা রত্নসিংহকে বন্দী করিয়া দিল্লী আনিয়াছিলেন এ-কথাও লেখেন নাই। (Brigg's Ferishta, i. 353.) কিন্তু ৭০৪ হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে

তিনি তৃতীয় গল্প ও রত্নসিংহের পলায়নের কথা যোগ করিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছেন, অথচ কখন এবং কি ভাবে রত্নসিংহ বন্দী হইলেন, এ-কথা ফিরিশ্‌তা লেখেন নাই। নিম্নলিখিত কারণে ফিরিশ্‌তার গল্প অবিশ্বাস্য :—

১। প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খস্‌রু চিতোর-অবরোধের সময় আলাউদ্দীনের সঙ্গে বরাবর ছিলেন। তিনি রত্নসেন, পদ্মিনী, গোরা, বাদল কাহারও নাম শোনেন নাই। স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া যে এই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও তিনি লেখেন নাই।

২। ফিরিশ্‌তার ইতিহাস-রচনার ২৫০ বৎসর পূর্বে জীয়াউদ্দীন বারণী 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' লিখিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের রাজত্বের অনেক গল্প তাঁহার পিতৃব্য আলাওল মুলুকের (আলাউদ্দীনের সময়ে ইনি দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন) নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আলাউদ্দীনের প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই বেশী করিয়াছেন। কিন্তু চিতোর-বিজয় সম্পর্কে আমীর খস্‌রুর চেয়ে বেশী কিছু বলেন নাই। ইহাতেও পদ্মিনী-উপাখ্যানের নামগন্ধ নাই।

৩। ফিরিশ্‌তার ১৫০ বৎসর পূর্বে মহারাণা কুম্ভকর্ণের রাজত্বকালে লিখিত 'একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্' গ্রন্থের রাজবর্ণন অধ্যায়ে লিখিত আছে—

স (=সমর সিংহঃ) রত্নসেনং তনয়ং নিযুজ্য
স্বচিত্রকূটাচলরক্ষণায়।
মহেশপূজাহতকল্মষৌঘঃ
ইলাপতিস্বর্গপতির্বভূব।
খু [খুঁ] মাণ বংশঃ [বংশ্যঃ] খলু লক্ষসিংহ -
স্তস্মিন্ গতে দুর্গবরংররক্ষ।
কুলস্থিতিং কাপুরুষৈর্বিমুক্তাং
ন জাতু ধীরাঃ পুরুষাস্ত্যজন্তি॥*

রতনসিংহের পিতা সমরসিংহ সম্বৎ ১৩৫৮ বিক্রম শতাব্দীর মাঘ মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৩৫৯ সম্বতের মাঘ মাসের তারিখ-যুক্ত রত্নসিংহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছয় মাস অবরোধের পর সোমবার, ১১ই মহরম, ৭০৩ হিঃ (বি. সং ১৩৬০ ভাদ্র শুক্লা-চতুর্দশী—২৬এ আগষ্ট, ১৩০৩ খৃঃ) আলাউদ্দীন চিতোর অধিকার করেন। সুতরাং রাবল রতনসিংহ এক বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাঁহারা "পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতা" প্রমাণে উৎসাহী, তাঁহারা

* মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা-কৃত "রাজপুতানেকা ইতিহাস", ২য় ভাগ, ৪৮৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

এত অল্প সময়ের মধ্যে রতনসেনের সিংহল-যাত্রা, আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ, কারাবাস, মুক্তি ইত্যাদির সমাবেশ হয় কিনা বিবেচনা করিবেন। একলিঙ্গ-মাহাত্ম্যের শ্লোক হইতে বুঝা যায়, রতনসেন-পদ্মিনী-বিষয়ক উপাখ্যান তখন পর্যন্ত মেবারের মাটিতে গজায় নাই।

৪। ফিরিশ্‌তা লিখিয়াছেন রাজা রতনসেন কারামুক্ত হইয়া আলাউদ্দীনের রাজ্য লুটপাট করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া চিতোর-দুর্গ তাঁহার ভাগিনেয়কে দিয়াছিলেন। অথচ 'একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্‌' হইতে প্রমাণ হয়, চিতোর-দুর্গ পতনের পূর্বে রতনসিংহ মারা গিয়াছিলেন। রতনসিংহের মৃত্যুতে গহ্‌লোত-বংশের "রাবল" শাখা নির্মূল হওয়ায় শিশোদে-সামন্ত রাণা উপাধিধারী অপর শাখা মেবারের গদী পাইলেন। লাক্ষসিংহের পৌত্র হম্মীরই মুসলমানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করাতে জালোর ভূতপূর্ব অধিকারী মালদেব সোন্‌গরাকে সুলতান চিতোর-দুর্গ দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেবার-ইতিহাস সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার সাধারণ জ্ঞানও ছিল না।

'পদ্মাবত', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', এবং টডের রাজস্থানোক্ত পদ্মিনী-উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পণ্ডিত গৌরীশঙ্করজীর মতামত ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সংক্ষেপে উহার পুনরুক্তি করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"কর্ণেল টড এই কথা [পদ্মিনী-উপাখ্যান] মেবারের ভাটদের উপর নির্ভর করিয়া [আধার পর] লিখিয়াছেন এবং ভাটেরা উহা 'পদ্মাবত' হইতে লইয়াছে। ......'পদ্মাবত', 'তারিখ ই-ফিরিশতা, এবং টডের রাজস্থানের বর্ণনার যদি কোন মূল থাকে তবে তাহা এটুকু—আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর-দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাজা রতনসিংহ লক্ষ্মণসিংহ প্রভৃতি অনেক সামন্তের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান। তাঁহার রাণী পদ্মিনী বহু স্ত্রীগণের সহিত অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন করেন। এই প্রকারে চিতোর-দুর্গে অল্পদিনের জন্য মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়—বাকী সমস্ত কথা বহুধা কল্পনামূলক।" ('প্রবাসী', পৃ. ৮১৪-৮১৫)

এখন যে 'রাজপ্রশস্তি' কাব্যকে নিখিলবাবু পদ্মাবতের ঐতিহাসিকতার সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক্‌।

আওরংজেবের সমসাময়িক মহারাণা রাজসিংহের "রাজসমুদ্র" সরোবরের বাঁধে পচিশখানি শিলাখণ্ডের উপর এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা পুরোহিত গরীবদাসের পুত্র রণছোড়দাস এবং রচনাকাল বি. সম্বত ১৭৩২ (জানুয়ারী

১৭৬৩ খৃ.)। নিখিলবাবু বলিয়াছেন, "রাণা-বংশের অনুমতিক্রমে লিখিত হওয়ায় তাহারই কথা বিশ্বাসযোগ্য" (পৃ. ৮১৬)। এটি শুধু অনুমান। গৌরীশঙ্করজী এই প্রশস্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাঁহার চেয়ে এই প্রশস্তির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে তিনি ইহা উদ্ধৃত করিয়া নিশ্চয় বিচার করিতেন। কিন্তু পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্পর্কে ইনি কোথাও রাজপ্রশস্তির উল্লেখও আবশ্যক মনে করেন নাই। ইহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন—"প্রারম্ভের কয়েকটি সর্গে মেবারের যে প্রাচীন ইতিহাস লেখা হইয়াছে উহা ভাটদের খ্যাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হওয়ায় অধিক বিশ্বাসযোগ্য নয়…" (ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৮৭)।

মেবারের সকল প্রশস্তি ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া লিখিত হইত না। তিন শত সত্তর বৎসর পরে রচিত একটি কাব্যকে আমীর খসরু-কৃত সমসাময়িক ইতিহাস 'তারিখ-ই-আলাই', এবং জীয়াউদ্দীন বারণীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র চেয়ে অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত কিনা সুধীমণ্ডলী বিচার করিবেন। আলাউদ্দীনের সময়ের কথা দূরে থাক, আকবরের সমকালীন মহারাণা প্রতাপের ইতিহাস সম্বন্ধেও রাজপ্রশস্তিকার ভুল করিয়াছেন। প্রশস্তি-রচনার এক শত বৎসর পূর্বে হলদীঘাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধ-বর্ণনায় প্রতাপের পলায়ন, খোরাসানী ও মুলতানী সৈনিকের পশ্চাৎ অনুসরণ, "খোরাসানী মুলতানীকা অর্গল" শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষার কথা লিখিত হইয়াছে। অথচ শক্তসিংহ হলদীঘাটের যুদ্ধে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না, এবং বদায়ুনী—যিনি স্বয়ং মোগলপক্ষে লড়াই করিয়াছিলেন—লিখিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধশেষে সারাদিন মোগলেরা রাণার গুপ্ত আক্রমণের ভয়ে আড়ষ্ট ছিল; রাণাকে অনুসরণ করিবার মত শক্তি মোগলদের ছিল না। ইহার চেয়ে অমার্জনীয় ভুল—রাজপ্রশস্তিকার লিখিয়াছেন, প্রতাপ "সেখু" অর্থাৎ কুমার সেলিমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, অথচ মোগল-দরবারের ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ হয় কুমার সেলিম প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযান করেন নাই; প্রতাপের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে কুমার সেলিম মহারাণা অমরসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবত-উপাখ্যানের জন্য রাজপ্রশস্তির প্রামাণিকতা কতটুকু ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়।

টডের 'রাজস্থান' (১৮২৯)

মহামতি টড সাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজস্থানের ইতিহাস

উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজপুতানার ইতিহাস অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভাট-চারণেরা ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কল্পনা-মূলক "খ্যাত" ইত্যাদি গান করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। এই খ্যাতগুলিতে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির উপন্যাস-নাটকের চেয়েও প্রকৃত ইতিহাসের ভাগ কম ছিল। টড সাহেব আঁধারে হাতড়াইয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজ হইতে মনগড়া কিছু লিখেন নাই; কিন্তু ভাট ও কবিদের মনগড়া কথায় তাঁহার ইতিহাস ভর্তি করিয়াছেন। এটা ঐতিহাসিকের আপদ্ধর্ম—"মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা। ধরুন আজ হইতে দুই শত বৎসর পরে কোন রাজনৈতিক কিংবা প্রাকৃতিক বিপ্লবে আমাদের দেশ হইতে আকবর, আওরঙ্গজেব প্রভৃতির সমসাময়িক ফার্সি ইতিহাস এবং স্যর যদুনাথ ইত্যাদির গবেষণামূলক ইতিহাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে—শুধু বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলালের উপন্যাস ও নাটকগুলি রহিয়া গেল। এ অবস্থায় আমেরিকার কোন পণ্ডিত যদি এদেশের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন এবং উপন্যাস ও নাটকগুলির চুম্বক-কথা ইতিহাসের আকারে লিখিয়া যান, উহা যেরূপ ইতিহাস দাঁড়াইবে টডের ইতিহাসও প্রায় সেই রকম দাঁড়াইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় চল্লিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজপুতানার ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া টডের রাজস্থানের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ-কাজে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি ছাড়িয়া দিয়াছেন; কারণ তিনি দেখিলেন, শুদ্ধ করিতে গেলে খোল-নলিচা দুই-ই বদলাইতে হয়। সেইজন্য তিনি হিন্দীতে "রাজপুতানেকা ইতিহাস" লিখিয়া মহামতি টডকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইহার তিন খণ্ড ছাপা হইয়া গিয়াছে।

টডের রাজস্থানের ভুল সংশোধন এবং নূতন আলোকপাত করিয়া এই শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত যেমন গবেষণা চলিয়াছে, ভবিষ্যতে সেরূপ গৌরীশঙ্করজীর ইতিহাসকে আধার করিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চলিবে। এ-সম্বন্ধে আমরা গৌরীশঙ্করজীর মত উদ্ধৃত করিতেছি—"রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় উদয়পুর-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসও এখন পর্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। কর্ণেল টড প্রমুখ পণ্ডিতেরা গুহিল হইতে সমরসিংহ কিংবা রত্নসিংহ পর্যন্ত রাজাদের যে-কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন উহা প্রায় কিছু না-লেখার মত [নহী"-সা] এবং বিশেষতঃ ভাটদের খ্যাত অবলম্বন করিয়া লিখিত হওয়ায় দরুন অধিক প্রামাণ্য নহে।" (রাজপুতানেকা

ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৫১৫)

আমাদের মনে হয়, পদ্মিনী-উপাখ্যানের উৎপত্তিস্থান মেবারভূমি নয়, অযোধ্যা প্রদেশ—যেখানে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী এই কাব্য রচনা করেন। 'জ্যায়সী গ্রন্থাবলী'র সম্পাদক মহাশয় বলেন, পদ্মাবতের পূর্বার্ধ জ্যায়সী অযোধ্যার প্রচলিত কাহিনী হইতে লইয়া মনোরম কল্পনা দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "উত্তরভারতে, বিশেষতঃ অযোধ্যায়, 'পদ্মিনীরাণী এবং হীরামন তোতা'র গল্প আজ পর্যন্ত প্রায় ঐ রকমই বলা হয় যেমন জ্যায়সী উহার বর্ণনা করিয়াছেন। জ্যায়সী ইতিহাসবিজ্ঞ ছিলেন; এই জন্য উনি রতনসেন, আলাউদ্দীন প্রভৃতির নাম দিয়াছেন; কিন্তু কাহিনী-কথকেরা বলে, "এক রাজা ছিল" "দিল্লীর এক বাদ্শা ছিলেন" ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দু-এক পদ গাহিয়া গাহিয়া ইহারা গল্প বলে।··· এই প্রকার "বালা-লখন-দেব" ইত্যাদি আরও রসাত্মক কাহিনী প্রচলিত আছে।" (পৃ. ৩০)

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে নেপালের সেন-রাজগণের এক বংশাবলী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃতে লিখিত, রচয়িতা ভবদত্ত; পুঁথির নাম "রত্নসেন-কুলবংশাবলী"; রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ইহাতে লেখা আছে
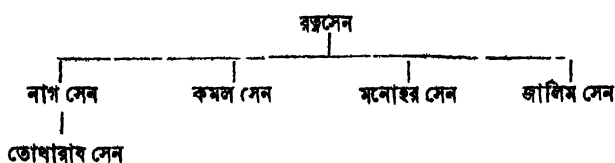
কুলপ্রতিষ্ঠাতা রত্নসেন অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বংশের আদিস্থান ছিল "চিত্তউর"। তাঁহার পুত্র নাগ সেন (?) এলাহাবাদে রাজা হইয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তোথারায় সেন মধ্যদেশ বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া উত্তরাপথের পার্বত্য প্রদেশে ঋদ্ধিকোটায় রাজ্যস্থাপন করেন। (Indian Historical Records Commission Proceedings vol- XII, p. 64.)। এই চিত্তোর কি রাজপুতানার চিতোর? রাবল রতনসীর কোন সন্তানাদির উল্লেখ রাজপুত ইতিহাসে নাই। তবে গৌরীশঙ্করজী লিখিয়াছেন, রতন সিংহের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ হইতে নেপাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ বলে। (রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃ. ৪৮৩)

আমাদের মনে হয়, মধ্যদেশের রতনসেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী-স্ত্রীবিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিল। মুসলমান কবি উহাকে মুসলমান ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের কাঠামো নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তবে জ্যায়সী "ঐতিহাসিক কাব্য" লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। যদি তাহাই হইত, হীরামন তোতা, রাঘবচেতন, সাত সমুদ্রের পারে সোনার সিংহল, সিংহের উপর সওয়ার 'সবুজা' বীর ইত্যাদি ইহাতে স্থান পাইত না। পাছে লোকে তাঁহার কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া ভ্রম করে সেজন্য তিনি উপসংহারে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, 'পদ্মাবত' একটি allegorical poem; রতনসেন মন-স্বরূপ—আমাদের দেহরূপী চিতোরের রাজা, ইনি মেবার-রাজ সমরসিংহের পুত্র নহেন। হৃদয়-রূপ সিংহল দ্বীপে 'বুদ্ধি'-রূপা পদ্মিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইতিহাসে পদ্মিনী রাণীকে খোঁজা বৃথা।

বাদশাহী আমলের কাহিনী

১

সৈয়দ মুসা বাদশাহী দরবারে চাকরি করিতেন, নিবাস বর্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কান্নৌ শহর, বাপের নাম সৈয়দ মীকরী। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি একদিন সৈয়দ মুসা একাকী আগ্রা শহরের রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শিকারী চোখ দুইটি ডাইনে বাঁয়ে গৃহস্থবাড়ীর ছাদ ও জানালার ফাঁকে কি যেন অন্বেষণ করিতেছিল। হিন্দু মহলার মধ্য দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এক বাড়ীর ছাদের উপর মোহিনীকে দেখিয়া মুসা প্রেমে পড়িলেন, অথচ উভয়ের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। মোহিনী হিন্দু গৃহস্থের কুলবধূ, স্বর্ণকারের মেয়ে, সোনার মত রং, ছাঁচে ঢালা গড়ন—অপূর্ব সুন্দরী। সেই যুগে আগ্রা শহরের স্বর্ণকার মহিলাগণের রূপের খ্যাতি ছিল।*

২

বাদশাহী ফৌজের সহিত জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত রনথম্ভোরে যাত্রা করিবার জন্য সৈয়দ মুসার উপর হুকুম হইয়াছিল। মোহিনীকে দেখিয়া তাঁহার যাত্রা ভঙ্গ হইল। কোন অছিলায় সৈয়দ মুসা আগ্রা শহরে থাকিয়া গেলেন। মোহিনীর বাড়ীর কাছেই যমুনার ধারে তিনি এক বাড়ী ভাড়া করিলেন, নিকটেই তাঁহার বন্ধু মীর সৈয়দ জালালউদ্দীন মুতাওয়াক্কিলের বাড়ী। মুসা নিশ্চেষ্ট বসিয়া নাই, কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ কাহিল হইয়া উঠিল। কয়েকজন দরদী বন্ধুর সহিত দুই-এক বার নৈশ অভিসার করিয়া তিনি হয় পাহারাওয়ালা না হয় মোহিনীর বাড়ীর লোকজনের হাতে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পিঠের ব্যথা সারিলেই আবার তাঁহার অবুঝ মন কেমন করে। এই ভাবে দুই বৎসর চারি মাস কাটিয়া গেল। দূর হইতে মোহিনীকে তিনি দেখিয়াছেন, মোহিনী সাড়া দিয়াছে, মালিনী মাসী মারফত খবরাখবর চলিয়াছে।

---

* বৈরাম খাঁর পুত্র খান্-খানান আব্দুর রহীম "নগর শোভা" নামক হিন্দী কবিতায় লিখিয়াছেন—

পরমরূপ কঞ্চনবরণ, শোভিত নারী সুনারি
মানে ৗ সাঁচে ঢারিকে, বিধিনা গঢ়ী সুনারি॥

[অর্থাৎ পরমরূপবতী কাঞ্চনবর্ণী স্বর্ণকার-নারীকে বিধাতা যেন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছেন।]

এক দিন রাত্রির অন্ধকারে মোহিনী বাড়ীর ছাদ হইতে নীচে দড়ি ঝুলাইয়া দিল। দড়ি বাহিয়া সৈয়দ সাহেব উপরে উঠিলেন, মোহিনী সৈয়দ মুসার সহিত গৃহত্যাগ করিল। এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহারা তিন দিন পলাইয়া রহিল। সৈয়দ মুসা এবং মোহিনীর ত্রিরাত্র নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হয় নাই। মোহিনীর শ্বশুরপক্ষের লোকজন খবর পাইয়া ঐ বাড়ীর চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইল এবং কোতোয়ালীতে মামলা রুজু করিবার ভয় দেখাইল। নানা রকম মিথ্যা কথা বলিয়া মুসার ছোট ভাই হিন্দুদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় ছিল। ইংরেজ আইনে এইরূপ ব্যাপার লইয়া কোন মোকদ্দমাই চলিতে পারে না—মোহিনী সুন্দরী বোরখা পরিয়া আদালতের কাছে একবার মনের কথা খুলিয়া বলিলেই আসামী খালাস, অধিকন্তু শোভাযাত্রা সহ নগর পরিক্রমা। কিন্তু এই প্রকার প্রেমের বাতিক দমন করিবার জন্য আকবর বাদশাহ আইন জারি করিয়াছিলেন, কোন হিন্দু স্ত্রীলোক মুসলমানের সঙ্গে পলাইয়া গেলে, কিংবা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া তাহার পরিবারবর্গকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।* ইহার উপর কাজীর আদালতে মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমানের জন্য ব্যভিচারের দণ্ড। সুতরাং কোন প্রকারে অব্যাহতি নাই দেখিয়া মোহিনীর মাথায় নূতন বুদ্ধি গজাইল। সৈয়দ মুসাকে কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া গোপনে রহস্যজনক ভাবে মোহিনী রাত্রির অন্ধকারে নিজের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিল। ভাব-গোপন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং অশিক্ষিতপটুত্বে সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীজাতির সমকক্ষ নাই। মোহিনী নির্বিকার চিত্তে অনর্গল এক পরীর গল্প শুনাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিল। যথা—

"সেই দিন রাত্রিতে যখন আমি ঘুমাইতেছিলাম হঠাৎ জাগিয়া দেখিতে পাইলাম ঘরের মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর পুরুষ সবই মানুষের মত কিন্তু ডানা পালক আছে। সে আমাকে যাদু করিয়া পাখার উপর তুলিয়া উড়িয়া চলিল। ইহার পর দেখিতে

* দ্রষ্টব্য—If a Hindu woman fell in love with a Musalman and entered the Muslim religion, she should be taken away by force from her husband and restored to her family. [Lowe, Badayuni Eng. trans. vol. II, p. 406]

কোন্ অবস্থায় বাদশাহকে এই আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল উহা উল্লেখ না করিয়া ঐতিহাসিক আকবরের প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

পাইলাম পরীর আজব শহর—চারিদিকে দিব্যপরী, সুন্দরী পরীরা আমার সেবা করিবার জন্ম দাঁড়াইয়া আছে। আমি কিন্তু কান্নাকাটি করিয়া অস্থির। মাকে দেখিবার জন্ম প্রাণ বাহির হইতে চায়, ভায়ের শোকে ছাতি ফাটিবার উপক্রম, বাবাজীর কথা মনে পড়িতেই দুঃখের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে। তিন দিন অবিশ্রান্ত কান্না এবং ছটফটানি। পরীরা অবশেষে দয়াপরবশ হইয়া ডানায় তুলিয়া এই জায়গায় আমাকে আবার রাখিয়া গিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, প্রগতির যুগে পরীর প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেও এখনও গ্রামাঞ্চলে ইহাদের কথা শুনা যায়। কিন্তু মুসলমান আমলে যত্র তত্র "দেও", পরী জীন। ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বোকা হিন্দুরা মোহিনীর এই গালগল্প বিশ্বাস করিয়া বসিল; কিন্তু তবুও জালিম কাফেরগণ সাতরাজার মাণিক মোহিনীকে উপরের তলায় এক কোঠায় তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখিত। ওদিকে আসল ব্যাপার লইয়া মহল্লায় লোকজন কানাঘুষা করিতে লাগিল। কেলেঙ্কারি প্রকাশ হইবার ভয়ে মোহিনী সুন্দরী দূতীর মারফত সৈয়দ মুসাকে খবর পাঠাইল, "ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে। তুমি শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাও। একজন বন্ধুকে বলিয়া যাইও যেন আমার কথা দিনের দিন তোমাকে জানাইতে পারে।"

৪

মোহিনীর কথামত সৈয়দ মুসা আগ্রা ছাড়িয়া রাজপুতানার দিকে শাহী ডেরায় গা ঢাকা দিলেন। শহর হইতে আপদ দূর হওয়ায় মোহিনীর ঘরে তালাচাবির প্রয়োজন ফুরাইল। এই সুযোগে সৈয়দ মুসার আগ্রানিবাসী বন্ধুর সহিত মোহিনী দ্বিতীয়বার বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। বন্ধু ছদ্মবেশে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইতেই ভিখারী বিদায়ের অছিলায় মোহিনী নীচে গিয়াছিল, আর ফিরিল না। তিনি দিন এক দরদী আশ্রয়দাতার গৃহে লুকাইয়া থাকিয়া সৈয়দ মুসার সহিত মিলিত হইবার জন্ম মোহিনীকে বোরখা পরাইয়া বন্ধু বিয়ানা ও ফতেপুর সিক্রীর দিকে চলিয়াছিল। নাছোড়বান্দা স্বর্ণকারেরা সন্ধান পাইয়া আসামী ধরিবার জন্ম ছুটিল। বোরখার ভিতর হইতে মোহিনীর রূপ ফাটিয়া পড়িতেছিল। হিন্দুরা চেঁচামেচি করিতেই শহর-কোতোয়াল পালোয়ান জামালের সান্ত্রীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহারা মোহিনীকে হিন্দুগণের হেফাজতে ছাড়িয়া দিয়া দোস্তকে শ্রীঘরে লইয়া চলিল। অনেক দিন আনুষঙ্গিক আরামের সহিত কয়েদখানায় থাকিয়া বন্ধু কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিল।

সৈয়দ মুসা এই সময় বাদশাহী ফৌজের সহিত সফর করিতেছিলেন। দুঃসংবাদ পাইয়া তিনি আগ্রা শহরে ফিরিলেন, শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিরহতাপে মজিয়া বদায়ুনীর ভাষায় মুসার দেহ কৃষ্ণা চতুর্দশীর চাঁদের ন্যায় সরু হইয়া গেল। সৈয়দ মুসার উন্মাদ-অবস্থা। কখনও নিজের গলায় ছুরি বসাইতে চায়, কখনও পাগলের মত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মোহিনীকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ছুটিয়া যায়। তাঁহার ভাই-বেরাদরগণ কখনও ভাল কথা, কখনও গালাগালি, কখনও বা ভয়প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিত। কারণ, এইবার আঁধার ঘরে মোহিনী সুন্দরীর হাতে শিকল পড়িয়াছে; চারিদিকে জটিলা-কুটিলার পাহারা।

৫

সৈয়দ মুসার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আর একজন অতি দরদী বন্ধু কাজী জামালের দয়া হইল। কাজী সাহেবের নিবাস সরকার কান্নৌর শিব-কাণপুর পরগণা, কার্যোপলক্ষে আগ্রায় থাকিতেন। কাজী জামালের কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি ছিল, হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। এইবার তিনি মোহিনী হরণের ভূমিকায় নামিলেন।

একদিন সূর্যাস্তে মগরীবের নমাজের পর আগ্রা শহরে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। শহরের রাস্তার মধ্য দিয়া এক অশ্বারোহী বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, অশ্বারোহীর পশ্চাতে উপবিষ্টা একজন যুবতী স্ত্রীলোক। একদল হিন্দু তাহাদিগকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে, তামাশা দেখিবার জন্য লোকজন চারিদিক হইতে বাহির হইয়া রাস্তার মোড়ে ভিড় জমাইয়া সাবাস সাবাস চীৎকার ছাড়িতেছে। অশ্বারোহী বেগতিক দেখিয়া শহরের বাহিরে উত্তরগামী কাঁচা রাস্তা ধরিল। জমিতে জলসেচ করিবার জন্য কৃষকেরা রাস্তার ধারে নালা কাটিতেছিল, ভয়চকিত অশ্ব আরোহীদ্বয়কে লইয়া এক খাদে পড়িয়া গেল। পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া যুবতী ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গীকে বলিল, "জান বাঁচাও, খবর দিও।" গর্তে পতিত বউচোর কাজী জামালের কি দশা হইল জানা নাই, তবে মোহিনীকে শিকলে ঝুলাইবে না বুঝিতে পারিয়া এইবার তাহার পায়ে বেড়ী দেওয়া হইল। এই সংবাদ পাইয়া সৈয়দ মুসার নির্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল।

মোহিনীর কি হইল? যাহারা জানিবার জন্য উৎসুক তাঁহারা Lowe সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত বদায়ুনীর ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ (পৃঃ ১২০--২৫) পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু মূল উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতা পরিশিষ্টে নাই। সৈয়দ মুসার ছোট ভাই সৈয়দ শাহী মুসা-মোহিনীর কেলেঙ্কারি অবলম্বন করিয়া একটি ফার্সী কবিতা লিখিয়াছিলেন, নাম 'দিলফেরেব' 'মন-মোহিনী'। উক্ত অংশে বদায়ুনী দিলফেরেব হইতে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মোহিনীর কাল্পনিক পরিণাম মূল উপাখ্যানে সংযোজনা করিলে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এই আশঙ্কায় উহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দুনিয়ার হাট হইতে দোকানপাট গুটাইবার পর সৈয়দ মুসার 'জনাজা' বা শবানুগমনের মিছিল বাহির হইল। মোহিনীর বাড়ীর সামনের রাস্তা ধরিয়া শবযাত্রা অগ্রসর হইবার সময় ছাদের উপর হইতে পায়ে শিকল-বাঁধা মোহিনী কিছুক্ষণ 'প্রেমের শহীদ' সৈয়দ মুসার শেষযাত্রা দেখিতেছিল। হঠাৎ চীৎকার করিয়া মোহিনী ছাদ হইতে রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল, শিকল কাটিল, তবু পা মচকাইল না। মোহিনী এইবার সোজা মুসার কবরের দিকে দৌড়াইল, পাগলিনীকে কেহ বাধা দিল না। মোহিনী নির্জনে কবরের ধারে বসিয়া এক খণ্ড পাথর দিয়া বুকে আঘাত করিত, মুখে মুসার নাম, এবং রাই উন্মাদিনী পালার বিরহ বিলাপ। এই অবস্থায় একদিন মোহিনী পাগলী ধার্মিক মীর সৈয়দ [সেই কাজী?] জলালের নিকট উপস্থিত হইয়া জমায়েতের সামনে কলমা পড়িয়া ইসলাম কবুল করিল এবং 'মুসা' 'মুসা' ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে মরিয়া গেল।"

আকবরশাহী আমলে মুসলমান সমাজে প্রেমব্যাধির প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক লক্ষিত হয়। যৌবনে স্বয়ং আকবর বাদশাহ আগ্রা শহরে কিছু কিছু দুষ্কর্ম করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। মোল্লাদের মধ্যে প্রবীণ দল অপেক্ষাকৃত নির্মল চরিত্র ছিলেন, বৃদ্ধেরা যাহাকে ব্যভিচার মনে করিতেন, বদায়ুনী-প্রমুখ নবীন দল সেই ব্যাপারকে প্রেমের বিকার বলিতেন। একজন শেখজাদা দরবারী আমীর মকবুল খাঁর নর্তকীকে চুরি করিয়াছিল কিন্তু পরিজনবর্গের আপত্তিতে তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। নবীনের দল [বয়সে নয়, ভাবে] ফতোয়া দিলেন, আত্মহত্যাকারী "প্রেমের শহীদ" মহাপুণ্যবান্, সুতরাং যে স্থানে যে

অবস্থায় শেখজাদা নর্তকীর জন্য নিজের বুকে ছুরি চালাইয়াছে সেই জায়গায় রক্তমাখা কাপড়চোপড় সমেত তাহাকে মাটি দিতে হইবে। কিন্তু প্রধান সদর বৃদ্ধ শেখ আবদুন্নবী প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া ধমকাইলেন, মৃত ব্যক্তি অশুচি এবং ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইয়া মরিয়াছে। এই প্রকার প্রেমব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক সংঘবদ্ধ সমাজ এবং দারুণ প্রহার। এই কথা সরলপ্রাণ ঐতিহাসিক বদায়ূনী নিজে অকপটচিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—

মোল্লা বদায়ূনী কিছুদিন কনৌজের অন্তর্গত কসবা মাকনপুরে শাহ্-মাদার সাহেবের "মজার" বা কবর-তীর্থের তত্ত্বাবধায়ক (মহান্ত) ছিলেন। সমাগত যাত্রিগণের সাহায্য এবং গরীব দুঃখীকে দান-খয়রাত দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। পরিষ্কার করিয়া না বলিলেও বুঝা যায় তাঁহার একটু রূপের নেশা ছিল—উহার উপর আবার সুফিয়ানা মৌতাত, তবে তিনি কোন দিন হারামের পথে পা দেন নাই।

একদিন মাদার সাহেবের মকবরায় যাত্রিগণের মধ্যে এক অসামান্যা সুন্দরী মুসলমান যুবতীকে দেখিয়া মোল্লা সাহেবের মতিভ্রম উপস্থিত হইল। ইহার ফলে একটা হাঙ্গামা বাধিল এবং যুবতীর আত্মীয় পুরুষগণ মোল্লা সাহেবের মাথায় হাতে পিঠে তলোয়ারের নয়টা কোপ বসাইয়া দিল। মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন উহার মধ্যে সাতটি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, কেবল চামড়া কাটা। কিন্তু অষ্টম কোপে তাঁহার বাঁ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর শিরাগুলি কাটিয়া গিয়াছিল এবং নবম কোপে মাথার খুলি কাটিয়া মস্তিষ্কের কিছু ঘি বাহির হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কেয়ামতের পূর্বে মোল্লা সাহেব আর জাগিবেন না ভাবিয়াই তাঁহার মাশুক বা প্রিয়তমার গোঁয়ার সঙ্গীদল বোধ হয় মুণ্ডটি না কাটিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আঘাতের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তাঁহার ধর্মবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি শপথ করিলেন এ যাত্রা রক্ষা পাইলে মক্কা যাইবেন এবং হজ সমাপ্ত করিয়া নবজাত শিশুর মত "মাসুম" বা নিষ্পাপ হইয়া ফিরিবেন। কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া মোল্লা সাহেব নিজ বাটী বদায়ূঁ শহরে ফিরিলেন। সেখানে আবার পীড়িত হওয়ায় একজন অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার মাথার খুলির ঘায়ে আবার অস্ত্রোপচার করিল—মোল্লা সাহেব প্রায় যাইবার পথে। এই সময়ে একদিন সুষুপ্তি অবস্থায় তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা বা দেবদূতগণ আশমানে উঠাইয়া বাদশাহী দরবারের মত এক আদালতে উপস্থিত করিল। সেখানে চারিদিকে বাকায়দা সিপাহী-সান্ত্রী, দপ্তরী-কেরানী

লেখার কাজে ব্যস্ত, মসনদের উপর একটি কিতাব।*

যাহা হউক্, ইহার পরে আকবর বাদশার চাকরি আরও কিছু দিন বাহাল রাখিবার জন্য যমদূতগণ মোল্লা সাহেবকে আবার দুনিয়ায় ফেরত লইয়া আসিয়াছিল। ইহা না হইলে "মোহিনীর প্রেম" মাঠে মারা যাইত, কোন ইতিহাসে উহার হদিস মিলিত না।

* Lowe, Badayuni II, pp. 140-142

মাতুল ও ভাগিনেয়

ইতিহাস এক হইয়াও সাধকের অভীষ্টানুযায়ী বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; ভাবিতেছি ইহার কোন্ রূপ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিব। ঐতিহাসিক দিক্‌দেশরূপী (Space) শিবের বক্ষে উদ্দাম-নৃত্যপরায়ণা সর্বসংহারিণী মহাকালীর (Time eternal) পূজারী। এই পূজার পুষ্পাধার স্বয়ং ধরিত্রী, অর্ঘ্যপাত্র কৃত্তি মানবের নরকপাল; মাল্য কাল-সূত্র-গ্রথিত শূর-শ্রেষ্ঠগণের মুণ্ডমালা; বস্ত্র প্রথিতযশা বীরবৃন্দের শস্ত্রভিন্ন বাহুপুঞ্জ-নির্মিত কাঞ্চী; গন্ধ বিদ্বৎ-মণ্ডলীর যশঃ-সৌরভ; দেবীর আবাহন-সঙ্গীতের রাগ মালকোষ,* রাগিণী ভৈরবী; ইহার বলি অখিল জীবগ্রাম এবং বাদ্য প্রলয়ের বিষাণ। এই পূজার অঙ্গ-স্বরূপ "আবরণ-দেবতা" বা "বীরপূজা" (Hero-worship) ঐতিহাসিকের অবশ্যকর্তব্য; এজন্য স্থূলদৃষ্টিতে ইতিহাসকে "বীরপূজা" বলিয়া ভ্রম হয়। বাস্তবিক পক্ষে যিনি বীর, তিনি কালজয়ী; তাঁহাদের কীর্তি ইতিহাসের প্রাণবস্তু। স্বয়ং মহাকাল শ্রদ্ধাসহকারে বীরের স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষা করিয়া থাকেন—যোগীশ্বরের জপমালায় এজন্য বীরমুণ্ডই স্থান পাইয়া থাকে। বঙ্গ-জননী সদ্য বীর-পুত্র-হারা হইয়াছেন; কিন্তু শূর-কবির (Hero as a Poet) মহিমান্বিত কীর্তি মহাকালের যুগান্ত-বিস্তৃত দশনান্তরাল হইতেও বিপুলতর; তাই কবি রবীন্দ্রনাথ কালগ্রাসে পতিত হইলেও তাঁহার যশঃশরীর অনাগত কাল পর্যন্ত মহাকালের "দশনান্তরেষু বিলগ্ন" হইয়াই থাকিবে। বীরসাধকের ধ্যানের বিষয়ীভূত ইতিহাসের এই বিরাট রূপ দর্শনের অধিকারী সকলেই নয়; সুতরাং সার্বজনীন দুর্গা পূজার আসরে ইতিহাসের মহাকাল-রূপ দর্শনীয় নহে। ইতিহাসের নামে চিত্রগুপ্তের খাতার এক পৃষ্ঠা নকল করিয়া দিলে উহা হয়ত প্রেতপক্ষে কাহারও প্রয়োজনে লাগিত; কিন্তু দেবীপক্ষে উহা অচল। "আবুল-ফজল" উবাচ, "বদায়ুনী" উবাচ অথবা "লাহোরী" উবাচ গোছের নজীর-প্রমাণ যুক্ত বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অবতারণা করিলে পাঠক মনে করিবেন, মোগলাই-

---

* মালকোষের ধ্যান :—

আরক্তবর্ণো ধৃতরক্তযষ্টিঃ
বীরঃ সুবীরেষু কৃত-প্রবীরঃ
বীরৈর্বৃত—বৈরী কপালমালা
মালামতো মালবকৌশিকেরং...

মহাভারত পাঠ না করিয়া মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠই ভাল ছিল।

এই প্রবন্ধের শিরোনামা পড়িয়া কেহ কেহ হয়ত আশঙ্কা করিয়াছেন কংস-কৃষ্ণ-সংবাদের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা শকুনি-দুর্যোধনের চরিত্র-সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য। পুরাণ মহাভারত কিন্তু আমার ইতিহাস-চর্চার গণ্ডীর বাহিরে; সুতরাং কংস কিংবা মাতুল শকুনি সম্বন্ধে গবেষণা আমার কর্ম নয়। উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি পাইয়াছি মোগলাই আমল; অতএব এই আমলের মামা-ভাগিনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১

আমীর তাইমুর—যাঁহার পায়ের খোঁড়া গোড়ালির অস্থি পর্যন্ত সম্প্রতি কবর হইতে বাহির হইয়াছে শুনিতেছি—তিনিই ছিলেন মোগল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ। বাবরের মামা উলুঘ বেগ মির্জার কুলজীতে দেখা যায় তাঁহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ ছিলেন বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁ। উলুঘ বেগ মির্জা এবং অন্যান্য মোগলসর্দারগণের গুপ্ত শত্রুতা বাবরের পিতৃরাজ্য ফরগণা হইতে নির্বাসনের অন্যতম কারণ। তবুও বাবর মাতুল-বংশের প্রতি সুদিনে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুঁর মাতুল-ভাগ্য ভাল ছিল না। ইয়াদ্‌গার নাসির মির্জা হুমায়ুঁর মামা এবং শ্বশুর—ডবল লৌকিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া গুজরাট-সুলতান বাহাদুর শার পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। লোকে বলে "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"; দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকবর বাদশার একজন আপন কানামামাও ছিল না। হামিদা বানুর এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিল খ্‌াজা মোয়াজ্জম। মোয়াজ্জম হুমায়ুঁ-রাজত্বের শেষভাগে রাজ-শ্যালক এবং আকবরের রাজ্যারোহণের প্রথম নয় বৎসর পর্যন্ত পাগ্‌লা-মামার ভূমিকা অভিনয় করিয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী অবস্থায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্ত্রীর খাতিরে হুমায়ুঁ এবং বাদশার ভয়ে দরবারী আমীরগণ মোয়াজ্জমের অনেক মারাত্মক উৎপাত সহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে হুমায়ুঁ নিরুপায় হইয়া শ্যালককে হজযাত্রায় জন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যেও মোয়াজ্জমের স্বভাব পরিবর্তন হইল না, দুনিয়ার যত দুষ্কর্ম মক্কায় থাকিয়া সে কিছুই বাদ দেয় নাই। ভাগিনার রাজ্যারোহণের পর হাজী মোয়াজ্জম সদ্যোজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হইয়া হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে পাগলামির মাত্রাও বাড়িয়া গেল। বৈরাম

খাঁর উজীরী আমলে এক দিন বাদশার প্রকাশ্য দরবারে মামা হঠাৎ ক্ষেপিয়া মির্জা আবদুল্লা মোগলকে লাথি ঘুঁষি মারিতে লাগিল—আবদুল্লার অপরাধ তিনি নাকি মোয়াজ্জমকে পাগল ক্ষেপার কোন কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। পাগলের বিবাহ করিবার শখ হওয়ায় স্নেহশীলা হামিদা বানু সম্রাট হুমায়ুঁর উদুর্বেগী বিবি ফাতেমার কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী জোহরার সহিত মোয়াজ্জমের বিবাহ দিলেন। বিবাহ পাগলের এবং জরাতুর বৃদ্ধের পক্ষে হেকিমী মতে একটি অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু মোয়াজ্জমের উপর ঔষধের ক্রিয়া স্থায়ী হইল না। কিছু দিন পরে নানা প্রকার কুভাব তাহার মাথায় ঢুকিল এবং প্রত্যহ স্ত্রীকে সে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এক দিন মোয়াজ্জমের শাশুড়ী বিবি ফাতেমা আকবর বাদশার কাছে নালিশ করিলেন, জামাতা তাঁহার মেয়েকে আগ্রা হইতে অন্যত্র সরাইয়া খুন করিবার মতলব করিয়াছে। ফাতেমার অনুরোধে আকবর মামাকে শাসাইবার জন্য বিশ জন অনুচরসহ যমুনার অপর পারে মোয়াজ্জমের হাবেলীর দিকে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোয়াজ্জম অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং সদ্যস্নাতা প্রসাধনরতা জোহরার নিষ্পাপ বক্ষে মুহূর্তমধ্যে উন্মত্তের শোণিত-লোলুপ তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমূল প্রোথিত হইল। ইহার পর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া মোয়াজ্জম বাদশার অগ্রগামী অনুচরদ্বয়কে জানাইল, কাজ শেষ হইয়াছে এবং প্রমাণস্বরূপ রক্তাক্ত ছুরিকাখানি তাহাদের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিল। আকবরের হুকুমে বন্দী মোয়াজ্জমের অবস্থা ভীমের হাতে জয়দ্রথের ন্যায় হইল। কিল চড় লাথি মারিতে মারিতে সম্রাটের অনুচরগণ মামাকে যমুনার ধারে লইয়া গিয়া জলে চুবাইয়া ধরিল। কিন্তু পাগলের শক্ত প্রাণ অনেকবার চুবানি খাইয়াও খাঁচা-ছাড়া হইল না। অবশেষে মোয়াজ্জম শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল—সেখানেই তাহার প্রাণ ও পাগলামির অবসান হইল (১৫৬৩ খৃঃ)। ইতিহাসের পাতায় মামার কুকীর্তি ও ভাগিনার বজ্রকঠোর ন্যায়দণ্ডের কাহিনী এখনও সজীব। রাজত্বের প্রারম্ভে আকবর যে সমস্ত কার্যের দ্বারা প্রজারঞ্জক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, মাতুল-দমন উহার অন্যতম।

বাপ-পিতামহের আমল হইতে তিন পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান-মামার অভিজ্ঞতাভিজ্ঞ আকবর তাঁহার পুত্র-পৌত্রের জন্য হিন্দু-মামার যোগাড় করিয়াছিলেন।

আম্বের-পতি বিহারীমলের দৌহিত্র জাহাঙ্গীরের ভগবন্ত দাস, ভগবান দাস প্রভৃতি মামাগণ সকলেই শূরবীর এবং চতুর রাজনীতিবিৎ ছিলেন। কিন্তু পিতৃদ্রোহী সেলিম মাতুল-বংশকে আকবরী আমলের নেকড়ে বাঘ বলিতেন;

কেননা তাঁহার শ্যালক আম্বের-রাজ মানসিংহ তাঁহার ভাগিনা শাহজাদা খুসরুকেই আকবরের উত্তরাধিকারীরূপে দিল্লী-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র শাহজাদা খুর্রমের মামা যোধপুর-রাজ সুরজসিংহ রাঠোর ভাগিনার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মিবার এবং দাক্ষিণাত্য অভিযানে সুরজসিংহ শাহজাদা খুর্রমের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বেই সুরজসিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তবুও তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বে দিল্লী-সিংহাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিল যোধপুরের রাঠোর। সম্রাট শাহজাহানের ইঙ্গিতে রাঠোরের লক্ষ তরবারি কোষমুক্ত হইয়া বিনা বিচারে মারাঠা-মুঘবেগ, উভয়ের শোণিতে সমান পরিতৃপ্ত হইত। প্রিয়পুত্র দারা এবং পৌত্র সুলেমান শুকোর উত্তরাধিকার নিষ্কণ্টক করিবার জন্য শাহজাহান তাঁহার পৌত্র সুলেমান শুকোকে রাঠোর অমরসিংহের পুত্রীর সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাঠোর-চৌহানের প্রচণ্ড বিক্রম এবং আত্মাহুতি সামুগঢের যুদ্ধে নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

২

ভাগিনা চতুষ্টয়ের ভ্রাতৃ-বিরোধে তাঁহাদের একমাত্র মাতুল শায়েস্তা খাঁ শাহজাদা আওরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মামা এবং মাতামহের [ইতিমাদ-উদ্দৌলা আসফ খাঁ] সদ্গুণসমূহ একমাত্র আওরঙ্গজেবই পাইয়াছিলেন। রাজধর্মে হৃদয়দৌর্বল্যের স্থান নাই, সদ্যবৈধব্যগ্রস্তা রোরুদ্যমানা নূরজাহানকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আসফ খাঁ যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই অমানুষিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন আওরঙ্গজেব; প্রমাণ শাহজাহান ও জাহানারার আগ্রা-দুর্গে আজীবন কারাবাস এবং পুত্র মহম্মদের শোচনীয় পরিণাম। শায়েস্তা খাঁ সুযোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়িতে বাপ ও ভাগিনার এক ধাপ নীচে ছিলেন; সুতরাং তাঁহার স্বভাবও উভয়ের চেয়ে অনেক মোলায়েম ছিল। মামা ছিলেন পাকা জহুরী; মানুষ এবং হীরা মোতি পান্না সবই ভাল রকম চিনিতেন। ফরাসী-সদাগর তেভার্নিয়ার সাহেব শায়েস্তা খাঁর নিকট হীরা বিক্রী করিতে গিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। মামার চেয়ে ভাগিনা মানুষ বেশী চিনিতেন; কিন্তু জহরত ক্রয় করিবার সময় দাম ঠিক করিবার জন্য বন্দী শাহজাহানের কাছে পাঠাইতেন।

মামা-ভাগিনা তাঁহাদের সময়ে সত্যবাদী* এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সচরাচর সাধারণ লোকের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিতেন না; কূটনীতির ধাপ্পা কিংবা সাংবাদিকগণের নিকট বিবৃতি একালের মত মোগলাই আমলেও মিথ্যার পর্যায়ে পড়িত না। মামা-ভাগিনা ভীষ্ম-শুকদেবের মত জিতেন্দ্রিয় না হইলেও মধ্যযুগের moralityর মাপে এই প্রশংসা তাঁহারা পাইতে পারেন। দু-একটা হীরাবাঈ উদীপুরী সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের নৈতিক চরিত্র প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের নৈতিক চরিত্র হইতে যে বহু অংশে উন্নত এবং নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মামা শায়েস্তা খাঁও সে-কালের আমীরদের তুলনায় সংযমী পুরুষ ছিলেন; ঘরে বাহিরে তিনি বেগম সাহেবাকে ভয় করিয়া চলিতেন। বেগম সাহেবার একজন কবিরাজ ছিল; তেভার্নিয়ার সাহেব কবিরাজের কাছে শুনিয়াছিলেন, বেগম সাহেবা (বুজুর্গ উম্মেদ খাঁর মাতা) ব্যতীত নবাব সাহেবের হারেমে অন্য কোন স্ত্রীর জীবন্ত সন্তান প্রসব করিবার উপায় ছিল না; এ কার্যের জন্য কবিরাজ মহাশয়ের আট বার মাত্র ডাক পড়িয়াছিল; শুনা যায়, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিঃসন্তান সৈদ্ খাঁ খান্-জাহান্ শাহ্জাহান বাদ্শার "কোশ্তা" [জারন] সেবন করিয়া এক বৎসর পরে তাঁহার পুত্র-কন্যার সংখ্যা গণিবার জন্য বাদ্শার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ যুগে শায়েস্তা খাঁকে সংযমী না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আওরঙ্গজেব এবং শায়েস্তা খাঁ দুজনেই পাকা নমাজী, রোজাদার এবং পরহেজগার ছিলেন; উভয়েই রণকুশল যোদ্ধা, কূটনীতিজ্ঞ এবং দারার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সুতরাং প্রথম হইতে স্বাভাবিক প্রীতি এবং স্বার্থের আকর্ষণে মামা-ভাগিনার দাড়ির গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। শরিয়ৎ-নিষ্ঠ মাতুল দারার বেশরা

---

*......the King's uncle, *had the reputation of never to have told a lie* [Tavernier, *Voyages* (1677, London), p. 39.]

শায়েস্তা খাঁ একদিন আওরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন তিনি এক বৃদ্ধ বানিয়ার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন —যে সারাজীবন মিথ্যা কথা বলে নাই। সম্রাটের আদেশে বৃদ্ধ ৩০।৪০ দিনের রাস্তা সফর করিয়া আগ্রার বাদশাকে কুর্নিশ করিতে আসিয়াছিল। আওরঙ্গজেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম? উত্তর—লোকে বলে সত্যবাদী। তোমার বাপের নাম? উত্তর— আলা হজরত, ঐটি আমি বলিতে পারি না।

মামা এবং ভাঁহার মক্কেল বানিয়াকে আওরঙ্গজেব জব্দ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেই ঠকিয়া গেলেন। একটি হাতী এবং দশ হাজার টাকা নগদ বানিয়াকে বকশিশ দেওয়া হইল। [ibid.]

বেদান্তবাদ [সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অর্থাৎ সুফী *Hama u-st* (Everything is He) ইং Pantheism], কাফেরী চাল এবং হিন্দুপ্রীতি মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার পিতা আসফ খাঁ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নয়-হাজারী মনসবদার এবং উজীর-ই-আজম্ হইয়াছিলেন। সুতরাং শাহজাহানের সুযোগ্য তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে শাহী তক্তে বসাইতে পারিলে তিনিও ঐ রকম কিছু লাভ করিবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পীড়িত সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাসের ভান করিয়া বাংলা দেশে শুজা এবং গুজরাটে মোরাদ বক্শ রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন মামা-ভাগিনা মালব এবং দাক্ষিণাত্যে বসিয়া কূটনীতির কপট দ্যূতে শুজা-মোরাদ, দারা-শাহজাহানকে প্রথম বাজিতেই হারাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব ভাই মোরাদকে লিখিলেন—আমি মক্কা যাত্রার সংকল্প করিয়াছি; কাফের দারার চক্রান্তে ইসলাম বিপন্ন—যাওয়ার পূর্বে আহেল-ই-ইসলামের পক্ষে দীন ও দুনিয়ার হেফাজতি করিবার জন্য তোমাকেই ময়ূর-তক্তে বসাইয়া যাইব। এইজন্যই আমার যুদ্ধায়োজন। সরলবিশ্বাসী মোরাদ মনে করিল, দাদা বুঝি সত্য সত্যই দিল্লীর বাদশাহী তাহাকে বকশিশ করিয়া জাহাজে চড়িবেন। অন্য দিকে আওরঙ্গজেব চতুর শুজাকে বুঝাইলেন মোরাদ ছেলেমানুষ, তাহার সাহস আছে বুদ্ধি নাই, দারা কুচক্রী কাফের; আপনি বাঁচিয়া থাকিতে শাহী তাজ আমার পক্ষে হারাম—বিশেষতঃ আমি দুনিয়া হইতে কায়েদ হইয়া মক্কাবাসী হইব। শুজা চালাক হইয়াও ঠকিয়াও গেলেন। তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন—ভাই বুঝি সত্যই কোহিনূরকে মাটির ঢেলার মত ত্যাগ করিয়া মক্কাশরীফে চলিল; ছেলেবেলা হইতে ভাইয়ের যেরূপ মতিগতি, দুনিয়াদারী ছাড়িয়া ফকির হওয়া তাহার পক্ষে আদৌ বিচিত্র নহে; যে ব্যক্তি সারাজীবন শরাব খাইল না, নাচ দেখিল না, যে গান শুনিলে কানে আঙুল দিয়া তৌবা করে, বাঁদী দেখিলে মুখ ফিরাইয়া থাকে, রাত্রিটাও আরাম-আয়েশে না কাটাইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে তশ্‌বী জপ আরম্ভ করে, দিনের বেলা ফুরসৎ পাইলেই কোরান-শরীফ নকল করিয়া যে ব্যক্তি কফনের পয়সা রোজগার করে, তাহার পক্ষে তক্ত্-ই-তাউস্ এবং গাছতলা একই কথা! যাহা হউক, মামা-ভাগিনার কারসাজী টের পাইয়া শাহজাহান শায়েস্তা খাঁকে হজুরে তলব করিয়া আগ্রায় নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন; কিন্তু আওরঙ্গজেব কাহারও পরামর্শ কিংবা সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন না—তিনি একাই সওয়া লাখ। তবুও মামা আগ্রায় বসিয়া ভাগিনার মঙ্গলার্থে তশ্‌বী জপ এবং দরবারের গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ করিতে লাগিলেন।

সামুগড়ের যুদ্ধে (২৯শে মে, ১৬৫৮ খৃঃ) দারার সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হইল। শাহজাদা দিল্লীর দিকে সে রাত্রে পলাইয়া গেলেন। আগ্রার উপকণ্ঠস্থিত নূর-মঞ্জিল বাগে বিজয়ী আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া শায়েস্তা খাঁ রাত্রি প্রভাতেই ভাগিনাকে মোবারক-বাদ জানাইলেন। ১১ই জুন তারিখে স্বয়ং জাহানারা বেগম আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করিয়া পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকারের কথা পাকাপাকি স্থির করিয়া গেলেন। পরদিন জয়োৎফুল্ল পুত্র বন্দী পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাড়ম্বরে আগ্রা-দুর্গে প্রবেশ করিবেন এমন সময় মামা দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া ভাগিনাকে সংবাদ দিলেন—"সর্বনাশ। মৃত্যুর ফাঁদে পা দিও না। ভীষণ ষড়যন্ত্র! অন্তঃপুরের ভীম-দর্শনা তাতারী প্রতিহারিণীগণ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।" ভাগিনা সত্যই এ যাত্রা মামার কৃপায় রক্ষা পাইলেন। আগ্রার দুর্গপ্রাকার পুত্র সবলে অধিকার করিল; কিন্তু শাহজাহান আত্মসমর্পণ করিলেন না। তাঁহার কষ্টসঞ্চিত বহুমূল্য হীরা-মুক্তা তিনি একটা বোঁচকায় বাঁধিয়া শয়ন-কক্ষ অর্গলবদ্ধ করিলেন; পাশেই একটা হামানদিস্তা! সেখান হইতে পুত্রকে শাসাইলেন—জবরদস্তি করিলে কোহিনূর হামানদিস্তায় ফেলিয়া ছাতু করিয়া ফেলিবেন; জালিমের জন্য জহরতের এক টুকরাও অবশিষ্ট থাকিবে না।

সামুগড়ের যুদ্ধজয়ের পর আওরঙ্গজেব মোরাদকে "বাদশাজীউ" বলিয়া প্রথমেই সেলাম জানাইয়াছিলেন। দু ভাইয়ের গলায় গলায় ভাব; মোরাদ দাদাকে পীর জ্ঞান করিয়া "হজরতজী" ছাড়া কথাই বলিতেন না। আগ্রা-দুর্গ অধিকার করিবার পর "হজরতজী" পশ্চিমমুখী না হইয়া উত্তরাপথে দার্-উল্-খিলাফৎ হজরত্ দিল্লীর দিকে চলিলেন। দুষ্টলোক তাঁহার মতলব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মোরাদকে ইঙ্গিত করিল—দাদার কিল্‌বার মোড় মক্কা হইতে দিল্লীর দিকে ফিরিয়াছে; সেখানে গিয়া তিনিই তক্তে বসিবেন। কিছু দিন হইতে মোরাদও দাদার কিছু ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন; লুটের মাল ভাগাভাগির সময় ঝোলটা তিনি আপন কোলে টানিবার সময় চক্ষুলজ্জা করেন না ইত্যাদি। চতুর আওরঙ্গজেব স্থির করিলেন আর বিলম্ব করা উচিত নয়; বেয়াড়া হাতীকে ধরিবার জন্য মথুরায় তিনি ফাঁদ পাতিলেন। কিন্তু মোরাদ বকুশ বহু অনুরোধ এমন কি নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও

আওরঙ্গজেবের শিবিরে পা দিলেন না। অবশেষে এক বিশ্বাসঘাতক গোলাম অতর্কিত মুহূর্তে শিকারে পরিশ্রান্ত মোরাদকে ভুলাইয়া আওরঙ্গজেবের শিবিরে লইয়া আসিল। দাদার মেহেমানদারীর ঘটা দেখিয়া মোরাদ মুগ্ধ হইলেন; যিনি শরাব কোন দিন স্পর্শ করেন নাই তিনি ছোট ভাইকে খাতির-তোয়াজ করিবার জন্ত শরাব ও স্নেহের ভরপুর পেয়ালা মোরাদের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টার পর নেশা ও নিদ্রাভঙ্গের পর মোরাদ দেখিলেন সম্মুখে সোনার পা-বেড়ী; আওরঙ্গজেবের সেনাধ্যক্ষ শেখ মীর তাঁহাকে কুর্নিশ করিয়া অনুমতির অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র খেলার ছলে বাপের ইঙ্গিতে চুরি করিয়াছিল। অসহায় মূর্খ মোরাদ কৌশলে বন্দী হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল; কিন্তু তবুও আওরঙ্গজেব ধর্ম, ন্যায়পরতা, ইসলামের স্বার্থ এবং মোরাদের হিত-কামনার বুলি ছাড়িলেন না—বন্দী মোরাদের কাছে লিখিত পত্রের প্রতি ছত্রে ইহার প্রমাণ আছে। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই অগত্যা তিনি নিজেই আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর শাহী তক্তে বসিয়া পড়িলেন, পলায়িত দারার চিন্তায় শুজার কথা তিনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে আকবরী আমলে যে "অধর্মে"র অভ্যুত্থান, এবং "ধর্মে"র গ্লানি আরম্ভ হয়, দারার কার্যের ফলে উহা চরমে উঠিয়াছিল, দারা-সরমদের মত "দুষ্কৃত"গণকে বিনাশ এবং মৌলানা আব্দুল-কবী ও শেখ আব্দুল ওহাব শ্রেণীর "সাধুগণে"র পরিত্রাণ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্তই স্বয়ং খোদাতালা আওরঙ্গজেবের হাতে রাজদণ্ড দিয়াছিলেন এই সরল এবং অকপট বিশ্বাস শাহানশাহ আলমগীরের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এবং এ বিশ্বাস লইয়াই তিনি মরিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি মুক্তপুরুষ। ভাল-মন্দ যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন, সমস্তই খোদার মর্জিতেই হইয়াছে—তিনি শুধু নিমিত্ত মাত্র। শিবাজীকে অবতার বলিয়া মানিয়া লইলে আলমগীরের দাবীও অগ্রাহ্য করা যায় না। যাহা হউক, এখন হইতে আমরা ভাগিনাকে বাদ দিয়া মামা শায়েস্তা খাঁর কথাই এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

৪

এক বৎসর পরে ২১শে জুলাই (১৬৫৯ খৃঃ) সন্ধ্যাবেলা দিল্লীর দেওয়ান্-ই-খাস্ প্রাসাদে মাতুল শায়েস্তা খাঁর ডাক পড়িল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দানেশমন্দ খাঁ, মহম্মদ আমিন খাঁ [মীর জুমলার পুত্র], বাহাদুর খাঁ, হেকিম দাউদ এবং কয়েক

জন দরবারী উলেমা ; সিংহাসনে স্বয়ং বাদশাহ্ আলমগীর, পর্দার আড়ালে উগ্রচণ্ডা ভগ্নী রৌশন্-আরা বেগম। নিয়তির কবলগ্রস্ত বন্দী শাহজাদা দারার বিচারের জন্ত সেদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন। দারা কোন দিন দানেশমন্দ খাঁর উপকার কিংবা রৌশন্-আরার অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু দানেশমন্দ খাঁ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন দারা যেন প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। মূর্তিমতী ঈর্ষা রৌশন্-আরা পর্দার আড়াল হইতে হুঙ্কার ছাড়িলেন, কাফের দারাকে মরিতেই হইবে। মামা এবং অন্যান্য সকলে শাহজাদীর মতে সায় দিলেন। প্রাণদণ্ড স্থিরীকৃত হওয়ার পর মৌলানারা বা-কায়দা ফতোয়া জারি করিলেন—শরিয়তের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিবার অপরাধে মৃত্যুই বেইমান দারার একমাত্র শাস্তি।

ভাগিনেয়ের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়া আসল কাফের "শিবা"কে দমন করিবার জন্ত মামা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল অর্ধরাত্রের পর মামার কি দশাই ঘটিয়াছিল উহা আমরা বাল্যকালেই কবি নবীনচন্দ্রের "রঙ্গমতী" কাব্যে পড়িয়াছি। এখনও মনে পড়ে—

> পুণা দুর্গে,... নিশীথ নিদ্রায়
> ...দস্যুধ্বনি, অস্ত্র ঝনৎকার
> সেনাপতি সায়েস্তা খাঁর কক্ষে অকস্মাৎ।
> * * *
> সেনাপতি-পুত্র সহ প্রহরি-নিচয়
> রক্তাক্ত ভূতলে, তীব্র বিক্রমে শিবজী
> আক্রমিছে সৈন্তেশ্বরে, প্রহারিছে অসি,—
> ...বাতায়ন পথে
> মুহূর্ত্তেকে সেনাপতি হ'লা অন্তর্দ্ধান।

কবি মামার বুড়ো আঙুলের কথাটা বোধ হয় জানিতেন না—জানিলে তিনি হয়ত "বিসর্জিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শিবজীর করে" এ রকম একটা কিছু লিখিতেন। এখানে হাল্কা গবেষণার কিছু গুঞ্জায়েশ আছে—শায়েস্তা খাঁ ডান হাতের না বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি হারাইয়াছিলেন? স্বয়ং স্তর যদুনাথেরও এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল; সেজন্ত তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছু লেখেন নাই। মহারাষ্ট্রের ভীষ্মপ্রতিম ঐতিহাসিক রাওবাহাদুর সরদেশাই এ-বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি স্ব-প্রণীত "মারাঠী রিয়াসৎ" ইতিবৃত্তে লিখিয়া গিয়াছেন, গোলমালের সময় শায়েস্তা খাঁ একটি "ভালা" [ভল্ল] হাতে লইয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। আক্রমণ-কারীদের মধ্যে একজন তাঁহার হাতের উপর কোপ মারিতেই ভালাটি তাঁহার হাত

হইতে পড়িয়া গেল। মামা "সব্যসাচী" ছিলেন না; সুতরাং বাম হাতে অস্ত্র চালনা করা অনুমান-সিদ্ধ নহে। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় "ভালা"র সহিত নবাব বাহাদুরের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই ভূতল চুম্বন করিয়াছিল।

পবিত্র রমজান মাসের রাত্রিতে এই উৎপাত ঘটাইয়া শিবাজী মামার অঙ্গহানি অপেক্ষাও গুরুতর ক্ষতি করিয়াছিলেন। শেষ রাত্রের খানা না খাইয়া মোগল-শিবিরে পরের দিন কেহ রোজা রাখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আঙুলের কাটা ঘা না শুকাইতেই সকালবেলা মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সমবেদনা প্রকাশের ছলে উহার উপর নুনের ছিটা দিতে আসিলেন। শায়েস্তা মোলায়েম মোগলাই কায়দায় বিদ্রূপ করিয়া উত্তর দিলেন—আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম, গত রাত্রে মহারাজের মত বাহাদুর নিমকহালালী করিয়া হয়ত স্বর্গবাসী হইয়াছেন। এই ঘটনার পরে মুসলমান সিপাহী মন্‌সব্‌দার সকলের মনে "শিবাতঙ্ক" জুজুর ভয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল—মামা পুণা হইতে তাঁবু গুটাইয়া আওরঙ্গাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—"শিবা" আদমের বাচ্চাই নয়—সে একটা জীন্‌-দেও; তাহার শরীর কেবল হাওয়া ও আগুন দিয়াই খোদাতালা বানাইয়াছেন—উহাতে জল মাটি নাই; সে বিশ গজ লাফাইয়া শিকারের ঘাড় ভাঙ্গে, শিবা একটা যাদুকর; তাহার হাতে ভেল্কি খেলে ইত্যাদি। আলমগীর এ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে করিলেন মামার ভীমরতি ধরিয়াছে। তিনি সরাসরি আরাম-নিয়ামৎ-বহুল বাঙ্গালার দোজখে যাইবার জন্য মামাকে হুকুম দিলেন।

৫

নবাব আমীর-উল্‌-উমরা শায়েস্তা খাঁ প্রথম দফে ১৪ বৎসর (জানুয়ারি ১৬৬৪ খৃঃ হইতে ১৬৭৭), এবং দ্বিতীয় বার ৯ বৎসর (জানুয়ারি ১৬৮০—১৬৮৮) মোট ২৩ বৎসর সুখে বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। মামার পরমায়ু-হ্রাস করিবার জন্য ভাগিনা তাঁহাকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে-কালে আসাম এবং বাঙ্গালা দেশ মানুষ-মারা জায়গা ছিল। আসামের কালা-জ্বরের কথা শুনিলেই যেমন বাঙ্গালীর গায়ে জ্বর আসে, তেমনই হিন্দুস্থানের লোকেরা সে-কালে বাঙ্গালা ও আসামের জলবায়ুকে মিঠা-বিষের মত ভয় করিত, এবং এখনও করিয়া থাকে। কারণ নিরীহ বাঙ্গালীর দেশে খুন-অপমৃত্যুর আশঙ্কা না থাকিলেও প্রায় অকালমৃত্যুই সুনিশ্চিত।

আওরঙ্গজেব এই উদ্দেশ্যেই সন্দেহভাজন অথচ সাহসী এবং সুচতুর মীরজুমলাকে বাঙ্গালা ও আসাম জয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ রাজমহল পৌঁছিবার পূর্বে মীরজুমলা আসামের ব্যারামে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় আওরঙ্গজেব দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্ত হইলেন।

নবাব শায়েস্তা খাঁ যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বাঙ্গালার বড়ই দুরবস্থা। শুজার নয় বৎসর শাসনকালের শান্তি ও সম্পদ পরবর্তী পাঁচ বৎসরের অবিরাম গৃহযুদ্ধ, আহম-আক্রমণ এবং মঘ-ফিরিঙ্গী-হারমাদদের অত্যাচারে অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল। নবাব মীরজুমলা যে সৈন্যদল এবং নৌবাহিনীর সাহায্যে বাঙ্গালা দেশ হইতে শুজাকে বিতাড়িত করিয়া আলমগীরশাহী আমল কায়েম করিয়াছিলেন, আসাম-অভিযানে উহা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মামার জন্য ঢাকার মালখানায় কয়েক বস্তা কড়ি এবং চাঁদনী ঘাটে কয়েকখানা ভাঙ্গা নৌকা ছাড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিমের পুত্র মোগল-নওয়ারার মীর-বহরকে শহরের নিকট হইতে চাটগাঁর জলদস্যুগণ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল; পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তখন প্রকৃতপক্ষে মঘের মুল্লুক।*

রাজমহল হইতে ঢাকায় আসিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁ শুনিলেন আরাকান-রাজ নাকি সমস্ত সুবে বাঙ্গালা চল্লিশ বৎসর পূর্বেই ফিরিঙ্গী হারমাদদিগকে বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দিয়াছেন; এবং এযাবৎ তাহারা এ মুল্লুক ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। নবাব স্থির করিলেন, মঘ-ফিরিঙ্গীর আড্ডা চট্টগ্রাম অধিকার না করিলে ঢাকাও নিরাপদ নয়। ভাগিনার ভেদনীতি প্রয়োগে মামাও সুনিপুণ ছিলেন। ফিরিঙ্গী হারমাদদের সাহায্য ব্যতীত মগদিগকে দমন করা অসম্ভব; সুতরাং তিনি মোটা মাহিনা, নগদ ঘুষ এবং জায়গীরের লোভ দেখাইয়া প্রথমে ফিরিঙ্গীদিগকে হাত করিলেন। মঘেরা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণফুলীর মোহানার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পর্তুগীস্ নৌ-বাহিনীর আড্ডা দেয়াঙ্গ শহরে ফিরিঙ্গীদিগকে কচুকাটা করিয়াছিল। প্রতিহিংসা ও লোভের বশবর্তী হইয়া তাহারা মোগল-পক্ষে যোগ দিল। শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন করিলেন। কিছু দিন পরেই

* বর্গীর ভয় বাঙালীর মন হইতে পলাশীর যুদ্ধের পর তিরোহিত হইলেও চট্টগ্রামের মঘের নামে এখনও অনেকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। চট্টগ্রামে সে কালের মঘ-হারমাদ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই; প্রমাণ স্বয়ং কবি নবীনচন্দ্র. ইংরেজী আমল না হইলে ডেপুটিগিরি ছাড়িয়া তিনিও ডাকাতি করিতেন—"বীরেন্দ্র। দাসত্ব হ'তে দস্যুত্ব উত্তম" তাঁহারই মনোভাব—চট্টল-প্রকৃতির বাণী।

তাঁহার আদেশে সন্দীপের বৃদ্ধ রাজা দিলাবরকে পরাজিত করিয়া মোগল নৌ-সেনাপতি আবুলহাসান নবেম্বর মাসে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) ঐ স্থান অধিকার করেন। ডিসেম্বর মাসে ৬৫০০ স্থলসৈন্য এবং ২৭৮ খানা* জঙ্গী নৌকা নবাবজাদা বুজুর্গ উমেদ খাঁর অধীনে ঢাকা হইতে যাত্রা করিয়া নোয়াখালি পৌঁছিল। জগদিয়ার নিকট ফেণী নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই জানুয়ারি (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ) ফরহাদ খাঁ-চালিত অগ্রগামী সৈন্যদল আরাকান-রাজের রাজ্য আক্রমণ করিল। নৌ-বাহিনী ফেণী নদীর মোহানা মেঘনা হইতে পাড়ি দিয়া ইতিপূর্বেই কুমিরা পৌঁছিয়াছিল এবং ২১ তারিখে স্থলবাহিনীও ঐ স্থানে তাহাদের সহিত মিলিত হইল। চট্টগ্রাম ও কুমিরার মধ্যবর্তী স্থানে গভীর জঙ্গলে পথ না পাইয়া ফরহাদ খাঁ দিশাহারা হইলেন।

২৩শে জানুয়ারি ইবন হোসেনের অধীনে মোগল নৌ-বাহিনী কুমিরা হইতে পাড়ি দিয়া প্রসিদ্ধ সমুদ্র-স্নানের তীর্থ কাট্টলী [কাঠালিয়া] উপস্থিত হইল। এই স্থানে মঘদের হাল্কা জঙ্গী নৌকার এক ছোট বহর মোগল জঙ্গী জাহাজের মুকাবিলা করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। মঘদের বড় বড় জাহাজ হরলার† (পতেঙ্গা ?) খাড়িতে নঙ্গর ফেলিয়াছিল। বিজয়ী মোগল নৌ-সেনাপতির যুদ্ধাহ্বানে ক্রোধান্ধ মঘ-বাহিনী বাহির-দরিয়ায় আসিয়া লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু দূর হইতে সারারাত্রি কামানের গোলা খরচ করিয়া কোন পক্ষ সুবিধা করিতে পারিল না। পরদিন সকালে মোগল রণতরী-বহর প্রবল বেগে মঘদিগকে আক্রমণ করিল। এবার মঘেরা চালে ভুল করিয়া বসিল। তাহারা কর্ণফুলীর ভিতর না ঢুকিয়া বাহির-দরিয়ায় পলাইয়া গেলে মোগলেরা মঘের লেজও নাগাল পাইত না; অথচ অটুট মঘ-বাহিনী পিছনে রাখিয়া মোগলেরা কর্ণফুলীতে ঢুকিলে বিপন্ন হইয়া পড়িত। যাহা হউক, মোগল নৌ-সেনাপতি মঘদিগকে তাড়া করিতে করিতে বেলা তিনটার সময় (২৪শে জানুয়ারি, ১৬৬৬ খৃঃ) নদীতে প্রবেশ করিয়া চট্টগ্রাম শহর এবং একটি চরের মধ্যবর্তী স্থানে (বর্তমান ডবল মুরিঙ্গের কিনারায় ?) ব্যূহ

---

* আলমগীর-নামা কিংবা শিহাব-উদ্দীন তালিশের গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও একজন সমসাময়িক ইংরেজ কর্মচারী চট্টগ্রাম-জয়ে ওলন্দাজগণ নবাবকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন দ্রষ্টব্য—Indian Records Series : Streynsham, Vol. II. p. 41.

† হরলা বা এ রকম কোন খাড়ি কুমিরা এবং চট্টগ্রামের মধ্যে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কুমিরা হইতে পাড়ি দিলে পতেঙ্গার ঠোঁটা [promontory] ঘুরিয়া কর্ণফুলীতে প্রবেশ করিতে হয়। ফার্সি অক্ষরে লেখা "হরলা"র স্থলে "পতেঙ্গা" পাঠ অসম্ভব। হয়ত সেকালে "হরলা" নামে কোন জায়গা ছিল।

স্থাপন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিল। এই পর্যন্ত শিহাবউদ্দীন তালিশের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু ইহার পরবর্তী কাহিনী স্যার যদুনাথ আলমগীর-নামার বিবরণ হইতে অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহা আমাদের কাছে কিছু গোলমেলে মনে হয়। শিহাব-উদ্দীন লিখিয়াছেন, ব্যূহবদ্ধ মোগল রণতরীর উপর ফিরিঙ্গী বন্দর* স্থিত একটি সুরক্ষিত স্থান হইতে মঘেরা অজস্র কামান-বন্দুকের গোলা বর্ষণ করিয়া মোগল-বাহিনীকে বিব্রত করিতেছিল। এজন্য সেই দিনই মোগল নৌ-সেনাপতি জল স্থল উভয় পার্শ্ব হইতে হামলা করিয়া ফিরিঙ্গী বন্দর দখল করেন। শিহাব-উদ্দীনের মতানুসারে "বন্দর" বিজয়ে উল্লসিত মোগল নৌ-বাহিনী সেই দিনই চট্টগ্রাম-দুর্গের (অর্থাৎ বর্তমান কাচারী পাহাড়ের নীচে যে দিক্ দিয়া কর্ণফুলী সে যুগে প্রবাহিত হইত) নিম্নস্থ নদীবক্ষে অবস্থিত মঘ-রণতরী-বহরের উপর প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর উহা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে; এবং ১৩৫ খানা জঙ্গী নৌকা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহার পর মোগল নৌবাহিনী শহরের কিছু ভাটিতে নঙ্গর ফেলিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে।† শীতকালের বেলা তিনটা এবং চট্টগ্রামের সূর্যাস্তের মধ্যে একটি সুরক্ষিত স্থান (বন্দর) দখল এবং একটি বড় রকমের নৌযুদ্ধজয় সম্ভবপর মনে হয় না; বিশেষতঃ জোয়ার-ভাটার বাধা এবং বন্দর হইতে বর্তমান সদর ঘাটের দূরত্বও (জোয়ারের সময় নৌকায় প্রায় ১॥ ঘণ্টার রাস্তা) উপেক্ষণীয় নয়। এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়, ২৪শে জানুয়ারি সকালবেলা মোগল নৌবাহিনী হরলা কিংবা পতেঙ্গা ঠোটার বাহির-দরিয়ায় মঘদিগকে পরাজিত এবং বন্দর দখল করিয়া ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা শহরের কিছু ভাটিতে নঙ্গর ফেলিয়া মঘ-রণতরী-বহরের পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল; এবং পরদিন ২৫শে জানুয়ারি শেষ যুদ্ধে মঘ-বাহিনী ধ্বংস করিয়া বিকালবেলা হইতে স্থলবাহিনীর অগ্রগামী দলের সাহায্যে চট্টগ্রাম-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। ইহা ধরিয়া লইলে শিহাব-উদ্দীন তালিশ এবং আলমগীরনামার মধ্যে চট্টগ্রাম-জয় সম্বন্ধে সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর হয়।

ফরহাদ খাঁ মোগল স্থলবাহিনীর অগ্রগামী দল সহ ২১শে জানুয়ারি নৌবাহিনীর সহিত কুমিরায় মিলিত হইয়াছিলেন। সেনাপতি নবাবজাদা বুজুর্গ উমেদ খাঁ ঐ দিন কুমিরা হইতে তিন কিংবা আট ক্রোশ দূরে ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর আদেশ

* বর্তমান বন্দর গ্রাম—দেবাঙ্গ হইতে ৫।৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলীর মোহানায়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে মঘ এবং মোগল নৌবাহিনীর যুদ্ধ হইয়াছিল শঙ্খনদীর মোহানার বাহিরে ডুব-চরের উপর। ঐ সম্বন্ধে ৺দীনেশচন্দ্র সেন যে গাজীর পালা ছাপাইয়াছেন উহাতে কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে। কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—"মঘে না পাইল আগুন, মোছলমানে মাটি।"

† Sarkar's *History of Aurangzib*, Vol. III, p. 210 ff.

ছিল নৌবাহিনী এবং স্থলবাহিনীর বরাবর কাছাকাছি থাকিয়া অগ্রসর হইবে। নৌ-সেনাপতি জাহাজী লস্করদিগকে ডাঙ্গায় নামাইয়া জঙ্গল কাটিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নৌবাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্যস্থল ছিল কাঠালিয়া বা বর্তমান কাট্টলী; সুতরাং স্থলসৈন্য কুমিরা হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া কাট্টলী যাওয়ার জন্যই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল ধরিয়া লইতে হইবে। দুদিন জঙ্গল কাটার পর নৌবাহিনী এবং ফরহাদ খাঁর সৈন্যদল ২১শে জানুয়ারি কাঠালিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু কুমিরা এবং কাট্টলীর মধ্যবর্তী কোন স্থানে ফরহাদ খাঁর অগ্রগতি বন্ধ হইল; সম্মুখে গভীর জঙ্গল। এই স্থানে ২৩শে জানুয়ারি রাত্রিবেলা ফরহাদ খাঁ প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন কাট্টলীর যুদ্ধে নৌবাহিনী জয়লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি হুকুম হইল তিনি যেন জঙ্গল কাটার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি নৌবহরের সহিত যোগ দেন। এখনকার দিনে কুমিরা হইতে পায়ে হাঁটিয়া লোক এক দিনেই চট্টগ্রাম শহরে কাজকর্ম সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, অবশ্য রেলের রাস্তা ধরিয়া নয়। কাট্টলীর পূর্বদিকে বর্তমান কৈবল্যধাম পাহাড় এবং বোলশহরের ভিতর দিয়া যে রাস্তা আছে কুমিরা হইতে উহার দূরত্ব ৬ মাইলের বেশী নয়। সুতরাং এই দুর্গম পথে—তখন অবশ্য রাস্তা ছিল না—ফরহাদ খাঁর পক্ষে পরদিন (২৪শে জানুয়ারি) বিকাল বেলা চট্টগ্রাম-দুর্গের কাছে পৌঁছা অসম্ভব* নয়। চট্টগ্রাম শহরের আন্দার-কিল্লার পূর্বদিকে হাসপাতাল পাহাড়ের অপর দিকে (পূর্ব) ঘাট-ফরহাদ বেগ নামক প্রসিদ্ধ মহল্লা এখনও বিদ্যমান। ফরহাদ বেগ বোধ হয় এখানেই অগ্রগামী সৈন্যদলসহ ২৪শে জানুয়ারি ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ দিন নৌবহর ছিল শহরের কিছু ভাটিতে। সুতরাং জল স্থল কোন দিকেই মঘদের পলাইবার রাস্তা ছিল না। ২৫শে তারিখের যুদ্ধে ফরহাদ খাঁর পক্ষে মোগল নৌবাহিনীকে কোন প্রকার সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না; কেন-না "ঘাট-ফরহাদ বেগ" কাচারী পাহাড় হইতে নদীর এক মাইল উজানে চাষ্তাই (মোগল) ঘাটের কাছাকাছি জায়গা। সেনাপতি বুজুর্গ উমেদ খাঁ ২৪শে জানুয়ারি কুমিরা হইতে যাত্রা করিয়া ফরহাদ খাঁর এক দিন পরে

* স্যর যদুনাথ লিখিয়াছেন, ১৬।১৭ মাইল দুর্গম জঙ্গলের রাস্তা এক দিনে সফর করিয়া ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম পৌঁছান ফরহাদ খাঁর পক্ষে কিরূপে সম্ভব?

তিনি কুমিরা হইতে এই দূরত্ব অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ২৩শে তারিখ সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরহাদ খাঁ অন্ততঃ কুমিরা হইতে দু-মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন; বাকী রাস্তা ৪।৫ মাইল মাত্র। History of Aurangzib, iii, p. 215.

অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারি চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া বিজয়ী নৌবাহিনীর সহিত একযোগে চট্টগ্রাম অবরোধ করেন। ৩৬ ঘণ্টা অবরোধের পর দুর্গরক্ষী মঘ-সৈন্যাধ্যক্ষ বুজুর্গ উমেদ খাঁর হাতে কেল্লার চাবি সমর্পণ করিয়াছিলেন। শিহাব উদ্দীন তালিশের মতে মোগল নৌ-সৈন্যই চট্টগ্রাম-দুর্গ জয় করিয়াছিল এবং ২৬শে তারিখ সকালবেলা নৌ-সেনাপতি ইবন হোসেনের কাছেই মঘ-দুর্গাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। স্যর যদুনাথ অনুমান করেন, মোগল স্থলবাহিনী দুর্গ দখলের পরে পৌঁছিয়া "আল্লা হো আকবর" "নবাব সাহেব কী জয়" চীৎকার, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ ছাড়া অন্য কোন কাজ করে নাই।

মোগল-বিজয়ের পর চট্টগ্রামের নামকরণ হইল ইসলামাবাদ—কেন-না আলমগীর বাদশাহ্ তখন আসমুদ্রহিমাচল সারা হিন্দুস্থানকে ইসলামাবাদ বা পাকিস্থান করিবার অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তিনি মামার কাছে লিখিলেন, চাটগাঁর জমার পরিমাণ কি? জমার ঘরে তখন পর্যন্ত শূন্য, কিন্তু মামা কৌশলে রসিকতা করিয়া লিখিলেন, তামাম আহেল-ইসলামের দিলের "জমিয়ৎ" [সোয়াস্তি] এই মুলুকের "জমা" [রাজস্ব]। চট্টগ্রামবিজয়ের পর বাঙ্গালা দেশের সীমা বৌদ্ধ যুগের রম্যক বা রামু [চট্টগ্রামের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম] পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান মঘের গোলামী হইতে উদ্ধার পাইয়া বিজয়ী নবাবকে আশীর্বাদ করি। চট্টগ্রামের আন্দার-কিল্লা স্থিত জুমা মসজিদ এখনও শায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম-জয়ের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ বর্তমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চট্টগ্রামে সর্বসাধারণের মধ্যে উহা শুজা মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের প্রশস্তির তারিখ এবং নবাব আমীর-উল-উমরা উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে। সুতরাং জনপ্রবাদের কোন ভিত্তি নাই। "মামা-ভাগিনা" প্রবন্ধে চট্টগ্রাম-জয় অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও হাল্কা-গবেষণার লোভ এবং চট্টলজননীর প্রতি নাড়ীর টান বশতঃ উক্ত বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে, জ্ঞানকৃত অপরাধ হয়ত অনেকে মার্জনা করিবেন না।

৬

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে সমস্ত খরচ বাদ থোক্ পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহী খাজনাখানায় প্রেরিত হইত। তেভার্নিয়ার সাহেব আগ্রা হইতে ঢাকা আসিবার পথে এক স্থানে (আগ্রা হইতে ৬৪ মাইল পূর্বে) দেখিয়াছিলেন, এক শত দশখানা গরুর গাড়ী বোঝাই বাঙ্গালার রাজস্ব আগ্রা চলিয়াছে, প্রত্যেক

গাড়ীতে তিন জোড়া বলদ পঞ্চাশ হাজার সিক্কা টাকার বোঝা সুদীর্ঘ পথ টানিয়া চলিয়াছে।* কিন্তু এই ৫৫,০০০০০ লাখ টাকা ছিল নবাব শায়েস্তা খাঁর সমস্ত খরচ বাদ মাত্র দু মাসের আয়। সমসাময়িক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কাশিমবাজার হইতে ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে লিখিতেছেন :—

…ইনি ১৫ বৎসর (প্রকৃত পক্ষে বারো বৎসর) যাবৎ বাঙ্গালার নবাব ; তাঁহার ন্যায় ধনশালী ব্যক্তির কথা আজকালকার দিনে পৃথিবীতে শুনা যায় না ; যাহারা এ-দেশের খবর রাখেন তাঁহারা বলেন তিনি ৩৮ কোটী টাকা বা ৪০,০০,০০০ পাউণ্ডের মালিক। তাঁহার দৈনিক আয় দু লক্ষ ; প্রত্যেক দিন এক লক্ষ টাকার কিছু বেশী খরচ হয়। তবুও অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহার অর্থগৃধ্নুতাই অধিক। দেওয়ান [রায় নন্দলাল ; রাজ্যের মধ্যে ধূর্ত্ত-শিরোমণি] এবং আমিলগণ তাঁহার তহবিলে টাকা আমদানি করিবার জন্য অবিরত এত বিভিন্ন রকম ফন্দী বাহির করিতেছে যে উহা আপনাদের কাছে লিখিয়া শেষ করা যাইবে না, তাহাদের দুষ্টবুদ্ধি ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এই সমস্ত ফন্দি বাস্তবিকই লোককে অবাক করে।† রাজস্ব আদায়ের বেলা তাঁহার দেওয়ান ৮ মাসে বৎসর গণিতেন। কিন্তু অন্যান্য খাতে আয়ের তুলনায় জমির মালগুজারী ছিল তাঁহার আয়ের একটা সামান্য অংশ। মামা অন্যান্য বিষয়ে পাকা মুসলমান হইলেও হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দাদন দিয়া সুদ নেওয়া তিনি হালাল বলিয়া গণ্য করিতেন। হুগলীর হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ সুদে ধার দিয়া ছয়-সাত মাসে বৎসর গণিয়া নবাব সাহেব আসল টাকা বারো মাসের সম্পূর্ণ সুদসহ আদায় করিতেন।‡ ইহা ব্যতীত নবাব সাহেব নিজের নামেও ব্যবসা চালাইতেন। এই সরকারী কারবারের নাম ছিল সওদা-ই-খাস; উৎপীড়িত জনসাধারণ ইহাকে সওদা-ই-খাম্ বা নিন্দনীয় ব্যবসা আখ্যা দিয়াছিল। বাস্তবিকই এটা বেচাকেনার নামে দস্তুরমত লুট ছাড়া কিছুই নয়। দেশের লাভজনক পণ্যদ্রব্য ওলন্দাজ এবং ইংরেজগণ কর্ত্তৃক আমদানি করা বিলাতী মালের পছন্দসই জিনিসগুলি তিনি নিজ দামে কিনিয়া দেশীয় ব্যবসায়ীগণের কাছে নিজের দামেই বেচিতেন। নবাব সাহেবের সঙ্গে দর-কষাকষি কিংবা বেচা-কেনায় ওজর-আপত্তি করিলে কাহারও রক্ষা ছিল

* Tavernier, *Travels in India*, Part II, Book I, p. 51 (London, 1677).

† *The Indian Records*, Master Streynsham. Vol. I, p. 493.

‡ *Ibid*, Vol. II, p. 80.

না। নবাব শায়েস্তা খাঁ হুগলীর দিনেমারগণের* নিকট হইতে কম দরে মাল কিনিয়া শহরের ব্যবসায়িগণকে অত্যন্ত চড়া দামে ঐ সমস্ত পণ্যদ্রব্য সরাসরি কিনিতে বাধ্য করিতেন। হিন্দী জানা থাকিলে বাবা ধরমদাসের সহিত গলা মিলাইয়া নবাব সাহেব হয়ত গান ধরিতেন—

পুঁজী ন টুটো নফা চৌগুনা ;
বনিজ কিয়া হম্ ভারী।

একচেটিয়া (monopoly) বাণিজ্যের মজুরী বেচিয়া আয়-বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে আমাদের মামা রাণী এলিজাবেথকেও এক ছবক্ (পাঠ) পড়াইতে পারিতেন। তাঁহার আমলে জিলার আমিলগণ অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য—এমন কি গরুর বিচালি, বেত, জ্বালানি কাঠ, ঘর-ছানির শন ঘাস পর্যন্ত সমস্ত জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইত এবং দেশী-বিদেশী সমস্ত ব্যবসায়িগণের উপর জুলুম করিত। নবাব সাহেব কাগজে কলমে হাসিল আবওয়াব রদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্থানীয় কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে জুলুমের কোন অভিযোগ হইলে যদি নবাব সাহেব ভুলক্রমে তদন্তের হুকুম দিতেন তাহা হইলে তাহাদের এক কথায় সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইত— হুজুর ! আপনার হক্ (স্বার্থ) মাটি না হয় এজন্যই ত আমরা খবরদারী করিতেছি !” লবণের ব্যবসা সেকালেও সরকারের একচেটিয়া ছিল। বার্ষিক এক লক্ষ টাকা খাজনায় এক কালা-ফিরিঙ্গী (পর্তুগীস) হুগলী জেলার লবণের ব্যবসা ইজারা লইয়াছিল। যিনি টাকায় আট মণ চাউল এক টাকায় বিক্রী হইত বলিয়া অপরিসীম আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন এবং যাঁহার আমলকে আমরা বাঙ্গালায় মুসলমান-যুগের রামরাজ্য বলিয়া জানিতাম, তিনি কি স্বপ্নেও চিন্তা করিতেন গরীব চাষী টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী করিয়া ডাল-ভাত দূরের কথা নুন-ভাত† কেমন করিয়া যোগাড় করিত ?

মোট কথা, সরকারী ইতিহাস এবং বে-সরকারী মুসলমান ঐতিহাসিক—যথা শিহাব্ উদ্দীন তালিশের উপর নির্ভর করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁর চরিত্র এবং নবাবী আমলের ছবি আঁকিলে উহা সঠিক ইতিহাস হইবে কিনা সন্দেহ।

* *The Indian Records*, Master Streynsham, Vol. I, pp. 53, 81.

† সেকালে নুন-ভাত দুধ-ভাতের মত একটা বড় রকম আশীর্বাদ বলিয়া গণ্য হইত। লবণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত চট্টগ্রামে এখনও সচ্ছল অবস্থাকে “নুনে ভাতে” থাওয়া বলে। তিন-চারপুরুষ পূর্বে বাঙ্গালা এবং আসামের গরীব চাষীরা “নুন-ছাই” তৈয়ার করিয়া উহার চোয়ান জল দ্বারা লবণের কাজ চালাইত।

বাঙ্গালার দোজখকে যাঁরা বেহেশত্ করিয়া তুলিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে স্বর্গ শুধু আমীর-উমরা এবং আলেমগণের ভোগ্য ছিল; প্রজাসাধারণ যে-নরক সে-নরকেই পচিতেছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় সেকালেও মূর্খ গরীব প্রজা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সরকার বাহাদুরকে শ্বেতহস্তীর ন্যায় ভক্তি করিত; কিন্তু সাদা কিংবা হলদে হউক আর মেঘবর্ণই হউক ইতিহাস এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সরকারী হাতীর দাঁত বরাবরই দুই প্রস্থ—খানেকা এক, দেখ্‌লানেকা আউর।

চিত্রাবলী

১৬১৩ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১০২২) জাহাঙ্গীরের রাজত্বে গাজীপুর-নিবাসী কবি ওসমান স্বরচিত "চিত্রাবলী" নামক হিন্দী পুথির প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—

"কথা এক মৈঁ হিয়ঁ উপাই,
কহত মীঠি ঔ সুনত সোহাই।
... ...
বালক সুনত কানরস পাবা,
তরুনহ্ন কে তন কাম বঢ়বা।
বিরিধ সুনৈ মন হোই গিয়ানা,
রহ সংসার ধংধা জেই জানা।
জোগী সুনৈ জোগপংথ পাবা,
ভোগী কঁহ সুখ ভোগ বঢ়বা।
ইচ্ছাতরু এক আহ সোহাবা,
জেহি জস ইচ্ছা তৈস ফল পাবা।
মঞ্জুল মুকুর বিমল কর লেখা,
জো দেখৈ সো আপুহি দেখা।

[মনে মনে আমি একটি কাহিনী রচনা করিয়াছি, যাহা বলিতেও মধুর, এবং শুনিতেও চমৎকার। এই প্রেমগাথা বালকের শ্রুতিসুখকর এবং তরুণের কামোদ্দীপক। ইহার মধ্যে সংসারে মায়ার খেলা দেখিয়া বৃদ্ধগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, যোগী যোগের পথ খুঁজিয়া পাইবেন, ভোগী ভোগমার্গে অধিক আনন্দ পাইবেন। কল্পতরুর স্থায় ইহা সকলকে ইচ্ছানুরূপ ফলদান করিবে; এই মঞ্জুল মুকুরের বিমল প্রতিবিম্বে যিনি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন তিনি নিজেকেই দেখিতে পারিবেন, তাঁহার আত্মদর্শন লাভ হইবে।]

আমিও বহুদিন এমন কিছু তালাশ করিতেছি। ভাবিলাম, কবি ওসমানের "চিত্রাবলী" হয়ত এক আশ্চর্য ব্যাপার—একাধারে গণ-সাহিত্য, কাব্যকল্পদ্রুম কিংবা সেকেন্দর বাদশার জ্ঞান-দর্পণ। কিন্তু কবি-র এই আস্পর্ধা কালিদাসের দম্ভ এবং ভবভূতির অভিমানকে হার মানাইয়াছে দেখিয়া সন্দেহ হইল, তাঁহার এই

যাবী পেটেণ্ট ঔষধ কিংবা গ্রহশান্তি-কবচের বাগাড়ম্বর-বহুল নির্লজ্জ বিজ্ঞাপনের ধাপ্পাবাজী নয়ত? "চিত্রাবলী" রচনার তিয়াত্তর [৭৩] বৎসর পূর্বে শের শাহ্‌র সময়ে লিখিত জ্যায়সী-কৃত "পদ্মাবত", এবং সম্রাট মহম্মদ্ শাহ্-র রাজত্বে "চিত্রাবলী" লিখিত হইবার প্রায় ১১০ বৎসর পরে কবি নূর মহম্মদ-কৃত "ইন্দ্রাবতী" কাব্যের সহিত "চিত্রাবলী"র তুলনামূলক সমালোচনায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শেষোক্ত প্রেম-গাথা দুইটি জ্যায়সী-র অনুকরণেই লিখিত হইয়াছে। পদ্মাবত হইতে "চিত্রাবলী" কাব্যহিসাবে অনেক নিম্নস্তরের। "ইন্দ্রাবতী"-র মাত্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; তবুও মোটামুটি বুঝা যায়, উহা অন্ততঃ চিত্রাবলী-র সমশ্রেণীর কাব্য। জ্যায়সী-র মধ্যে বিনয় আছে; সুধীসমাজের কাছে তাঁহার নিবেদন—

"টুট সঁবারহু, মেরবহু সজা"

অর্থাৎ, কাব্যের দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া আমাকে দণ্ড দিবেন।

ইন্দ্রাবতী কাব্যেও অনুরূপ আবেদন আছে; অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন—

"মোহি বিবেক কিছু নাহী,
নহিঁ বিদ্যা বল আহি।"

[আমার বিবেক (দূরদৃষ্টি) কিছুমাত্র নাই, বিদ্যার জোরও নাই।]

চিত্রাবলী-র কবি স্বয়ং, প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত দোহাগুলির পরেই লিখিয়াছেন—

"জাকী বুদ্ধি হোই অধিকাই,
আন কথা এক কহৈ বনাই।
কবিনহ আগে দীন হোই, বিনতি করোঁ গহি পায়।
অচ্ছর টুট সঁবারেহু, দোষন লিয়েহু ছপাই॥"

[যাহার বুদ্ধি অধিক সে আর একটি কথা অর্থাৎ প্রেম-গাথা রচনা করুক। কবিগণের পায়ে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছি তাঁহারা যেন অক্ষরচ্যুতি ইত্যাদি সংশোধন করেন, দোষত্রুটি ক্ষমা করেন।]

এই উক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান আছে, লৌকিক বিনয়-প্রকাশও আছে। কবি ওসমান গোসাঁই তুলসীদাসজী-র সমসাময়িক। তিনি নিশ্চয়ই গোসাঁইজী-কে কবিতাযুদ্ধে আহ্বান করেন নাই, কাশীধাম ও গাজীপুর বেশী দূর নয়—হইলেও পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ছিল, এমন প্রমাণ নাই। প্রস্তাবনায় দোহাগুলি যে-স্থানে ছাপা-পুঁথিতে পাওয়া যায় উহার দ্বারা মনে হয়, যেন কবি ওসমান স্বকীয় কাব্যের প্রশংসায় মাত্রা ছাড়াইয়া নিজের দাম্ভিকতা জাহির করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়; স্থানচ্যুত হইয়া দুইটি দোহাগুলি

এই বিভ্রাট ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যায়সী এবং কবি নূরমহম্মদের কাব্যে রসাত্মক বাক্যের অনুরূপ প্রশংসা আছে। শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন—

"বচন অরথ হৈ বাস সমানা, কবি শ্রোতা হৈ ভঁবর সমানা।"

২

মুসলমান কবি-র কাব্যের উপর "হিন্দী"-ছাপ মারিয়া আমরা প্রথমেই হিন্দী-উর্দু বিতণ্ডার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াছি। স্বয়ং গান্ধীজী বিপাকে পড়িয়া দুই নৌকায় পা দিয়াছেন, না দিলেও গত্যন্তর নাই। গান্ধীজীর স্বপক্ষে একটা ভাল ঐতিহাসিক নজীর আছে। আকবর বাদশাহ অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া এবং একই ভাবের প্রেরণায় আইন জারি করিয়াছিলেন—প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভেই হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ পাঠশালা-মক্তব-মাদ্রাসায় নাগরী ও ফার্সি বর্ণলিপি লেখা এবং পড়া অভ্যাস করিবে; ইহাতে এক মাসের বেশী সময় লাগিবে না; অথচ, দিল্লীশ্বর বহু-শ্রুত হইয়াও সারা জীবনে নাম দস্তখত শিখিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হৌক মোটামুটি অবস্থা—মধ্যযুগের মুসলমান কবি আমীর খসরু, খান্‌খানা আব্দুর রহীম, জ্যায়সী, ওসমান ইত্যাদিকে লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে। মুসলমানেরা যে রচনা-কে উর্দু বলিয়া দাবী করেন, হিন্দুবা হিন্দী বলিয়া বলেন। এই বিরোধ মাঝে মাঝে হাতাহাতি এবং কখনও বা হাসির তুফান সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটা জাঠের গল্প মনে পড়িল।

এক পুণ্যাত্মা সৈয়দ-সাহেবের মৃত্যুর পর বিকাল বেলা ঘটা করিয়া কবর দেওয়া হইয়াছিল। কবরের পাশেই চাষের জমি। পরের দিন এক জাঠ চাষা জমিতে লাঙ্গল দিতে আসিয়া দেখিল, কবর খুঁড়িয়া গোর-খোদা জানোয়ার শব বাহির করিয়া ফেলিয়াছে, একটি জরখ্ (ইং-হায়েনা) শবটি জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হাল বলদ ফেলিয়া জাঠ তাহার জমিদার-বাড়ীতে গিয়া সোরগোল আরম্ভ করিল—"হুজুর! আপনার বাপকে জরখ টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" সৈয়দ সাহেবের বড় ছেলে বাহিরে আসিয়া জাঠ-কে উত্তম-মধ্যম দিতে দিতে বলিল, "আহাম্মক্ বেইমান্! আমার ওয়ালিদ সাহেব-কে জরখ লইয়া যাইতে পারে? নিশ্চয়ই জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে বেহেস্তে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়াছিস্। প্রহারের চোটে জাঠের মাথায় সুবুদ্ধির উদয় এবং মুখ দিয়া এক ছত্র কবিতা বাহির হইয়া পড়িল। জাঠ হাতজোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর। আপনার কথাই

ঠিক ; আমিও ঐ কথাই বলিয়াছি, আপনি বুঝিতে পারেন নাই।'

"তু কহতা ফেরেস্তা, মৈঁ কঁহ জরথ্।
বোলি বোলি আঁতর হৈ, বোলি বোলি পরথ্।"

[আপনি যাহাকে ফেরেস্তা বা দেবদূত বলেন আমি উহাকেই "জরথ" বলিয়া থাকি, কথা ও কথার মধ্যেই বিভিন্নতা, এক ভাষার বুলি অন্য ভাষার গালি।]

সৈয়দ-সন্তান মহা খুশী হইয়া জাঠকে কিছু বকশিশ দিলেন। হিন্দু-উর্দুর ব্যাপার আসলে "যার নাম চালভাজা তার-ই নাম মুড়ি"। উভয়ের মধ্যে কেবল নাগরী ও আরবী বর্ণলিপি লইয়াই ঝগড়া।

"চিত্রাবলী" কাব্যের জাতি-বিচার করিতে হইলে নিরপেক্ষ ভাবে কয়েকটি বিষয় সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত করা প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত এই পুস্তকের তিনখানা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুথি কাশী-নরেশের রামনগরস্থিত পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপি অতি আধুনিক। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী এই পুথির নকল সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহা কায়েথী হস্তাক্ষরে রামকান্ত ওঝা কর্তৃক, পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের জন্য নকল করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী একখানা ফার্সি অক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি (নকলের তারিখ জানা নাই) সংগ্রহ করিয়া কায়েথী প্রতিলিপির উপর উক্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ সাজাইয়া লইয়াছিলেন। দ্বিবেদী মহাশয় "চিত্রাবলী" কাব্যের এক সংস্করণ সম্পাদন করিবার চেষ্টা বোধ হয় করিয়াছিলেন। তিনি একাধিক কাজ আগলাইয়া বসিতেন এবং অন্য পণ্ডিত দ্বারা কাজ করাইতেন। সংস্করণের জন্য প্রস্তুত পাণ্ডুলিপিখানিতে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ দেখা যায়, কিন্তু কোথাও দ্বিবেদী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখা একটিও অক্ষর নাই, পাঠ শুদ্ধি নাই। শ্রীযুত জগমোহন বর্মা নাগরী-প্রচারিণী-সভা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই পুস্তক সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে দ্বিবেদী মহাশয়ের পাণ্ডুলিপির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। বর্তমান সংস্করণের ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হওয়ার পর তিনি আলাইপুরনিবাসী রমজান মিঁয়ার নিকট উর্দু অক্ষরে লেখা চিত্রাবলী-র একখানা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুথি পাইয়াছিলেন। পুথি সংগ্রহের বাতিকের জন্যই বোধ হয় সর্বসাধারণের কাছে রমজান মিঁয়া "পোথী মিঁয়া" নামেই বিশেষ পরিচিত। এই পুথিখানির পাঠ পূর্বোক্ত পুথিদ্বয়ের পাঠ অপেক্ষা শুদ্ধ ; যথা, এক জায়গায় "লহরী" শব্দের স্থানে "মহরী" (শব্দর্থ—পুঁটিমাছ) পাঠ দ্বিবেদী মহাশয়ের পুথিতে লিখিত আছে, ছাপাও হইয়াছে। দ্বিবেদী মহাশয় বাঁচিয়া থাকিলে কিন্তু পুঁটিমাছের সপক্ষে

'পদ্মাবত' পুথির ভাষ্য "সুধাকর-চন্দ্রিকা"র ন্যায়—"কনক-কচৌরী" শব্দের 'গরম ফুলকা লুচি' অর্থ করিয়া একটা কিছু জবাব দিয়া বসিতেন।

এখন বিচার্য বিষয়, স্বয়ং কবি ওসমান কোন্ হরফে তাঁহার পুথি লিখিয়াছিলেন? ইহা সর্বথা অনুমান-সাপেক্ষ; কারণ, নাগরী ও ফারসী দুই হরফে লেখা নকল পাওয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু আসল পুথি কোন্ হরফে লেখা ছিল কেহ বলিতে পারে না। "চিত্রাবলী"-র পূর্বে "পদ্মাবত", এবং পরে লিখিত "ইন্দ্রাবতী" সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। 'পদ্মাবত' কাব্যের* বেশীর ভাগ পুথি পাওয়া গিয়াছে ফার্সি অক্ষরে লেখা, কায়েথী নাগরী হরফে লেখা কয়েকখানা আছে। কবি নূরমহম্মদের "ইন্দ্রাবতী"-পুথির† ফারসী অক্ষরে লিখিত একখানা পাণ্ডুলিপি নূরমহম্মদের নাতি মৌলবী তসদ্দুকের নিকট হইতে মীর্জাপুরনিবাসী মৌলবী আবদুল্লা পাইয়াছিলেন। আসল পুথিখানা ফারসী অক্ষরে লেখা ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মৌলবী আবদুল্লা কায়েথী অক্ষরে এই পুথিখানা নকল করাইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল বলিয়াছেন জ্যায়সী-র গ্রন্থ সর্বপ্রথম ফারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, পরে উহা হিন্দী অক্ষরে নকল করা হয়। ফার্সী অক্ষরে লেখা 'ইন্দ্রাবতী'-র আসল পুথির কায়েথী অক্ষরে নকল করা ব্যাপার হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, মুসলমান কবিগণের রচিত প্রেমগাথাসমূহ সর্বপ্রথম ফার্সি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে দৌলত কাজী-র "লোরচন্দ্রাণী" এবং আলাওয়ালের "পদ্মাবতী" পুথি সর্বপ্রথম বাংলা কিংবা ফার্সি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল সঠিক বলা যায় না। ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লিখিবার কায়দা হইতে বুঝা যায়, মুসলমান আমলে মুসলমানেরা সবই ফার্সি অক্ষরে লিখিতেন। ইহার কারণ, জন্মাবধি তাঁহারা ঐ লিপির সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রেমগাথা-রচয়িতা মুসলমান কবিগণের সংস্কৃত সাহিত্য ও শব্দ-সম্ভারের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল; হিন্দী এবং বাংলা তাঁহারা সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা বেশী বই কম জানিতেন না। সাধারণতঃ বেশী বয়সে কোন নূতন ভাষা কেহ আয়ত্ত করিলেও সেই ভাষার বর্ণলিপি সুষ্ঠুভাবে অনেকে লিখিতে পারেন না। নাগরী লিখিতে না পারিলেও এই যুগে অনেকেই নাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী সাহিত্য অক্লেশে পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। দৃষ্টান্ত বেশী দূরে খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। মুসলমান আক্রমণকাল

* রামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত "পদ্মাবত", বক্তব্য, পৃঃ ৯

† ইন্দ্রাবতী, নাগরী-প্রচারিণী-সভা সংস্করণ।

পর্যন্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ মগধের বৌদ্ধ-বিহারে বসিয়া বাংলা হরফে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ইত্যাদি নকল করিয়াছেন। বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত পঠন-পাঠন কোন অজ্ঞাত কাল হইতে বাংলা দেশে প্রবর্তিত হইয়া আমাদের সময় পর্যন্ত ছিল। জ্যায়সী, ওসমান, নূরমহম্মদ ইত্যাদি কবিগণের অবস্থাটা বোধ হয় অনেকটা আমার মতই ছিল। হিন্দী কাব্য সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, কিন্তু একটি দোহা উদ্ধৃত করিতে হইলে, হয় বাংলা হরফেই লিখিয়া থাকি, কিংবা ছেলেদের দ্বারা নাগরী অক্ষরে লিখাইতে হয়।

মুসলমান কর্তৃক ফার্সী অক্ষরে যাহা লিখিত হইয়াছে, মুসলমান ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সুফীবাদ যে সমস্ত প্রেমগাথার প্রাণবস্তু, মুসলমানের ঘরে যাহা অমূল্য সম্পদ-জ্ঞানে আজ পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইতেছে—উহাকে হিন্দুগণ কেমন করিয়া আপনার জিনিস বলিয়া দাবী করিতে পারেন? এই সমস্ত প্রেমগাথার একটা সাধারণ রীতি আছে। ঐ রীতি আমীর খসরু এবং তাঁহার পূর্ববর্তী ফার্সী কবিগণের নিকট হইতেই মুসলমান কবিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতির বৈশিষ্ট্য—প্রথমে, নিরাকার নিরঞ্জন "একমেবাদ্বিতীয়" আল্লার স্তুতি, ইহার পরে, হজরত রসুলাল্লা মহম্মদ এবং তাঁহার "আছাবেবা" অর্থাৎ পার্ষদ-চতুষ্টয়ের সুন্নী-মতে প্রশংসা, উহার পরে তৎকালীন সুলতান-বাদশাহের গুণ-কীর্তন। এই সমস্ত কাব্যের মধ্যে কবিগণ কোথায়ও ইসলাম-বিরোধী কোন মতবাদ প্রচার করেন নাই, মূর্তিপূজা কিংবা বহুদেবদেবী-উপাসনার সমর্থন নাই। অপর পক্ষে, ইহা বলা যাইতে পারে, এই সমস্ত প্রেমগাথার নায়ক-নায়িকাগণ হিন্দুস্থানের রাজা-রাণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যা। 'পদ্মাবত'-কাব্যে জ্যায়সী তবুও সুলতান আলাউদ্দীন-কে প্রতি-নায়ক হিসাবে স্থান দিয়াছেন; পরবর্তীকালের 'চিত্রাবলী' কিংবা 'ইন্দ্রাবতী'-কাব্যের উপাখ্যান-অংশে কোথায়ও মুসলমানের নাম গন্ধ নাই। এই সমস্ত কবিগণ হিন্দুর দেব-দেবী, পূজা-উৎসব, সামাজিক রীতি ও লৌকিক সংস্কারের এমন সহৃদয়তাপূর্ণ চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা কোন হিন্দুর কবিতায়, এমন কি, তুলসীদাসজীর মহাকাব্যেও হিন্দুরা খুঁজিয়া পাইবেন না। ইহাদের ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দের হার শতকরা দুই হইবে কিনা সন্দেহ; অথচ কঠিন সংস্কৃত শব্দ ইহা অপেক্ষা চতুর্গুণ হইবে।

হিন্দী-উর্দু সংগ্রাম আমাদের মতে ভাষা, ভাব কিংবা বিষয়বস্তুমূলক নয়। ইহা নিতান্ত আধুনিক এবং কৃত্রিম সাম্প্রদায়িক আড়াআড়ি। মুসলমান যুগের উদার দৃষ্টি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক শ্রেণীর হিন্দু ভাষার মধ্যে ফারসী শব্দ দেখিলেই আঁতকাইয়া উঠেন; অথচ "কাগজ-কলম" বর্জন করেন

নাই। দাস-কবি* (১৭৩৫-১৭৫৪ খৃঃ) সমসাময়িক হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ব্রজভাষা ভাষা রুচির কহৌ সুমতি সব কোয়।
মিলৈ সংস্কৃত পারসিহু অতি প্রকট জুহোয় ॥
মিলৈ অমর ব্রজ মাগধী নাগ যবন ভাখানি।
সহজ পারসীহু মিলে খট বিধি কবিত বখানি ॥"

[সুধী ব্যক্তি সকলেই বলিয়া থাকেন, ব্রজভাষার সংস্কৃত এবং পারসিক ভাষার সহিত মিলন ঘটিলে ইহা অতি প্রকট প্রকাশশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। যে কবিতায় অমর ভাষা সংস্কৃত, মাগধী, নাগ (রাজপুতানার অপভ্রংশ), যবন ভাষা (পাঞ্জাবী) এবং পারসিক ভাষার সহজভাবে মিলন ঘটে সেই কবিতা-ই প্রশংসার যোগ্য।]

হিন্দী ভাষার এইরূপ উদার সংজ্ঞা কদাচিৎ দেখা যায়। দাস-কবি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমাদের চোখের ছানি কাটিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার উপর জবরদস্তি করিতে গিয়াই, খোট্টা এবং বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান, ভাষা-সংগ্রাম বাধাইয়া অখণ্ড সমাজে অকারণ তিক্ততা সৃষ্টি করিতেছেন। মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কবীর দাসজীর ন্যায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজাবাদশাহ্-র জন্য কবিতা রচনা করেন নাই; সর্বসাধারণের কথিত ভাষায় হিন্দু-মুসলমান-কে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেষণ করিয়াছেন; কবীরজী বলিয়াছেন—

"জাতি ন পুছো সাধ্ কী পুছি লিজিয়ে জ্ঞান।
মোল করো তরবার কা পড়া রহন দো ম্যঁান।"

[সাধুর জাতিবিচার না করিয়া জ্ঞান যাচাই কর; তলোয়ারের দামটাই জানিয়া লও, খাপ পড়িয়া থাকুক।]

সৎ-সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ভাষা এবং বর্ণলিপির কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া সর্বদেশ, সর্বজাতির সাহিত্য হইতে যিনি রস গ্রহণ করিতে পারেন না তিনি রসজ্ঞ নহেন; মৌমাছি মধুসংগ্রহের সময় দেশী-বিলাতী ফুল বিচার করে না। বাংলা এবং হিন্দী ভাষার ছুৎমার্গীর দল ভাষার পরম শত্রু। অপরের নিকট হইতে ভাবসম্পদ এবং তৎসঙ্গে কিছু কিছু শব্দ আমদানি না করিয়া ভারতের কোন ভাষাই সবল এবং সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই, এবং ভবিষ্যতেও পারিবে না।

* মিশ্র বন্ধুবিনোদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৯১।

মোট কথা, ডান হইতে বামদিকে উর্দু অক্ষরে লেখা আমাদের 'পদ্মাবতী' পুথি বাঙালী হিন্দু আপনার বলিয়া যদি দাবী করিতে পারেন, কবি ওসমানের "চিত্রাবলী" গাথাও হিন্দী বলিয়া দাবী করিবার সঙ্গত কারণ আছে, "পদ্মাবতী" পুথির—

"যমুনার মধ্যে যেন সুরসরি ধারা"

—বাঙালীর মনে একদিন যে প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছিল উহা কোন বাঙালী হিন্দুর বাংলা হরফে লেখা কবিতা হইতে কম মুখর নহে।

৩

"চিত্রাবলী" কাব্য মোট ৪৫ "খণ্ড" বা অধ্যায়ে বিভক্ত। কাব্যের গল্পাংশ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। ইহাতে ইতিহাস এবং সম্ভব-অসম্ভবের ঘোলশ্রাদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আশা করি, কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া রসভঙ্গ করিবেন না।

নেপাল-রাজ্যের রাজা ধরণীধর বহু বৎসর পর্যন্ত পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। মন্ত্রীদের পরামর্শে তিনি সাধুসেবার জন্য এক বিরাট অন্নসত্র খুলিলেন। রাজা ভক্তিসহকারে, সমাগত সাধুগণের পরিচর্যা করিতেন; কোন প্রার্থী-কে তিনি বিমুখ করিতেন না। নিকটেই কৈলাস পর্বত। রাজার ভক্তি ও সত্য পরীক্ষার জন্য স্বয়ং হর-পার্বতী যোগী ও যোগিনী-বেশ ধারণ করিয়া একদিন রাজার ধর্মশালায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে জলগ্রহণ করিবেন না শুনিয়া ধরণীধর বিনীতভাবে যোগীদম্পতির প্রার্থিতব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ছদ্মবেশী মহাদেব বলিলেন, দেবোদ্দেশে তোমার মস্তক আমায় দিতে হইবে, অন্য কিছু আমি চাহি না। রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলির পাঁঠার ন্যায় তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। রাজার ভক্তি ও সাহস দেখিয়া হর-পার্বতী প্রীত হইলেন; রাজা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং শিব ও ভবানী। কবি লিখিয়াছেন—

"সুরসরি সীস কলানিধি মাথে,
ফন-পতি গ্রীব বসহ কর নাথে॥
... ...
রুণ্ড মাল গল ডমরু হাথা।
ঔ পুনি গিরিবর-সুতা ধনি সাথা॥
... ...

লোচন মধ্য অগিনি অঙ্গায়া, জেহি তে মদন ভসম সম জয়া ॥

[তাঁহার শিরে সুরসরিৎ গঙ্গা, মূর্ধাদেশে কলাসিধি, গ্রীবাদেশে ফণিপতি বাসুকি, গলায় রুণ্ডমালা, হাতে ডমরু ; তাঁহার পার্শ্বে শিখর-সুতা গৌরী। তাঁহার মধ্যলোচন অগ্নিময় অঙ্গার সদৃশ, যে অগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল।]

উমা-মহেশ্বরের বরে রাজার একটি পুত্র জন্মিল। গ্রহবিপ্র "হোড়াচক্র" বিচার করিয়া নাম রাখিলেন, সুজান-কুমার। মহা ধুমধামের সহিত কুমারের ষষ্ঠীপূজা সম্পন্ন হইল। দ্বাদশ দিনে রাজা সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে কুমার বিদ্যাশিক্ষার্থ পণ্ডিতের গৃহে প্রেরিত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার সহিত শরীরচর্চা ও ধনুর্বেদ, অশ্বচালনা ইত্যাদি কুমার যথারীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন কুমার সৈন্য-সামন্ত লইয়া শিকারে চলিলেন, সঙ্গে শিকারী-চিতার গাড়ী, শিকল-বাঁধা তাজী কুত্তা—যেন কুমার সেলিম বাদশাহী শিকার-খানার সরঞ্জাম সহিত শিকারে চলিয়াছেন। গভীর অরণ্যমধ্যে কুমার অনুচরবর্গ হইতে বহু দূরে একাকী শিকার খেলিতে খেলিতে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা আশ্রয়স্থান খুঁজিবার জন্য একটি পাহাড়ের উপর উঠিলেন। ঐখানে পরিষ্কার জায়গায় এক খাটিয়া [হিঃ মচী] দেখিতে পাইয়া পরিশ্রান্ত কুমার উহার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে এক দৈত্য আসিয়া দেখিতে পাইল, একজন মানুষ তাহার খাটিয়ায় শুইয়া আছে। ঐ দৈত্যই পাহাড়ের মালিক ; সে অত্যন্ত দয়ালু, আতিথ্যধর্মের সহিত অপরিচিত নহে। কুমারের কাছে বসিয়া বাঘ ভালুক হইতে অতিথি রক্ষা করিবার জন্য সে জাগিয়া রহিল।

এই ভাবে একপ্রহর গত হইবার পর আর এক দৈত্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুইজন পরম বন্ধু, বহুদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। আলিঙ্গন, কুশল-প্রশ্ন ইত্যাদির পর বন্ধু বলিল, তোমাকে আজ রাতে আমার সঙ্গে রূপনগর যাইতে হইবে। দক্ষিণাপথে রূপনগর রাজ্য। রাজা চিত্রসেনের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা চিত্রাবলী এখন একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। গতকাল তাঁহার জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে ; সারারাত সেখানে নাচ-তামাশা দেখিয়াছি : কলিকালে যত রাগ-রাগিণী* প্রচলিত আছে সবই শুনিয়াছি। গুণীগণের গান শুনিয়া হাহা-হুহু

---

* মূলগ্রন্থে এক পাতায় (পৃঃ ৩০) সংগীতশাস্ত্রের "হনুমন্ত" মত "পার্বতী" মতের বিচার, রাগরাগিণী, গান্ধার-ধৈবত ইত্যাদি স্বরের বর্ণনা আছে। মুসলমান আমলে সংগীত চর্চা সম্বন্ধে যাঁহারা গবেষণা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই অংশ অবশ্যই পড়িবেন। এই শাস্ত্রে আমার অধিকার নাই ; সুতরাং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। রাগিণীর মধ্যে "বংগালী" বাদ পড়ে নাই।

গন্ধর্ব চুপ হইয়া যায়, সুরপতি ইন্দ্র লজ্জায় মাথা নীচু করেন। দৈত্যের বন্ধু সমজদার রসিক। বন্ধুকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রূপনগরের নাচওয়ালীর কথা শুনাইয়া বলিল, তাহাদের রূপের ধাঁধায় দৃষ্টিশক্তি, কণ্ঠরাগে শ্রবণযুগল বাঁধা পড়িয়া থাকে; কিন্তু দর্শকের অবুঝ মন তাহাদের পায়ে পড়িয়াও রেহাই পায় না, নাচের তালে তালে লাথি খাইয়াও লাগিয়া থাকিতে চায়।

কুমারের পাহারায় নিযুক্ত ঐ দৈত্যের তামাশা দেখিবার শখ হইল, অথচ অতিথিকে ছাড়িয়া যাওয়ার যো নাই। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঘুমন্ত রাজপুত্রকে খাটিয়াসমেত উঠাইয়া রূপনগরে চিত্রাবলী-র কলাভবনে শোয়াইয়া রাখিল। আধা রাতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর রাজপুত্র দেখিল, সে যেন এক স্বপ্নপুরীতে আসিয়াছে। চিত্রশালার প্রাচীর-গাত্রে সারিসারি চিত্র, কাছেই নানাবিধ রং তুলিকা ইত্যাদি। উহার মধ্যে যেন এক সজীব অপরূপ নারী-মূর্তি প্রাচীর-গাত্র আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুজানকুমার উহাকে দেখিয়াই মোহগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার উন্মাদ অবস্থা—

"কবহুঁ সীস পাই তর ধরহী, কবহুঁ ঠাঢ় হোই বিনতী করহী।
কবহুঁ চাহৈ অঞ্চল গহ, হাথ ন আব অচক মন রহা।"

কখনও পায়ের নীচে মাথা রাখিতেছেন, কখনও করজোড়ে দাঁড়াইয়া মিনতি করিতেছেন, কখনও আঁচল ধরিতে যাইয়া ধরিতে পরিতেছেন না। কুমার জ্ঞান হারাইয়াছেন। উহা যে মানবী নয়, শুধু পটে-লিখা ছবি! হতাশ হইয়া কুমার নিজের ছবি কুমারীর পাশে আঁকিয়া রাখিলেন। আবার তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিবার পর কুমার দেখিতে পাইলেন তিনি নির্জন পাহাড়ের উপর নিতান্ত একাকী পড়িয়া আছেন। অর্ধরাত্রির সেই সুরম্য চিত্র-সারিকা নাই, প্রিয়তমাও নাই। তবে ইহা কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? নিজের হাত এবং পরিধেয় বস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন, জায়গায় জায়গায় রং লাগিয়া আছে। স্বপ্নে মন রঙীন হইতে পারে, জড়বস্তু কি করিয়া রঞ্জিত হইতে পারে? ইহার পর কুমারের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ও প্রেম-বিকার।

রূপনগরের রাজকন্যা চিত্রাবলী-র অবস্থাও তদ্রূপ। চিত্রশালায় তাঁহার ছবির পাশে অনিন্দ্যসুন্দর রাজপুত্রের ছবি দেখিয়া তিনিও প্রেমে উতলা হইলেন। পটের সহিত কন্যার ঐ প্রেমের বাতিক দূর করিবার জন্য রাণী, এক ভৃত্যের কথা শুনিয়া, কুমারের চিত্রটি ধুইয়া ফেলিলেন। ইহাতে ফল হইল বিপরীত। রাজ-কুমারীর হুকুমে ঐ চাকর-কে মাথা মুড়াইয়া দেশের বাহির করা হইল। চিত্রাবলী

পটে-আঁকা কুমার-কে মর-জগতে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে অন্দরমহলের নপুংসক খোজাগণকে পাঠাইলেন। তাহারা যোগী-বেশে ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ণনার অনুরূপ সেই বিরহী রাজপুত্রকে সন্ধান করিতে লাগিল। দৈবক্রমে ইহাদের মধ্যে একজন নেপাল-রাজ্যের ধর্মশালায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে চিনিয়া ফেলিল। রাজপুত্র যোগী হইয়া রূপনগর চলিলেন; সেখানে এক শিব-মন্দিরে চিত্রাবলী-র সহিত গোপনে সাক্ষাৎ হইল। পরের দিন রাজকুমারী কর্তৃক অপমানিত সেই ভৃত্য সুজানকুমারের নিকট আসিয়া বলিল, চিত্রাবলী যাদুগুণ-সম্পন্ন এক কাজল পাঠাইয়াছেন; এই কাজল চোখে দিলে আপনাকে কেহ দেখিতে পাইবে না; আপনি নির্বিঘ্নে রাজকন্যার মহলে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

প্রেমে পড়িলে মানুষ চোখ থাকিতেও আঁধা হইয়া যায়, সাধুও চুরিবিদ্যা আশ্রয় করে। রাজপুত্র প্রলোভনে পড়িয়া ঐ বিষাক্ত কাজল চোখে দেওয়া মাত্র স্বয়ং অন্ধ হইয়া গেলেন। পাষণ্ড ভৃত্য কুমার-কে ভুলাইয়া এক পাহাড়ের গুহায় ফেলিয়া দিল। গুহার মধ্যে ছিল এক বিরাট অজগর সাপ। কুমার-কে উদরস্থ করিয়া অজগর ছটফট করিতে লাগিল; কেননা, বিরহ-ক্লিষ্টের দেহের তাপ দাবাগ্নিকে হার মানায়। অজগর কোনমতে কুমার-কে পেটের বাহির করিয়া পলাইয়া গেল। পাহাড়ের উপর হইতে একটি বনমানুষ এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। বনমানুষ মৃতপ্রায় রাজপুত্রকে গুহা হইতে তুলিয়া আনিল এবং একপ্রকার পাতার রস চোখে দিয়া কাজলের বিষক্রিয়া দূর করিল। বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কুমার এক হাতীর সামনে পড়িলেন। হাতী কুমার-কে শুঁড়ে উঠাইয়া আছাড় মারিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় এক অতিকায় পক্ষীরাজ হাতীকেই ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হাতী আকাশ হইতে রাজপুত্রকে সমুদ্রের কিনারায় বালিয়াড়ির উপর ফেলিয়া দিল। ঐ দেশের সাগররাজার কন্যা কৌলাবতী [কমলাবতী] সখীগণের সহিত নিকটস্থ উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন। তিনি যোগী সুজানকুমার-কে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। সাধুসেবা-র অছিলায় কৌলাবতী কুমার-কে অন্তঃপুরে ভোজন করাইতে বসিলেন; কিন্তু কুমার রাজ-কুমারীর আত্মনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন। বিদায়ের সময় এক সখী সাধু-র করঙ্গের মধ্যে ভিক্ষান্নের সহিত রাজকন্যার হার ফেলিয়া দিল। চুরির অপরাধে কুমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঐখানে রাজকন্যার সখী কুমুদিনী-র মারফৎ প্রেমবার্তার জ্বালা বিরহ-যন্ত্রণা অপেক্ষাও কুমারের পক্ষে অসহ্য হইল।

কয়েক মাস পরে সোহিল-রাজা কৌলাবতী-কে প্রার্থনা করিলেন। এই

ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সাগর রাজার রাজধানী অবরুদ্ধ; রাজা সপরিবার জহর-যজ্ঞে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত। এই সংবাদ পাইয়া বন্দী রাজকুমার সোহিল-রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুমার অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সোহিল-রাজাকে বধ করিলেন। জয়মাল্যস্বরূপ কৌলাবতীর বরমালা কুমারের গলায় পড়িল; কিন্তু বাসর-রাত্রির পুষ্পশয্যায়, উদাসী ভ্রমর কমলের প্রতি বিমুখ হইয়া, নিজের দুঃখ নিবেদন করিল :—

"কুঁঅর কহা সুহ রাজকুমারী, হৌ জোগী
জস ভঁবর দুখারী।
খোজত অহা জো কেতকি বাসা, বীচহি
অম্বুজ কীহ গরাসা॥
জো লহঁ ভৌর কেতকি পাবৌ, কৌল
আস তৌ লৌঁন পুরাবে।
*　　　*　　　*
এক প্রেমরস হোই তব্, জব্
চিত্রাবলী পাউ।"

[রাজপুত্রি! আমি উদাসী, যোগী। দুঃখী ভ্রমর কেতকী-র সুবাস খুঁজিতে খুঁজিতে অর্ধপথে অম্বুজগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভ্রমর যে পর্যন্ত কেতকী-কে পাইবে না সে পর্যন্ত কমলের বাসনা পূর্ণ হইবার নয়; প্রেম-রস তখনই হইবে যখন আমি চিত্রাবলীকে পাইব।]

যাহা হৌক, রাজকুমারী প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলেন না। মোটকথা, "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটকের নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা উভয়ের সম্পর্ক কিছু ঘনিষ্ঠতর হইল। কবি বলিয়াছেন—

অধরন্হ নাই অধর রস লীন্হা।
এক রস ছাড়ি ঔর সব রস দীন্হা॥

সুজানকুমারের আকস্মিক অন্তর্ধানে রূপনগরের রাজকন্যা চিত্রাবলী শমীতরুর ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচর অন্তরের আগুনে পুড়িতেছিলেন; বাহিরে শ্যামশ্রী, ভিতরে অনন্ত অঙ্গার। তাঁহার দূতগণ আবার চতুর্দিকে পলাতকের অনুসন্ধানে ছুটিল। পশ্চিম দিকে প্রেরিত দূত প্রথমে মুলতান দেশে উপস্থিত হইল। সেখানে সিদ্ধী লোকের বাস, তাহারা মহীরাবণের* উপাসক। মুলতান হইতে দূত ঘট্টা বন্দরে

* ভারতবর্ষে এরূপ কোন সম্প্রদায় ছিল কিনা জানা যায় নাই। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক।

[বর্ত্তমান করাচীর কিছু দূরে] চলিল। সেখানে বিভিন্ন বর্ণের সুশ্রী লোক দেখা যায়। উহা লরকানা* ও বেলুচ-জাতির দেশ। থট্টা হইতে দূত পেশাওয়ার ও কাবুল চলিল। কাবুল "মোগল" জাতির দেশ; ঐ দেশের রাজারা পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কাবুলের পরে বদখ্শান, খোরাসান, সিকেন্দর বাদশার রাজ্য রূম (Constantinople) এবং "শ্যাম" বা সিরিয়া দেশ। ইহার পরে হাজীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজকুমারীর চর মক্কা যাত্রা করিল। কবি বলিয়াছেন, যাহারা কাবা-শরীফের পাথর-কে পাথর বলিয়া মনে করে তাহারা চোখ থাকিতেও আঁধা। যাহার "সিনা" [অন্তঃকরণ] সাফ হয় না, সে মদীনা গেলেও কি হয়?

দক্ষিণ দিকের চর একেবারে ইংরেজের দেশ বলন্দীপ পর্যন্ত দেখিয়া আসিল। সেখানে ছোট বড় সকলেই ধন্ত; যেখানে সেখানে বন্দর। তাহারা শুয়ারের মাংস এবং শরাব খায়। পূর্বদিকে দূতের সফর মথুরা হইতে চীন দেশ পর্যন্ত। মথুরা বৃন্দাবন, দিল্লী প্রয়াগ, কাশী এবং রোহতাস দুর্গ তালাশ করিয়া দূত ত্রিহুত অর্থাৎ উত্তর বিহারে উপস্থিত হইল। গাজীপুরের মুসলমান কবি বিদ্যাপতি-র কবিতার সহিত সুপরিচিত ছিলেন; ত্রিহুতে তিনি রূপনগরওয়ালীর চর-কে বিদ্যাপতি-র গান শুনাইয়াছেন। বিহার হইতে বাংলাদেশে প্রবেশ করিবার পথ "গঢ়ী" (রাজমহলের পশ্চিমে সিক্রিগলী)। উহার উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে পাহাড়; সাহসী ব্যক্তিরাই শুধু এই পথ দিয়া যাইতে পারে, প্রথমে সাবধান না হইলে মাঝপথে ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে হয়। ভাটী বা পূববঙ্গে পৌঁছিয়া যোগীবেশে রাজকুমারীর চর বাড়ী বাড়ী রাজকুমারকে তালাশ করিল। সোনারগাঁ, ভুলুয়া, চট্টগ্রাম, সন্দীপ বেড়াইয়া রূপনগরের দূত আসাম চলিয়া গেল; ঢাকা শহরে আসিল না, অথচ তখন ইহা বাঙ্গালার রাজধানী। বাংলা দেশ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"পূরব অপূরব দেশ বঁগালা, পুহুমি হরিয়রি তীনিহু কালা।

... ...

পাঁচ মাস ভূমি জলপূরী, ধূরি নাঁও পৈ দেখে ন ধূরী॥

সুখে পঁথন চলৈ বটাউ, নাঁও পাউ কৈ দেহলী পাউ।

অন্ন ধন সুখ দুখ নিত গালী, দয়া হিয়ে পৈ লোক বঁগালী॥

---

* মূলে "লবকা ন বলুচা" আছে। ইহার কোন অর্থ হয় না। ফার্সি-লিপি হইতে পাঠোদ্ধারে সম্পাদক মহাশয় "ন" কে আলাদা করিয়াছে। সিন্ধুর 'লরখানা-জিলার' নাম হয়ত এই "লরকানা" জাতি হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

জঁহ লহ হিঁচ্ছা উঁহ লহ মিত্তা, হীঁচ্ছা মিটৈ বিসারে চিন্তা।
সব কঁহ অমিরিত পাঁচ হৈ, বঁগালী কঁহ সাত।
কেলা কাঁজী পানরস, সাগ মাছরী ভাত॥"

[পূর্ব দিকে বাঙ্গালা এক অপূর্ব দেশ। এইখানে ভূমি চিরসবুজ, তৃণরাজি শ্যামল। বৎসরে পাঁচ মাস এইদেশ জলে ভরা, পান্থ নৌকা ব্যতীত পথ খুঁজিয়া পায় না। ডাঙার রাস্তায় ডাকাত বাটপাড; কিন্তু নৌকায় চড়িয়া দিল্লীও যাওয়া যায়। সুখের মধ্যে অন্ন এবং ধনের প্রাচুর্য; দুঃখের মধ্যে নিত্য গালি (?)। বাঙ্গালী লোক দয়ালু। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বন্ধু (আসল অর্থ, 'বান্ধবী') পাওয়া যায়। মিতা একবার জুটিলেই অন্য কথা মনে পড়ে না।* সকলেই বলে 'অমৃত' (দধি মধু ঘৃত শর্করা ইত্যাদি) পাঁচ দ্রব্য, বাঙ্গালীরা বলে সাতটি, যথা—কদলী, কাঞ্জিক, পান, খেজুরের রস, শাক, মাছ ও ভাত।]

বাংলাদেশে নিরাশ হইয়া দূত কোঁচ, কাছাড, মণিপুর, রোহাঙ্গ, পেগু, আবা শহর ইত্যাদি স্থানে রূপনগরওয়ালীর প্রেমাস্পদ-কে খোঁজ করিল। ইহার পর আবার বক্রপথে আসামে উপস্থিত হইল। আসাম দেশের রাজার উপাধি "স্বর্গদেব"। হরিয়াল পাখী যেমন অন্তরীক্ষে বাস করে, কখনও মাটিতে পা দেয় না—সেইরূপ অসমিয়াগণ রাতদিন মাচার উপর থাকে। তাহাদের যান-বাহন—নৌকা এবং হাতী। পূর্বদিকে চলিতে চলিতে চীন দেশে উপস্থিত হইয়া দূত কাহিল হইয়া পড়িল। এখন আর পৃথিবী নাই, কোথায় সে যাইতে পারে? বাকী রহিল শুধু স্বর্গ; সেখানে যাইতে হইলে কথিয়াবাড়ের গিরনার পর্বতের চূড়ায় উঠিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দূত গিরনার পর্বতে ফিরিয়া আসিল। দৈবাৎ এই সময়ে সুজানকুমার কৌলাবতী-র নিকট হইতে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া গিরনার তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। কুমারের সন্ধান পাইয়া দূত তাড়াতাড়ি রূপনগরে ফিরিয়া আসিয়া চিত্রাবলী-কে সংবাদ দিলেন, কেতকী-র পুষ্পহারা ভ্রমর এখন কমলের কয়েদী। চিত্রাবলীর বিনয়পত্রিকা লইয়া দূত আবার ছদ্মবেশে সাগর-রাজার রাজ্যে চলিল। সেখানে শহরের মধ্যে প্রচার হইল এক সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছেন। হুজুগে মাতিয়া বালক বৃদ্ধ তরুণী বালিকা দলে দলে বাবার চারিদিকে ভিড় জমাইল।

---

* সেকালে বিদেশী লোকেরা বাংলাদেশে আসিলেই একটা বিবাহ করিত, কিংবা "পরদেশী" দুঃখের গান গাহিয়া নীচ শ্রেণীর বান্ধবী যোগাড় করিত। নিজের মতলবেই ফাঁদে পড়িয়া, খোট্টারা এমন আরাম আয়েসের বাংলা মুলুক ছাড়িত না। তাহাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষেরা বিশ্বাস করিত "বংগাল-কা যাদু" খোট্টা-কে দিনে ভেড়া, রাতে মানুষ করিয়া রাখে।

অল্পকালের মধ্যে প্রচার হইল, সিদ্ধবাবা দৃষ্টিমাত্রে সকলের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারেন ; তাঁহার কৃপায় কুষ্ঠরোগী গলিত অঙ্গ ফিরিয়া পায়, বন্ধ্যা পুত্র-সন্তান লাভ করে, পরিত্যক্তা স্ত্রী-র পলাতক পরদেশী স্বামী ঘরে ফিরিয়া আসে, ইত্যাদি। একদিন স্বয়ং সুজানকুমার সিদ্ধ-মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিলেন। গোপন সাক্ষাৎকারের সময় দুজনেই দুজনের পায়ে লুটোপুটি। চিত্রাবলীর চিঠি পড়িয়া কুমার সাগর-রাজার রাজ্য হইতে পলায়নের মতলব করিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি কৌলাবতীকে বলিলেন—

"কহেসি সুনহু অব রাজদুলারী, হৌঁ পরদেশী আদি ভিখারী।"

"আউ ন.হমরে কাজ রহ, রাজপাট সুখ ভোগ।

চিত্রাবলী হিয়রে বসে, জাকর বিরহ-বিয়োগ॥"

—রাজদুলালী! আমি পরদেশী, প্রথমে ভিখারী ছিলাম। এখন আমার রাজপাট সুখভোগে আর কাজ নাই। আমি যাহার বিরহ-বিয়োগী সেই চিত্রাবলী-ই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ইহার পর কৌলাবতীকে অল্প কয়েক কথায় প্রবোধ দিয়া কুমার যোগীবেশে ছেঁড়া-কাঁথা কাঁধে ফেলিয়া সিদ্ধপুরুষের সহিত প্রস্থান করিলেন। রূপনগরে যোগী আত্মপ্রকাশ করিয়া চিত্রাবলী-কে বিবাহ করিলেন। পরে কৌলাবতীকেও রূপ-নগরে লইয়া আসিলেন। অবশেষে সুজানকুমার দুই রাণী লইয়া পৈত্রিক রাজ্যে ফিরিলেন।

চিত্রাবলী-কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু শেষ কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে—

"জ্ঞান ধ্যান মদ্ধিম সব, জপ তপ সংজম নেম।

মান সো উত্তম জগত-জন, জো প্রতিপাবৈ প্রেম॥

—জ্ঞান-ধ্যান জপ-তপ নিষ্ঠা-সংযম সমস্তই মধ্যম—মন্দের ভাল। যিনি প্রেমের পথে অবিচল, জগতের লোক তাঁহাকেই উত্তম বলিয়া জানিবে।

বেদান্তদর্শন হইতেও সূক্ষ্মতর, কামশাস্ত্র হইতেও স্থূলতর অথচ দুর্জ্জের, অজেয় প্রেমের জয় কবি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমান মুহূর্তে হয়ত তাঁহার বাণী-র সার্থকতা আছে।

এই প্রবন্ধের মুখ উদ্দেশ্য কাব্য-সমালোচনা কিংবা ঠাকুরমার ঝুলি ঝাড়িয়া ভূতুড়ে গল্প বাহির করা নয়। বিনা মতলবে ঐতিহাসিক কদাচিৎ কাব্য পাঠ করিয়া থাকে। এই "চিত্রাবলী" প্রেমগাথার মধ্যে ইতিহাসের মালমশলা আছে; ভবিষ্যতে হয়ত কেহ উহার সদ্ব্যবহার করিবেন। কবি ওসমান এবং তাঁহার কাব্য হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। ইসলামের নির্মল একেশ্বর-বাদ হিন্দুস্থানের মাটির পেয়ালা ভরিয়া যেভাবে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়কে পরিবেষণ করিয়াছেন উহাতে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণও স্পর্শদোষ আরোপ করিতে পারেন না।

কাব্যের প্রারম্ভেই ঈশ্বরস্তুতি; ইহাতে আল্লা কিংবা খোদাতালা শব্দ-হিসাবে কোথায়ও নাই, অথচ নিঃশব্দে সর্বত্র আছেন, গুপ্ত অথচ প্রকট। ওসমানের গুরু ছিলেন বাবা হাজী নামক যোগসিদ্ধ ভেদবুদ্ধিমুক্ত মহাপুরুষ। সাধনা সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"নিজু সো মথনী একদিন, মথত মথত গা কুটি।
তত্ত্বমসী পুনি তত্ত্ব সোঁ, জায় নরক সব ছুটি॥"

—দেহ-ভাণ্ড (জ্ঞানরূপ মন্থনদণ্ড দ্বারা) মন্থন করিতে করিতে একদিন দেহ অর্থাৎ অহংজ্ঞান লোপ পাইবে; "তৎত্বমসি"-জ্ঞান উদয় হইলে সব নরকের ভয় কাটিয়া যায়।

মুসলমান কবি ও সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছেন; অথচ এই প্রচারের ভাষা ও ভাবধারার মধ্যে কোথায়ও বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা নাই। খৃষ্টান পাদরীগণের ন্যায় পরধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং সমাজের কুৎসা ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরণের উৎসাহ মুসলমান আমলে মোল্লাদেরও ছিল না। আমীর খসরুর সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় চারিশত বৎসর পরে জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ঐ ব্যবধান অন্ততঃ ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই না। মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের মর্যদা ক্ষুন্ন না করিয়া মনে-প্রাণে ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। কবি ওসমানের জন্মভূমি গাজীপুর-বর্ণনাই ইহার স্বষ্ঠু দৃষ্টান্ত। যথা—

"গাজীপুর উত্তম অস্থানা, দেবস্থান আদি জগ জানা।
গঙ্গা মিলি যমুনা তঁহ আই, বীচ মিলি গোমতী সুহাই॥
তিরধারা উত্তম তট চীন্হা, যাপর তঁহ দেবতন তপ কীন্হা।

পুনি কলিযুগ মই বসতিগ ভই, জানহু অমরপুরী বসি গই ।
উপর কোট হেট সুরসরী, দেখতে পাপ বিথা জঁহ হরী ।"

[গাজীপুর উত্তম স্থান। সকলেই জানে আদি অর্থাৎ সত্যযুগে ইহা দেবতার বাসভূমি ছিল। যমুনার সহিত মিলিয়া গঙ্গা সেথানে আসিয়াছেন; মধ্যপথে মিলিয়াছে সুনীরা গোমতী। ত্রিধারা-র তটে পবিত্র স্থান জানিয়া দ্বাপর যুগে দেবতারা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কলিযুগে আবার লোকবসতিপূর্ণ অমরপুরীসদৃশ নগর এইস্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। উপরে নগরদুর্গ। যাহাকে দর্শনমাত্র পাপ তাপ দূর হয় সেই সুরসরিৎগঙ্গা নিম্নদেশে প্রবহমানা।]

হিন্দুর তর্জমায় কবির ভাষাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করা হইয়াছে—এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে হয়ত পাঠকের বিরক্তিকর মূল দোঁহা উদ্ধৃত করিয়াছি। ওসমান সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের সহিত সম্যক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উপর পাণ্ডিত্য ফলাইবার বিদ্যা লেখকের নাই। সুতরাং কবির শব্দসম্পদ অবিকৃত রাখিয়া "গাজীপুর-বর্ণন"-সর্গের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"গাজীপুর শহরে বহু বিদ্বান পণ্ডিত, শেখ সৈয়দ বাস করেন। এ নগরবাসীগণ ধ্যানে মৌন, সভায় চতুর বাগ্মী, অরিমুখে সিংহশার্দুল। যুদ্ধব্যবসায়ী মোগল-পাঠান, রণদুর্মদ রাজপুত, বাদ্যনিপুণ গুণী, ভাট, অলঙ্কার [পিঙ্গল] এবং সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ওস্তাদ গায়ক এই শহরের অধিবাসী। যাহাকেই দেখ সে নিজের ঘরে যেন রাজা। যেথানে সেথানে গুণ-চর্চা-নাচ, ক্রীড়া, কৌতুক; সমজদার লোক রাস্তায়ও মাথা দোলাইয়া চলে। যে যাহার মনোমত আবাসেই থাকে, উহাই তাঁহার দুনিয়া ও স্বর্গ।......হিন্দু ও তুরক সেথানে অগণনীয়। চারি বর্ণের লোকে শহর ভরপুর। ব্রাহ্মণগণ সকলেই পণ্ডিত জ্ঞানী; চারি বেদ তাঁহাদের জানা আছে। হোম, জপ এবং দুবেলা স্নান তাঁহাদের নিত্যকর্ম। ক্ষত্রী বৈশ্য সকলেই বিত্তশালী। শূদ্রগণের ঘরে ঘরে পণ্যদ্রব্যের পসরা, ব্যবহারে তাহারা ধর্মশীল। চারিদিকেই আনন্দ, কেলি-কোলাহল, দুঃখ কি জিনিস কেহ জানে না।"

কোনদিন ভূভারতে এমন স্থান কোথায়ও ছিল কিনা জানি না। মোগল সাম্রাজ্যের ছায়ায় গাজীপুর শহরে মোগল-পাঠান, শেথ-সৈয়দ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র যেথানে একত্র বাস করিত সেথানে নিশ্চয়ই মসজিদ-মন্দির, আজান-শঙ্খধ্বনি, পাঁঠাবলি-কোর্বানি, নামাজ-মূর্তিপূজা, রোজা-একাদশী, তাজিয়া-শোভাযাত্রা, ধুতি-পায়জামাও ছিল; অথচ সেথানে অনাবিল প্রীতি, অহিংসা ও অথণ্ড আনন্দ। ঐতিহাসিকের মত বে-রসিক হইলে, মুসলমান-কবি সত্য ত্রেতা দ্বাপরে গাজীপুরের

ইতিহাসের জন্য পণ্ডিতজীর দ্বারস্থ না হইয়া, কোন্ নামজাদা গাজী জেহাদ ফতে করিয়া পুর-পত্তন করিয়াছেন, কোন্ জায়গায় শহীদের কয়টি কবর আছে—গবেষণা করিতেন। ঐতিহাসিকের পাখা নাই, উড়িতে পারে না; কবি আকাশচারী বিহঙ্গম, ঊর্ধ্বলোক হইতে প্রেমের দৃষ্টিতে তিনি মাটির পৃথিবী দেখিয়া থাকেন। কাজেই টিলা-টক্কর, অসমান অসুন্দর কিছু তাঁহার চোখে পড়ে না; হিংসার অশিব শিবাধ্বনি তাঁহার কর্ণ ও মর্মপীড়া জন্মাইত পারে না। যাহা হৌক্, কবি-বর্ণিত মুসলমান রাজত্বের এই মনোরম সমাজ-চিত্র আমাদের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু, অতীতের স্বপ্ন। আশঙ্কায় মূহ্যমান হিন্দু-মুসলমান গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে—"তেহি নো দিবসা গতাঃ।"

ইতিহাসের ইন্দ্রপ্রস্থ

১

মরক্কোদেশীয় পর্যটক ইবন্ বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে 'নয় দিল্লী'র অন্যতম 'নূতন শহর' বা 'খিরি'র অনতিদূরে 'ইন্দরপত শাসন' নামে একটি গ্রাম ছিল। মদ-চোয়াঁন কিংবা বিক্রয় যখন আলাউদ্দীনের হুকুমে বন্ধ হইয়া গেল, এই ইন্দ্রপ্রস্থ-শাসনের সহিত তখন রাজধানীর একটা চোরাই কারবার চলিত। চামড়ার মশকে শরাব ভর্তি করিয়া গ্রামবাসীগণ জ্বালানি-কাঠে-বোঝাই গরুর গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া তুর্কী আমীরগণের জন্য বস্তুটি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিত। সুতরাং ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ অনাবশ্যক। মহাভারতে নাই এমন কথাও দিল্লী-অঞ্চলের গ্রামবাসীর মুখে শুনিয়াছি। দিল্লীর নিকটবর্তী গুরগাঁও জিলা নাকি যুধিষ্ঠির অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা করিয়াছিলেন। নির্বাসিত পাণ্ডবগণকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিতে দুর্যোধন যখন অস্বীকৃত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের শান্তির বাণীকে সূতপুত্র কর্ণ ক্লৈব্য বলিয়া উপহাস করিল, স্থিরপ্রজ্ঞ বাসুদেব তখন পাণ্ডবগণের জন্য পঞ্চগ্রামমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

> "সর্ব্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্ বিসর্জ্জয়।"

—এই পঞ্চগ্রামের নামোল্লেখ মহাভারতে আছে কিনা জানি না। লোকে বলে, বর্তমান তহশীল—বাগ্‌পত শোনপত্ ইত্যাদি পঞ্চপ্রস্থ উক্ত পঞ্চগ্রাম। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরী তক্ষশীলার মত বিশ-বাইশ হাত মাটির নীচে গিয়াছে, কিংবা যমুনার কুক্ষিগত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই; যেহেতু ঐ স্থান বৃষ্টিবিরল, পশ্চিমে শক্ত কালাপাথরের ছোট ছোট পাহাড়, পূর্বে যমুনা নদী আজ পর্যন্ত বরাবর পূর্বকূল ভাঙিয়া চলিয়াছে। দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ হইতে যেমন পর পর নয়টি দিল্লী-শহর মুসলমান আমলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরিত্যক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরীরও সেই দশা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে দেশ হইতে নবাগত দিল্লীর রামযশ কলেজে আমার সহকর্মী, সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তিনি পঞ্চপাণ্ডবের শিবালয় এবং কুন্তীশ্বর-শিব দর্শন করিয়া

আসিয়াছেন। ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম, সেদিন তিনি কুতবমিনার পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই; পথিমধ্যে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের সন্ধান পাইয়া পঞ্চপাণ্ডবের শিবালয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া আসিয়াছেন। শিবালয়ের বাহিরে শাস্ত্রোক্ত অষ্টভুজাকৃতি কুণ্ডটি জলশূন্য, তিনি সেখানে "ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা" পাঠ এবং বায়ব্য আচমন সমাপনপূর্বক, মন্দিরে পশ্চিমাস্য হইয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আসনে বসিয়া, সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের দক্ষিণপার্শ্বে ভীমার্জুন এবং বামে নকুল সহদেবের আসন; মন্দিরের পশ্চিম প্রাচীরের গায়ে খোদাই-করা—সুন্দর কারুকার্য-শোভিত পাঁচটি শিবলিঙ্গ স্থাপনের কুলুঙ্গি খালি পড়িয়া আছে, মুসলমানেরা লিঙ্গগুলি হরণ করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, যুধিষ্ঠিরের আসনের নিকট দীপদানের প্রস্তর-বেদিকা; এবং মন্দিরের ভিতরে চারিকোণে ছাদ হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া প্রস্তরগ্রথিত 'বন্ধনী' নামিয়া আসিয়াছে। সর্বত্র পদ্ম, কলস, উদকভাণ্ড ইত্যাদি মাঙ্গলিক চিহ্ন হিন্দু-স্থপতি-বিদ্যার নিদর্শন, কেবল মন্দিরের চূড়া ভাঙিয়া মুসলমানেরা একটি গম্বুজ বসাইয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণের বাক্যে তেজ, মুখে অপরিসীম তৃপ্তি এবং আনন্দের ছাপ দেখিয়া কোনপ্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিবার সাহস আমার হইল না। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কুন্তীশ্বর শিব এখনও একটি বৃক্ষছায়া আশ্রয় করিয়া আছেন, ময়দানবনির্মিত মন্দির নাই, সেইদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে ঐস্থানে যাত্রীর ভিড় হইয়াছিল, ইত্যাদি। নরেনবাবুর ইন্দ্রপ্রস্থ-দর্শনের পূর্বে ছয় বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া আমি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সমূহ একাধিকবার দেখিয়াছি; ক্যানিংহাম সাহেব কোথাও এইরূপ মন্দিরের উল্লেখ করেন নাই, অথচ নরেনবাবুর চাক্ষুষ বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার যো নাই। স্থানের দূরত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া অবশেষে বুঝিতে পারিলাম, দিল্লীর 'বাঘা-সুলতান' শের-শাহ যেখানে নমাজ করিতেন সেইখানেই আমার নবাগত বন্ধু সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া আসিয়াছেন; ভাগ্যে বাহিরের চৌবাচ্চায় 'ওজু'র পাদোদক ছিল না। তিনি যে প্রস্তরবেদিকাকে সন্ধ্যারতির দীপাধার মনে করিয়াছিলেন—উহার উপর দাঁড়াইয়া নমাজের পর মোল্লা 'খুৎবা' পড়িতেন, অর্থাৎ উহা মসজিদের 'মিম্বর'। কিন্তু গাছতলার শিবলিঙ্গ এবং ঐ স্থানে হিন্দুযাত্রীসমাগম সম্বন্ধে আমি তখন কোনও সদুত্তর দিতে পারি নাই, হয়ত এখনও পারিব না। বিগ্রহ-বিভীষিকাগ্রস্ত আওরঙ্গজেব-বাদশাহের পিতামহ প্রপিতামহ যে পুরাতন দিল্লীতে বাস করিতেন সেখানে কখন এবং কি প্রকারে হিন্দুগণ কুন্তীশ্বর-শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিল?

ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরীর ভাগ্যবিপর্যয়ের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নহে। আলমগীর-শাহী আমলে পঞ্চনদ-প্রদেশের অন্তর্গত বটালা-নিবাসী সুজানরায় ভাণ্ডারী, মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যোরোহণ-কাল হইতে আওরেঙ্গজেব পর্যন্ত,—ইন্দ্রপ্রস্থের সম্রাট, সুলতান এবং শাহান্‌শাহ্‌-গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ফার্সি ভাষায় তাঁহার Khulasat-ut-tawarikh গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস এবং ধর্মগ্রন্থ তিনি ফার্সি ভাষায় পড়িয়াছেন। আকবর এবং দারা শুকোর কৃপায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তর্জমা হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অসুবিধা হয় নাই। ইংরেজী আমলে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত না করিলে প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা চলিতে পারে না, মোগল আমলে ফার্সি না পড়িলে সম্রান্ত হিন্দুর জীবিকা কিংবা জ্ঞানার্জন চলিত না। যাহা হউক, ভূমিকা হইতেই আমরা সুজানরায়ের গবেষণার মূল্য যাচাই করিতে পারি। সুজানরায়ের পুস্তকরচনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভরতপুরের রাজা বদনসিংহের পুত্র সুরজমল-জাঠ মোগল-ইন্দ্রপ্রস্থ, অর্থাৎ সেকালের 'পুরানা দিল্লী' অগ্নিসাৎ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে পরিণত করিয়াছিলেন; তখন হইতে কেবল উহার অন্তর্দুর্গের প্রাকার, তোরণ, শেরশাহী মসজিদ এবং হুমায়ুনের পাঠাগার মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় জাঠ কৃষকগণ উহার মালিক হইয়া বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের স্মৃতিরক্ষার্থ "জাঠ-দেবতাগণ" কর্তৃক কুন্তীশ্বর-শিব স্থাপিত হইয়া হিন্দুর পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ভাল বা মন্দ—জাঠের অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই। মোগল আমলে জাঠ-জাতির উপর যে লোমহর্ষণ অত্যাচার এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল, উহাতে ঐ জাতির বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়।

কিন্তু জাঠ-জাতি কেবল হিন্দুর ধর্ম ও স্বাধীনতা উদ্ধার করে নাই; অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানের উপর পূর্ব অত্যাচারের অমানুষিক ও নিতান্ত ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে। হিংসার দ্বারা হিংসার, অধর্মের দ্বারা অধর্মের অবসান ঘটে নাই। জাঠপণ্ডিত শুক্ল-যজুর্বেদের টীকা লিখিয়াছেন; পীপা-জাঠ কবীর দাসজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অহিংসা এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনমন্ত্র প্রচার করিয়াছে। রাজারাম-জাঠ আওরঙ্গজেবের আমলে সেকেন্দ্রা লুট করিয়া আকবর বাদশাহের অস্থি আগুনে নিক্ষেপ করিয়াছিল; তাজমহল জাঠের

হাতে অন্নের জন্ত রক্ষা পাইয়াছে। গুরু-গোবিন্দের 'অমৃত' পান করিয়া শিখ-জাঠ এখনও অমর হইয়া আছে। ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, আহমদশাহ দুরানী অমৃতসরের অমৃতকুণ্ড বিষ্ঠাদ্বারা ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কয়েক বৎসর পরে বিজয়ী শিখগণ পাঠান যুদ্ধবন্দীগণের দ্বারা ঐ কুণ্ড পরিষ্কার এবং বরাহ-রক্তের দ্বারা পরিশোধিত করিয়াছিল। যাহা হউক, ভরতপুরের সুরজমল যদুবংশী জাঠ-জাতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কংসরূপী মোগলের মহাকাল-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইহাই কবিপ্রশস্তি।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্বেই সুবা-আগ্রা এবং দিল্লীপ্রদেশ হিন্দু মন্দির ও মূর্তিশূন্ত হইয়াছিল; তিনি পরবর্তীগণের জন্ত কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই। তাঁহার হিন্দুধর্মদ্বেষ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করায় হিন্দুগণ নূতন মন্দির নির্মাণ করিতে সাহসী হয় নাই। মন্দিরের অভাবে উক্ত প্রদেশদ্বয়ের জাঠ, আহীর এবং গুর্জর-কৃষক ও পশুপালকগণ পর্ব-উপলক্ষে বট ও অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা করিত। এইভাবে বট অশ্বত্থবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুর বেইমানী বাড়িয়া চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, বট-অশ্বত্থগাছ কাটিয়া ফেলিবার মোগলাই হুকুম হইয়াছিল।

মহম্মদ-শাহের পুত্র আহমদ-শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে, মীর-বক্শী সালাবত খাঁ পবিত্র রমজান মাসে (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৭৪৯ ইং) আঠার হাজার ফৌজ ও তোপখানা লইয়া সুরজমলের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী নারনোলের অন্তর্গত সরাই-শোভাচান্দের নিকট জাঠের ফাঁদে পড়িয়া তিনি সুরজমলের শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল মোগল সরকার ভবিষ্যতে কোন পিপল গাছ (অশ্বত্থ) কাটিতে পারিবেন না, কিংবা উহার পূজায় বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।* এই সময়ে হিন্দুধর্মের দুর্দশার অন্ত উদাহরণ অনাবশ্যক, অথচ মোগল সাম্রাজ্য তখন "বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ"।

৩

মহম্মদ শাহ্ দিল্লীর উধম-বাঈ নাম্নী এক নর্তকীকে বিবাহ করিয়া, বাদশাহীটা তাঁহাকেই নজর করিয়াছিলেন; কিন্তু বারবিলাসিনী, 'কুদসিয়া বেগম' খেতাব পাইলেও, পদমর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার গর্ভে তাঁহার উত্তরাধিকারী আহমদ শাহের জন্ম হয়। শাহী-তক্তে বসিবার পূর্বে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি

*Sarkar's Fall of the Mughal Empire (second edition 1949) pp 172-178

অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই, কোন পুরুষমানুষের মুখও দেখেন নাই; সর্বপ্রথম যাহার মুখ দেখিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি—তাঁহার মাতার অনুগৃহীত ক্রীতদাস খোজা জাবেদ। আহমদ শাহের নামে বাদশাহী চালাইতেন কুদসিয়া বেগম, এবং খাঁ-উপাধিধারী জাবেদ। তাঁহার দরবারে 'ইরাণী' এবং 'তুরাণী' আমীরগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অযোধ্যার নবাব সফদর জঙ্গ প্রধান উজীর, কিন্তু খোজার উজীরী করিতে তিনি নারাজ। আহমদ শাহ্ দিল্লীর উপকণ্ঠে চারি-বর্গ-মাইল-ব্যাপী প্রাচীরবেষ্টিত, লতাকুঞ্জশোভিত পরীর শহর আবাদ করিয়াছিলেন; দিল্লীর কোলাহল এবং পুরুষের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তিনি মাসের পর মাস এই নারীস্থানে কুঞ্জবিহার করিতেন।*

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা নবাব-উজীর সফদরজঙ্গ অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুইয়াছিলেন—চক্ষু মুদ্রিত, অথচ ঘুম নাই। বেগমসাহেবার আওয়াজ পাইয়া তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছায় উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু চোখ খুলিলেন না। শ্বশুরের দৌলতে নবাবী পাইয়াছেন, কাজেই তিনি বেগমসাহেবাকে বিলক্ষণ সমীহ করিয়া চলিতেন। বেগমসাহেবা নিতান্ত জেদ করাতে নবাব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, চোখ মেলিয়া হইবে কি? আলো কই? চতুর্দিকে অন্ধকার। দোয়াব হস্তচ্যুত, অযোধ্যা যায় যায়; ফরাক্কাবাদের আহমদ খাঁ বঙ্গশ ও আফ্রিদি-রোহিলা-পাঠানে মিলিয়া লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করিয়া আছে, শীঘ্রই হয়ত দিল্লী আক্রমণ করিবে। ফৌজ নাই, তহবিল খালি, হিম্মত টুটিয়া গিয়াছে। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া বেগমসাহেবা বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস উজীর-ই-আলা! চোখ বুজিয়া তস্‌বী জপিলেই বুঝি তামাম দুনিয়া হাতের মুঠায় আসিবে? আমার তহবিলের নগদ পাঁচ লাখ, হীরা-জহরতে দশ লাখ টাকা, নবাব সাহেবের খেদমতে হাজির। আজই চিঠি লিখিয়া মালবের মারাঠা ফৌজ ও সুরজমলের জাঠ ফৌজ তলব করিতে হইবে; মরদের হিম্মত, খোদার বরকত।"

নবাব-উজীর সফদরজঙ্গের সহধর্মিণী ছিলেন বুরহান্-উল্-মুল্‌ক নবাব সাদত-খাঁর কন্যা। পিতার ন্যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ মেজাজ ও অটুট সাহস; হুকুম খাটাইবার সহজাত ক্ষমতা; বিপদে ধৈর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কূটনীতিজ্ঞানে পিতা এবং স্বামী হইতে চতুর্গুণ শ্রেষ্ঠ। বেগমসাহেবার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া, নবাব-উজীর কয়েক মাসের মধ্যেই মারাঠা এবং জাঠ-সেনার সাহায্যে বঙ্গশ এবং-রোহিলা-

---

*Tarikh-i-Ahmadi (Pers. text) O. P. Ghulam Ali, Imad-us-Saadat (Pers. text)

গণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া নেপাল-তরাই অঞ্চলে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু জাবেদ খাঁ-র ষড়যন্ত্রে মারাঠাগণ উজীরের পক্ষ ত্যাগ করাতে, তিনি রোহিলাশক্তিকে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া নবাব সফদরজঙ্গ সর্বপ্রথম জাবেদ খাঁ-কে বধ করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। সফদরজঙ্গ পদচ্যুত এবং রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইলেন। দিল্লীর বাহিরে শিবির সংস্থাপন করিয়া নবাব সফদরজঙ্গ সুরজমলকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। ভরতপুর হইতে পঞ্চদশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া কুমার সুরজমল নবাব-শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই বাহিনীর পশ্চাতে ছিল আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেণীর সর্বগোষ্ঠীর যুদ্ধক্ষম হিন্দু। সুরজমলের এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী 'রামদল' নামে পরিচিত ছিল। স্তাবকেরা বীরশ্রেষ্ঠ সুরজমলকে, ভূভারহরণের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ পার্থসারথি বলিয়া মনে করিলেও, তিনি স্বয়ং রাম-নামেই সমস্ত কার্য করিতেন। পাঠান সাবিত খাঁ-র সাবিতগড় দুর্গ জয় করিয়া তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন রামগড়। মারাঠা আমল পর্যন্ত উহা রামগড় নামেই পরিচিত ছিল, বর্তমানে ঐ দুর্গই সুপ্রসিদ্ধ আলিগড়। যাহা হউক, সুরজমলের 'রামদল' শাহ্‌জাহানাবাদ দিল্লী হইতে মক্ষিকা-নির্গম পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। চারিদিকে লুঠতরাজ, রাজধানীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। আহমদ-শাহের নূতন উজীর ইমাদ্-উল্-মুলুক, সাহারানপুরের জমিদার নজীব খাঁ রোহিলা, এবং মালব হইতে মল্‌হার রাও হোলকর-কে রাজধানী রক্ষার জন্য জন্য মোটা টাকার লোভ দেখাইয়া স্বপক্ষে আহ্বান করিয়াছে শুনিয়া নবাব সফদরজঙ্গ সুরজমলকে পুরানা দিল্লী-শহর লুঠ করিবার হুকুম দিলেন।

৪

সুরজমলের সভাকবি সূদন তাঁহার বীররসপ্রধান হিন্দী কাব্য 'সুজান-চরিতে', ইন্দ্রপ্রস্থ দাহনের চমৎকার বর্ণনা নানা ছন্দে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজেও সুরজমলের অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন—এইরূপ ইঙ্গিত কাব্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। মুসলমান ইতিহাসে ইন্দ্রপ্রস্থ-ধ্বংসের ব্যাপারকে নাদিরশাহী ব্যাপার অপেক্ষা ভয়াবহ—"জাঠ-গর্দী" বলা হইয়াছে। বর্তমান অন্তর্দুর্গের (Qila Kohna) ভগ্নাবশেষের বাহিরে, আহমদ শাহের সময় পর্যন্ত, বহুবিস্তৃত, সমৃদ্ধ এবং প্রাচীর-বেষ্টিত, জনবহুল শহর ছিল। পাঠান এবং আকবরী আমলের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত

পরিবার এই প্রাচীন শহরে বাস করিতেন; ব্যবসায়-বাণিজ্য পুরানা শহরেই ছিল বেশী। মোট কথা, বর্তমান New Delhi এবং Old Delhi-র মধ্যে যে তফাৎ, সেকালে নূতন-পুরাতনের মধ্যে প্রায় অনুরূপ পার্থক্য ছিল। এই প্রাচীন সমৃদ্ধ শহরের কিছুই জাঠের হাতে রক্ষা পায় নাই। লুঠের কাজে জাঠ চিরকালই পাকা ওস্তাদ, ব্যবহারযোগ্য ছোট-বড় কোন জিনিস ছাড়িবার পাত্র নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বসন-ভূষণ ভোজ্য-প্রসাধন, গৃহস্থালীর দ্রব্য, আচার-মিঠাই, হুঁকা-ডিবা, ইত্যাদি সমস্ত জিনিস কবি-বর্ণিত লুটের ফিরিস্তির মধ্যে পাওয়া যায়। এই ফিরিস্তির টীকাটিপ্পনী প্রয়োজন, উহাতে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপকরণ আছে।

জাঠেদের লুটের কায়দায় একটু রকমারি ছিল, যাহার মাল সে ব্যক্তিকে তাহা ঘাড়ে করিয়া কিংবা গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। তাহারা স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ কিংবা অকারণ রক্তপাত করিত না; গ্রামে আগুন লাগাইত না, কারণ ইহাতে ক্ষতি বই লাভ ছিল না। উজাড় জায়গা হইতে, অবসর মত কুঁড়ে-ঘরের দরজার ঝাঁপ, দড়ির চারপাই পর্যন্ত লইয়া যাইত। মুসলমানরা লুটের খেয়াল করিত না; প্রায়ই তাহারা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলের মাথা কাটিয়া আনিত, স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিত। নাদির-শাহী 'কত্‌ল্‌-ই-আম' বা পাইকারী মুণ্ডচ্ছেদ,—এবং জাঠ-দমন ব্যাপারে আহমদশাহ দুরাণীর সেনাপতি জাহান খাঁ-র মথুরা-বৃন্দাবনে রক্তের বীভৎস তাণ্ডব-হোলিখেলা ইহার প্রমাণ। সুরজমল কয়দিন ধরিয়া পুরানা দিল্লী লুট করিয়াছিলেন জানা য় না। দিল্লী এবং আওরঙ্গজেবের বংশধরগণের প্রতি জাঠজাতির পুরুষানুক্রমিক ক্রতা ছিল। প্রতিহিংসার যে আগুন এতদিন উৎপীড়িত জাঠের হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল উহার জ্বালাময়ী শিখা এইবার ইন্দ্রপ্রস্থকে গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। কবি সূদনের উল্লাস তাঁহার নায়ক সুরজমলের কার্যের মাত্রাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, যথা—

"ধর্ম-সুত-ধাম জমুনা নিকট মান
সর্ব-মেদ-যজ্ঞ কৌ বনায়ৌ যৌঁত-পুর হৈ।

*　　*　　*

অণ্ডজ জরায়ুজ ঔ স্বেদজ উদ্ভিজ হবি
করয্যো পুরনাহুতি চকত্তা কুল মূর হৈ।
তেজ কী আগিন, ইন্দ্রপুর সৌঁ অগিনকুণ্ড
হোতা শ্রীসুজান জজমান মনসুর হৈ। [সুজান-চরিত]

অর্থাৎ, যমুনাতীরে ধর্মপুত্র-ধামে এক সর্বমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। এই যজ্ঞের হবি অণ্ডজ জরায়ুজ স্বেদজ প্রাণিকুল এবং ঔষধিসমূহ, ইহার পূর্ণাহুতি সমূল 'চকত্তা' অর্থাৎ চাঘতাই-মোঘল বংশ। ওজঃ অর্থাৎ জাঠ-শৌর্য এই যজ্ঞের অগ্নি, ইন্দ্রপুর হোমকুণ্ড, হোতা শ্রীসুরজমল, এবং যজমান মনসুর (আবুল মনসুর খাঁ নবাব সফদরজঙ্গ)।

কবি লিখিয়াছেন, যজমান মনসুর হোতা সুরজমলের হোমের পরিমাপ দেখিয়া আশঙ্কাযুক্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া রুদ্রজটা হইতে উদ্ভূত জাঠের এই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের উদ্দাম তাণ্ডব বন্ধ করিবেন। কবি সূদন এই ইন্দ্রপ্রস্থ দাহনকে পৌরাণিক-রূপ দান করিয়া সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বযুগে ক্রুদ্ধ মঘবা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজভূমিকে নির্যাতিত ও অতিবর্ষণে ক্লিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই আক্রোশে 'ব্রজেন্দ্র'—বদনসিংহের পুত্র সুরজমল—ইন্দ্রপুর লুণ্ঠন ও দাহন করিলেন। যাহা হউক, ইহার পর পুরানা দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বাণিজ্য-লক্ষ্মী এবং রাজশ্রী ব্রজভূমিতেই আশ্রয় লইলেন। এই সময় হইতে ভরতপুর, দীগ প্রভৃতি নবপ্রতিষ্ঠিত জাঠদুর্গ ঐশ্বর্যে ও বীর্যে আকবর বাদশাহের আগ্রা এবং শাহজাহানের দিল্লীকে উপহাস করিয়া অর্ধশতাব্দী যাবৎ হিন্দুগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কবি সত্য বলিয়াছেন—

"দেস্ দেস্ তজি লছিমী দিল্লী কিয়ো নিবাস।
অতি অধর্ম লখি লুট্ মিস্ চলী করন্ ব্রজবাস॥"

অর্থাৎ, লক্ষ্মী দেশের পর দেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, অধর্ম প্রবল দেখিয়া হরণ-চ্ছলে তিনি ব্রজবাস করিতে চলিলেন।*

অরক্ষিত শহর লুট করিয়া সুরজমল তাঁহার সুনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। কবির উল্লাসে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, মানবতার মাহাত্ম্য নাই।

*লক্ষ্মীর চাঞ্চল্যের একটি সুন্দর অজুহাত দেখাইয়াছেন বৈরামখাঁর পুত্র, হিন্দীভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, খান্ খানান্ অব্দার রহিম্—

"কমলা থির্ ন রহহিঁ কহত সব কোয়।
পুরুষ পুরাতন-কী বধূ চঞ্চলা কাঁহি ন হোয়॥"

[সকলেই বলে, কমলা স্থির থাকেন না, পুরুষ-পুরাতনের (এক অর্থে নারায়ণ, অন্য অর্থে অথর্ব বৃদ্ধ) স্ত্রী কেন চঞ্চলা হইবেন না?] —"রহীম-সতসঈ।"

অহেতুকী হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতির অসূয়াদুষ্ট, শোণিত তৃষ্ণা, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ-নগরী অভিশপ্ত ভূমি। প্রাণভয়ে পলায়ন-ত্রস্ত জীবকুলকে বধ করিয়া অগ্নিতর্পণ—ব্যাধ-বৃত্তি, ক্ষাত্র-ধর্ম নহে। অজাতপক্ষ শাবককে অগ্নির নিষ্ঠুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাতার ব্যাকুলতা—জরিতা-মন্দপালের সেই রোদনধ্বনি —কাল-তরঙ্গে ভাসিয়া আজিও জীবের শাশ্বত বেদনার সহিত সুর মিলাইতেছে। খাণ্ডবপ্রস্থ-দাহনের পাতকে দেবতা ও মানুষ সমান দোষী, সমান পাতকগ্রস্ত। হজম করিতে না পারিলে অগ্নিদেব বারো বৎসর মরুত্ত-রাজার যজ্ঞে ঘি খাইতে গেলেন কন? অগ্নি দেবতাগণের মুখস্বরূপ; যজ্ঞের যথাভাগ ইন্দ্র, সোম, মরুৎগণকে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ। অন্য কোন দেবতার পেটের অসুখ হইল না, অথচ গ্নির অগ্নিমান্দ্য। দিল্লীর লোকেরা বলে "শরাকত কী রোটী" বা শরিকী খানা —যে যাহাকে পারে ঠকাইয়া খায়। অগ্নিদেব কি উহাই করিয়াছিলেন? দ্বাপরের শষে অগ্নিদেব একটা আসুরিক চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কিছুদিন পেক্ষা করিলে—যাগ-যজ্ঞহীন, হবিহীন কলিকালে স্বভাব-চিকিৎসায় নিশ্চয়ই রোগ্যলাভ করিতেন। দেবতার পাতকের সহায়কারী কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডব দাহন রয়া অবতারের আসন হইতে প্রাকৃত মানবের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছেন; তিহাসের আদালতে, জাগতিক ব্যাপারে দেবতাকেও মানুষ হিসাবে বিচার গ্রহণ রিতে হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব-কৌরব কেহই ভোগ করিতে পারেন নাই। ঐস্থানে হুমায়ুন নীন পণাহ্' নির্মাণ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই; রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির ছয় াসের মধ্যে এইখানেই পুস্তকশালা হইতে নামিবার সময় পা পিছলাইয়া গড়াইতে াড়াইতে মৃত্যুর অপর পারে চলিয়া গিয়াছিলেন। এইস্থানে আকবরকে হত্যা রিবার ষড়যন্ত্র দুইবার ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার পর, শাহজাহানাবাদ-দিল্লী (বর্তমান পুরানা দিল্লী) নির্মাণের প্রাক্কাল পর্যন্ত, মোগল সম্রাটগণের রাজধানী ছিল— আগ্রা-শহর। ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লীতে আকবরের একমাত্র স্মৃতি—ইহার অন্তর্দুর্গের বিশাল তোরণের উপরিভাগে, প্রায় লোচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, সূর্যদেবের প্রতীকমূর্তি; একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে দুইটি চক্ষু এবং দশদিকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটার দ্যোতক রেখাপুঞ্জ; ঐ প্রতীকের দুই পার্শ্বে খোদিত এক একটি ছোট সিংহ—এক বর্মধারী পুরুষসিংহের মুখের মধ্যে বর্শাফলক প্রবেশ করাইয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। এই সমস্ত কাফেরীর নিশানা আসল আলমগীর এবং পরবর্তীকালের

অগণিত নকল আওরঙ্গজেবের নেকনজর হইতে কেমন করিয়া গায়েব রহিয়াছে—খোদাতালাই জানেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ পরিণতি—আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান। খাণ্ডবপ্রস্থের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল ইংরেজের ইন্দ্রপ্রস্থ; ঐখানেই সভাপর্ব পুনরায় অভিনীত হইতেছে। এই সভাতেও বর্ণ-নির্বিশেষে শিশুপাল-বক্রদন্ত, ভীমার্জুন, বাসুদেব-যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাসুদেবের নিন্দায় চতুর্মুখ চেদিরাজ যুধিষ্ঠিরকে শাসাইতেছেন, কিন্তু ভীষ্ম-পিতামহ কই? ধর্মরাজকে অভয়বাণী শুনাইবে কে? 'মাভৈষ্যং কুরুশার্দূল শ্বা সিংহং হন্তুমিচ্ছতি'।

যজ্ঞবিঘ্নকারী রাজন্যমণ্ডলীকে জলবুদ্বুদবৎ উপেক্ষা করিয়া, বাত্যাভিহত সমুদ্রের ন্যায় বজ্রকণ্ঠে, তাহাদের উৎসাহদাতা দুষ্টবুদ্ধি চেদিরাজকে সম্বোধন করিয়া সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবে কে?—

ক্রিয়তাং মূর্দ্ধ্নি যো ন্যস্তং মন্যেদং সকলপদম্।
এষ তিষ্ঠতি গোবিন্দঃ পূজিতোঽস্মাভিরচ্যুতঃ॥

[অর্থার্থ—বৃথা বন্ধ চেদিরাজ কর কি কারণ,
অর্ঘ্যদানে আজি মোরা পূজি নারায়ণ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে আইস সমরে॥]